ফর অ্যাডাল্টস্ ওন্‌লি

শচীন ভৌমিক

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
বৈশাখ, ১৩৯২

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

২০·০০

'অনুরাধা', 'অনুপমা', 'আনন্দ' ও 'সত্যকাম'-এর প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক

অগ্রজপ্রতিম হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়কে

স্নেহধন্য

শচীন ভৌমিক

আমি যখন কোলকাতায় ছুট্‌কি ছিলাম তখন লিখতাম। বোম্বের বোম্বেটে হওয়ার পর থেকে কর্মজীবনের চাপে লেখাকমে এসেছিল। প্রকাশক ব্রজ মণ্ডল মশাই আবার আমার লেখকজীবনকে সচল করেছেন। এতদিনে আমি প্রকাশকের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছি। যিনি শক্ দিতে ভালোবাসেন তিনিই প্রকাশক। নইলে আমার শকিং রচনা প্রকাশ করার আর কি মানে হতে পারে বলুন ? কিন্তু আমার 'শের শায়রী' ও 'বেড়সাইড শচীন ভৌমিক' বই দু'খানার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দেখে বুঝতে পেরেছি বাঙালী সত্যি সত্যি পরস্ত্রীকাতর, না না মাপ করবেন, পরশ্রীকাতর, না, এবারও ভুল বললাম, প্রশয়কাতর, হাঁ্যা, ঠিক, প্রশ্রয়কাতর। পাঠক পাঠিকাদের প্রশ্রয় পেয়েই 'ফর অ্যাডাল্টস্ ওন্‌লি' আমার তৃতীয় প্রয়াস প্রকাশিত হল। 'বেডসাইডে'-র মতোই এ বই আমার বহুবিধ রচনার নির্বাচিত সংকলন। এতে বচন ফকিরের কচ্ছে, গল্প, কৌতুকী, শায়রী সব পাবেন। এ বই আপনি বেডসাইডে রাখতে পারেন, বাথসাইডে রাখতে পারেন, এসাইড্‌ও রাখতে পারেন।

জানি আমি আপনাদের সহৃদয়তার সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু অপরাধ আপনাদের—এ ফ্র্যাংকেস্টাইন আপনারা নিজের হাতে তৈরি করেছেন। এবার তার অত্যাচার আপনাদের সহ্য করতেই হবে। প্রশ্রয়ের সীমানা যদি আরও বিস্তারিত হয়, তবে সাবধান করে দিচ্ছি, অচিরাৎ দেখতে পাবেন,—রিটার্ন অফ্ দি ফ্র্যাংকেস্টাইন ! আবার শচীন ভৌমিক।

—ভৌমিক শ'

(বার্নার্ড শ'র সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই)

যৌবন আসার আগেই যৌবনের দুই চর চলে আসে। দুই চর বলতে পারেন দুই চড়ও বলতে পারেন। সে দুজন হল একটি ভূত ও একটি ম্যাজিসিয়ান। দেহে ঢুকে পড়ে ভূত, আর মনে এসে ঢোকে সেই জাদুকর। ভূতটা এসে ছেলেদের নার্ভ আর মেয়েদের কার্ভ নিয়ে পিংপং খেলা শুরু করে, আর জাদুকর মশাই মনটাকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নের জাদুঘরে। সে ফ্যাণ্টাসীর জগতে নিজেকে মনে হয় ফ্যাণ্টাসটিক। কখনও কিং মনে হয়, কখনও কিংকং।

সে বয়েসে আমার স্বপ্ন ছিল উত্তমকুমারের বাড়িতে, ক্যাডিলাক গাড়িতে ও সুচিত্রা সেনের শাড়িতে ঢোকার। স্বপ্ন ছিল হেমন্ত মুখার্জির কণ্ঠ, তারাশঙ্করের চরণ, রবিশঙ্করের অঙ্গুলি, নেহেরুর হস্ত, সোফিয়া লোরেনের স্তন, এলিজাবেথ টেলরের নিতম্ব স্পর্শ করার। স্বপ্ন ছিল দেখবারও—প্যারিসের ইফেল টাওয়ার আর ল্যুভর মিউজিয়াম, লণ্ডন শহর, রাশিয়ার ইলিয়া এরেনবুর্গ, মায়কোভস্কী ও টিউব ট্রেনের স্টেশন, [illegible] স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, মেরিলিন মনরো, হলিউড, এলভিস প্রেসলে আর ন্যাট কিং কোল, স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই, মিশরের পিরামিড আর জাপানের গাইসা মেয়ে, আগ্রার তাজমহল, বীরভূমের শান্তিনিকেতন, সিংহগড়ের ভগ্নস্তূপ আর বৈজয়ন্তীমালার নগ্নরূপ—এই সবকিছুই দেখবার ইচ্ছে হত। সে এক অদ্ভুত বয়েস। সব যৌবনবতী মেয়েই যেন বাসনার সোনা, সব নারীর জানুসন্ধির ক্ষেত্রই যেন তীর্থক্ষেত্র। সেই বয়েসে, মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ একটি ছেলের ফ্যাণ্টাসীর জগতে আরও একটা স্বপ্ন গুনগুন করে। আমার অন্তত করত। যখনই চৌরঙ্গীর

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে দিয়ে হেঁটে গেছি, ভাবতাম কখনও কি ঢুকতে পারব গ্র্যাণ্ডে ?

গ্র্যাণ্ডের পাশে ও পার্ক স্ট্রীটের বিলিতি মদের বার-এর সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই ভাবতাম কখন সে সময় আসবে যে চট্ করে বার-এ ঢুকে অর্ডার দেব—এক পেগ হুইস্কি লাও। ভাবতেই কেমন ভয় আনন্দ কৌতূহল মিলিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হত। সেই বয়েসের সেই অনুভূতি এখন বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না। বাথরুমের ফুটোয় চোখ রেখে কোন নিকট আত্মীয়ার নগ্নদেহ এক ঝলক দেখার পর যে প্রচণ্ড অপরাধ-বোধ সেই বয়সী ছেলেদের জর-গ্রস্ত করে দেয়, সেইরকম অপরাধ-বোধেই জ্বলেছি যখন লুকিয়ে এসব মদিরালয়ের ভেতরে লোভাতুর দৃষ্টিক্ষেপণ করেছি। সে বয়েস এখন অনেক পিছনে।

এখন পার্টিতে গেলেই পাকা বিশেষজ্ঞের মত বলি, ড্যাস অফ সোডা এণ্ড নো আইস্ প্লিজ। দিনের বেলা হলে বলি, বিয়ার মেক্স মি লাউজী, মে আই হ্যাভ এ স্ক্রু ড্রাইভার অর ব্লাডি মেরি? নো ভডকা? জিন উইল্‌বি ও কে। বাট্ লিট্‌ল মোর বিটার প্লিজ।

বিলেতে পাব ক্রলিং করার সময় বলেছি, মে আই হ্যাভ এ মার্টিনি? মেক্ ইট ভেরি ড্রাই। ইটালীতে, লেট্ মি হ্যাভ এ ক্যাম্পারী। নো, নট উইথ সোডা। অন্ দা বক্স প্লিজ।

হুইস্কি-টক শুরু হলে ঝগড়া করি 'জনি ওয়াকার', 'ব্ল্যাক লেবেল' আর 'সিভাজ রিগ্যালের' মধ্যে কোন্‌টা উত্তম, বলি 'হাণ্ড্রেড পাইপার্স' থেকে 'কাটি সার্ক' লাইটার হুইস্কি, বলি 'কিং অফ কিংস' ঠিক আছে, কিন্তু নাথিং লাইক 'ডিম্পল', বলি, 'এন্টিকোয়েরী' ট্রাই কর, মাচ বেটার ভান 'সামথিং স্পেশাল'। বলি, বেস্ট ইন দা ওয়ার্লড নো ডাউট হল 'রয়েল স্যালুট'।

আপনাদের জনান্তিকে বলে রাখি, এসব বলি বটে, বলে ইমপ্রেসও করি, কিন্তু ড্রিংক্স সম্পর্কে আমার জ্ঞান অভিনয় সম্পর্কে দেব আনন্দের জ্ঞানের মতই। বুঝলেন না? আমি বলতে চাই

খুবই সামান্ত। আমি কনোসিউর নই, নেহাতই এমেচার। মদ ও মাতালদের ভিড়ে থেকে এখনও আমার পানবিত্তা আয়ত্ত হয় নি। 'রয়েল স্যালুট' হুইস্কির বট্‌মস্‌ আপ এর চাইতে এখনও আমার কোন সুন্দরীর বট্‌মস্‌ আপ অনেক বেশী সুস্বাদু, না, স্যরি, অনেক বেশী লোভনীয় মনে হয়।

মদ সভ্যতার আদিমতম আবিষ্কার। মনে হয় আগুন আর মদ একই সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মদও তো আগুন, তরল অগ্নি বলতে পারেন। এখন অবশ্য এই অগ্নি-পান সোসাইটির একটি বৃহৎ সোপান হয়ে দাঁড়িয়েছে—স্ট্যাটাস সিম্বল্‌। আগে ছিল বর্বর যুগ বা বারবারিক এজ। আর এখন হল বার্‌ এজ। নাকি বলব বারিক্‌ এজ (যাঁদের পদবী বারিক তারা কিছু মনে করবেন না।) এখন ধনীদের গৃহে গৃহে বার। আমার এক বন্ধুর মতে এ যুগ হল বার আর বারাঙ্গনার। তাকিয়ে দেখুন ধনীপুত্রদের। চুল দেখে মনে হয় ছ'মাস কোন বারবারের কাছে যায় নি, কিন্তু গন্ধে টের পাবেন রোজ বোধ-হয় দু'বেলাই বারে যাতায়াত আছে।

সাহিত্যজগৎ, নাট্যজগৎ, চিত্রজগৎ, শিল্পীজগৎ, সংগীতজগৎ—সর্বত্র মদিরার মত্ততা, সর্বত্র সুরার ফোয়ারা। শিল্পজীবনের গৌরব সুরার সৌরভ ছাড়া যেন হয়ই না। 'দেবদাস' একসময়ে ভগ্নহৃদয়ের জন্ত মত্তপান যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই রকম একটা বিশ্লেষণ প্রচারিত করেছিল। ফলে কাঁকন পরা হাতের ধাক্কা খেয়েই সে যুগের যুবকরা সোজা সান্ত্বনা খুঁজত মদের গ্লাসে, দুঃখ ভোলার জন্ত যোগ দিত মাতালের ক্লাসে। এটা কিছু নয়, শুধু ওমর খৈয়ামী রোমান্তিকতা, আত্মনিধনের মর্বিড আতুরতা, নেগেটিভ জীবনদর্শনের ডেস্ট্রাকটিভ বুদ্ধিহীনতা। দেবদাসের সেই প্রভাব অবশ্য এখন কমে গেছে। এখন ভগ্নহৃদয়ে আর বড় কেউ পানপাত্র তুলে নেয় না। বরং দেখা যাচ্ছে যুগ্ম হৃদয়ে আজকাল নারী পুরুষ একসঙ্গেই পান-পাত্র তুলে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে বলে, 'চিয়ার্স, ফর আওয়ার এটার্নেল লাভ' বা 'চিয়ার্স, টু আওয়ার ম্যারেজ'। যুগ পাল্টাচ্ছে।

অতি উদারতার যুগ এটা। সেক্স এখন শয্যার মশারীতে নেই, সেক্স এখন সজ্জার পসারীতে। আগে ছিল 'চিয়ার্স টু আওয়ার লাভ' এখন হয়ে গেছে 'চিয়ার্স টু আওয়ার—চার অক্ষরের সেই অতি জৈবিক শব্দ। এখন cocktail আর cock tale-এ কোন তফাত নেই।

ওমর খৈয়াম সম্ভবত প্রথম কবি, যাঁর জীবনদর্শন ছিল সুরা, সাকী আর ভাগ্য নিয়ে। তাঁর রুবাইয়ৎ-এর প্রতি ছত্রে ছত্রে সুরার জয়গান। (কান্তি ঘোষ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর সকল অনুবাদ বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়।) ওঁরই অনুপ্রেরণায় উর্দু কবিতার গালিব থেকে শুরু করে অনেক আধুনিক কবির প্রিয় বিষয়বস্তু হল মদিরা। সুরার প্রচারপত্র এইসব কবিতায় অনেক মণিমুক্তা ছড়ানো আছে। সাহিত্যজগতে সুরার এই অবদান ভোলা যায় না। কিছু জ্ঞান দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। শুনুন—

ইয়ে কালী কালী বোতলেঁ যো হ্যায় শরাব কি
রাতে হ্যায় ইনমেঁ বন্ধ্ হমারে শবাব কি। —রিয়াজ

কালো কালো সুরার বোতল, যেন যৌবনের মাতাল রাত্রির দল এখানে বন্দী হয়ে রয়েছে। চমৎকার কাব্য নয় কি?

আরও শুনুন—তওবাসে মেরে বোতল অছি
যব টুটি হ্যায় জাম হো গই হ্যায়। —রিয়াজ

দিব্যির চাইতে অনেক ভাল আমার এই বোতল। দিব্যি যদি ভেঙে ফেলি, কি হয়? কিছুই না। কিন্তু বোতল যখন ভেঙে যায় তখন ভাঙা কাঁচের টুকরোতে পেয়ালা হয়ে যায়। তাতে মদিরা কিছু কিছু টলটল অন্তত তো করে। সবটাই তো আর লোকসান নয়।

আরেকটি—

ওহ্ জাম হুঁ যো খুনে তমন্না সে ভর চুকা
এ মেরা জর্ফ হ্যায় কি ছলকতা নহীঁ হুঁ ম্যায়।—কনা লক্ষ্ণৌভী।

আকাঙ্ক্ষার বিক্ষত রক্তে জীবনের পানপাত্র আমার কানায় কানায় ভরে গেছে। এ তো আমার সহ্যশক্তির ক্ষমতা যে এক বিন্দুও ছলকে পড়ে নি।

আরেকটি—

ইয়ে ময়কাদা হ্যায়, তেরা মাদ্রাসা নহী বাইজ
এহাঁ শরাব সে ইনসাঁ বনায়ে যাতে হ্যায়। —সাগর নিজামী

হে সাধু, হে পণ্ডিত, এটা সুরাবিপণি, তোমার বিদ্যালয় নয়। এখানে তো সুরা দিয়ে মানুষ তৈরি করা হয়। জ্ঞানের বিদ্যালয় তোমার জ্ঞানদানে মানুষ মানুষ হয়, আর সুরার শিক্ষালয়ে মানুষ তৈরি হয় সুরাপানে।

আরেকটি—

দেখা কিয়ে ওহ্ মস্ত নিগাহোঁ সে বার বার
যব্ তক্ শরাব আয়ে কই দৌর হো সায়ে।— শাদ আজীমাবাদী

সাকী বার বার মদির চোখে আমাকে দেখেছে। মদিরার পাত্র হাতে আসার আগেই অনেক মদের নেশা আমার হয়ে গেছে। সে আঁখির চাহনিতে পানপাত্রের চাইতে অনেক বেশী নেশা—কবির আর কি দোষ বলুন ?

শুনুন—

অঙ্গুর মে থী ইয়ে ময়পানী কী চান্দ বুন্দে
বিস্ দিন খিচ গই হ্যায়, তলোয়ার হো গই হ্যায়।—অমীর মীনাই

আঙুরের মধ্যে ছিল গোবেচারা রসের কয়েকটি বিন্দু, সে রসকে নিংড়ে নিয়ে যখন সুরার রূপ নিল। তখন সেই শান্ত রসবিন্দুরাই তরোয়ালের মত ধারালো অস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো।

আরেকটি—

ছলকৃতী হ্যায় যো তেরে জামসে উস ম্যায় কা ক্যায়া কহনা
তিরে শাদাব হোঠোঁ কী মগর কুছ ঔর হ্যায় সাকী। —জ্জাজ

হে প্রেয়সী, তোমার হাতের, পানপাত্রের ছলকে যাওয়ার তুলনা হয় না। কিন্তু তোমার রক্তিম উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ সে তো তোমার ছলকানো হাতের মদিরার চাইতে আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয়। সে তো অন্য এক অনুভব, অন্য এক স্বর্গ।

এটা শুনুন—

পিলা দে ওক্‌সে সাকী গর হামসে নকরৎ হ্যায়

পেয়ালা গর নহীঁ দেতা না দে, শরাব তো দে। —গালিব

সাকী, আমার ওপর তোমার যদি অভিমান হয়ে থাকে, ঘেন্না হয়ে থাকে, সামনে মদিরা গ্লাসে না ঢেলে দিতে চাও দিও না। মদের পেয়ালা না হয় না-ই দিলে। অঞ্জলি পেতে দিচ্ছি, সেই হাতের অঞ্জলিতে সুরা ঢেলে দাও।

আরেকটি—

মসজিদমে বুলাতে হ্যায় হামে জামিদে নাফহম্‌

হোতা কুছ হোস আগর তো ময়খানে না যাতে। —অমীর

ভ্রান্ত পণ্ডিত, তুমি আমাকে বলছ মসজিদে আসতে। আমাকে তুমি চিনতেই পার নি। আরে, আমার যদি হুঁশ থাকত তাহলে এতক্ষণে পানালয়ে চলে না যেতাম?

এই মেজাজের আরেকটি শের দিয়ে কবিতার ক্লাস বন্ধ করছি। জিগর মুরাদাবাদী লিখেছেন—

কিধর সে বর্ক চমকতী হ্যায়, দেখ ইয়ে বাইজ

ম্যায় আপনা জাম উঠাতা হুঁ, তু কিতাব উঠা।

বিদ্যুৎ কেন চমকায় কোথা থেকে চমকায় এই গভীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে সাধু-মহারাজ, তুমি তোমার শাস্ত্র তুলে নাও, আমি আমার পানপাত্র তুলে নিচ্ছি। সব রহস্যের উত্তর তুমি হয়তো শাস্ত্রে পাও, কিন্তু আমি পাই এই অমৃতের গ্লাসে, এই সুরার বিন্দুতে।

বলেছি না দাগ, মীর থেকে সব আধুনিক উর্দু কবিরাই প্রচুর মগুপত্ত রচনা করেছেন। উর্দুতে সর্‌ মানে ক্যাসাদ আর অব মানে জল।

তাহলে শরাব-এর মানে দাঁড়াল যে জল ক্যাসাদ বাধায়, তাই না? সত্যি, হাঙ্গামা ক্যাসাদের উৎসই হল এই শরাব, মদ, সুরা, কারণ, মদিরা। কাব্য সাহিত্য ছাড়া সুরা আরেক সাহিত্য শাখাকে

সমৃদ্ধ করেছে। সেটা হল হাস্যরসের কৌতুক সাহিত্য। রম্যরসের অনেক উপাদান যুগিয়েছে এই ড্রাঙ্কায়স। তারও নমুনা সরবরাহ করছি কিছু—

এক ভদ্রলোক বার্-এ একসঙ্গে দু গ্লাস মদ নিয়ে বসেছেন।

একজন প্রশ্ন করল, একসঙ্গে দু গ্লাস কেন?

এক গ্লাস আমার জন্য, এক গ্লাস আমার মৃত বন্ধুর স্মরণে খাচ্ছি। সে ড্রিংক্স খুব পছন্দ করত। রোজই আমি ওর আর আমার দুজনের কোটা খাই।

গ্লাস চারেক পরে দেখা গেল। সেই ভদ্রলোক বার্-এ বসে মদ খাচ্ছেন, কিন্তু অবাক কাণ্ড—সামনে মাত্র একটিই গ্লাস।

সেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, আজকে একটাই গ্লাস কেন?

ভদ্রলোক: আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ডাক্তার মানা করেছেন। সেজন্য শুধু মৃত বন্ধুর গ্লাসটাই খাচ্ছি।

আরেকটি—স্বামী স্ত্রী বাড়িতে ককটেল পার্টি দিয়েছিল। সারারাত হৈ-হুল্লোড় গেছে। পরদিন স্বামী স্ত্রীকে ডেকে প্রশ্ন করল, লিলি, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি কিছু মনে কর না। ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্কের পর তো হুঁশ থাকে না। লাইব্রেরী ঘরের সোফার পিছনে কাল রাতে যে মেয়েটির সঙ্গে সহবাস করেছি সেটা তুমিই ছিলে তো?

স্ত্রী চিন্তিত মুখে জবাব দিল, টাইমটা কখন বল তো—রাতের গোড়ার দিকে, না শেষ রাতে, না মাঝ রাতে?

আরেকটি শুনুন—এক মাতাল এসে লাইট পোস্টের গোড়ায় চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছিল।

একজন পুলিশ এসে বলল, কি করছ কি?

ঘরের দরজা খুলছি, জবাব দিল মাতাল।

এটা কি তোমার বাড়ি নাকি? প্রশ্ন করল পুলিশ।

হ্যাঁ বাবা, তুমি অন্ধ নাকি বাপু? দেখছ না দোতলায় আলো জেলে গিয়েছিলাম, এখনও সেটা জ্বলছে।

আরেকটা—দুই মাতাল প্রচুর মাল টেনেছে। তিনতলায় ঘর

একজনের পেচ্ছাপ পেতেই জানালা দিয়ে রাস্তায় হিসি করতে শুরু করল।

অপরজন বলল, এই বাওয়া, কি করছিস? যদি কোন চোর তোর পেচ্ছাপ বেয়ে বেয়ে ওপরে চলে আসে?

প্রথমজন: আমাকে সেরকম বোকা পেয়েছিস নাকি, আমি মাঝে মাঝে বন্ধ করে করে ছাড়ছি। যে চোর এটা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে সে বেটা চিৎপটাং হয়ে নীচে পড়ে যাবে না বুঝি? কি রকম বুদ্ধি বল আমার?

আরেকটা—একজন পর পর পাঁচ পেগ মদ খেয়ে গেল। এক ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি রোজ এরকম ড্রিঙ্ক করেন?

ভদ্রলোক: হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা: আপনি কি জানেন আপনি নিজেকে স্লো পয়জন করে চলেছেন?

ভদ্রলোক: সে ঠিক আছে। মরবার জন্য আমার তেমন তাড়াহুড়ো নেই।

আরেকটা—মাতাল স্বামী বাড়ি ফিরে দেখে স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে। পা টিপে টিপে বাথরুমে গেল। দেখল তার মাথার কাছে একটু কেটে গেছে, রাস্তায় আছাড় খেয়েছিল। তাড়াতাড়ি স্টিকিং প্লাস্টার এনে মাথায় লাগিয়ে চুপি চুপি স্ত্রীর পাশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলা স্ত্রী চেঁচিয়ে জাগাল স্বামীকে, বলল, কাল রাতে আবার তুমি ড্রিঙ্ক করে এসেছ?

স্বামী: না, আলবৎ না।

স্ত্রী: না, তাহলে এস আমার সঙ্গে বাথরুমে এস, দেখ—বাথরুমের এই আয়নায় স্টিকিং প্লাস্টার তাহলে কে লাগিয়েছে?

আরেকটা—ব্যাচেলার ড্রিঙ্ক ঢালতে ঢালতে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, Say when?

মেয়েটি লজ্জিত কণ্ঠে বলল, After second peg.

ছেলেটি মদের মাত্রা জানতে চেয়েছিল, মেয়েটি শব্যাযাত্রার সময় ভেবে বসেছিল!

আরেকটা—একজন বার্-এ ঢুকে বলল, বারটেণ্ডার, আমার একাউন্টে এখানে সবাইকে একটা করে ড্রিঙ্ক দাও। ম্যানেজার সাহেবকেও দাও।

সবাই খুশি হয়ে ড্রিঙ্ক করল। এইবার বিল্ চাইতেই লোকটা বলল, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।

ম্যানেজার লোকটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ছুড়ে মারল। ধুলো ঝেড়ে রাস্তা থেকে উঠে সে আবার বার-এ ঢুকে পড়ল। ঢুকেই চেঁচিয়ে বলল, বারটেণ্ডার, আমার একাউন্টে সবার জন্য একটা করে ড্রিঙ্ক দাও। কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে দিও না। মদ খেলেই ম্যানেজার বড্ড মিসবিহেভ করে।

আরেকটা—এক মাতাল রাস্তায় টলছিল। একজন পুলিশ তাকে ধরে বলল, আপনি বড্ড টেনেছেন। আসুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

পুলিশ লোকটাকে নিয়ে এল একটা বাড়ির সামনে।

পুলিশ: এটা আপনার বাড়ি তো?

লোকটা: আমার বাড়ি। মাই হাউস। কাম ইন। এই দেখুন, এটা আমার ড্রইংরুম। এটা আমার সোফা, সেটি, রেডিও। আসুন স্যার, বাড়ি দেখবেন আসুন। এই দেখুন, এটা আমার স্টাডি, এগুলো আমার বই। এবার আসুন স্যার, এই দেখুন, এটা আমার বেডরুম, এটা আমার বেড, আর ঐ দেখুন বেডে শুয়ে আছে ওটা আমার স্ত্রী, মাই ওয়াইফ, আর ঐ যে লোকটা আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে আদর করছে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে, ওটা কে জানেন? ওটা হল আমি। পুলিশ একেবারে ফ্লুলিশ।

সর্বশেষ কৌতুকটা শুনুন। নইলে এ তাতার তো শেষ হবার নয়!

একটি ক্লাব। সবাই ড্রিংক করছিল। একজন মাতাল দাঁড়িয়ে

উঠে বলল, স্রেফ এক চুমুক খেয়ে আমি হুইস্কির ব্র্যাণ্ড বলে দিতে পারি। চ্যালেঞ্জ করছি আমি, নিয়ে আসুন এনি হুইস্কি, কাম অন্।

মাতাল ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরল। যে যখনই যে গ্লাস দিচ্ছে সে এক চুমুক খেয়েই বলে দিচ্ছে এটা হোয়াইট হর্স, এটা জনি ওয়াকার, এটা লং জন, এটা ওল্ড স্মাগলার, এটা ভ্যাট, এটা সিভাজ রিগ্যাল, এটা দেশী ব্ল্যাক্ নাইট, এটা কুইন এন্। ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক। এমন সময় ক্লাবের ডান্সার মালি হেমোনী বাথরুমে ঘুরে এল গ্লাস নিয়ে। সে গ্লাস বাড়িয়ে বলল মাতালকণ্ঠে, এটা চেখে বলুন তো?

লোকটা: সিওর। তারপর এক ঢোক খেয়েই মুখ বাঁকিয়ে থু থু করে থুথু ফেলে বলল লোকটা, মাই গড্। এটা তো পেচ্ছাপ!

সেটা তো জানি,—বলল সেই মত্ত নর্তকী, এবার বলুন কার এটা? হুজ?

এই ইউনিক জোকের পর এবার আসুন সিরিয়াস প্রসঙ্গে। হুইস্কি টক্ সিরিয়াস কি হয়? নিশ্চয়ই হয়। হুইস্কি থেকেই তো সিরোসিস হয়। আর সিরোসিসের চাইতে সিরিয়াস আর কি হতে পারে বলুন।

প্রস্তর যুগ থেকেই সম্ভবত সুরা মানব সভ্যতার আবিষ্কার। আমাদের প্রাচীন কাব্যে সাহিত্যে সুরার অনেক উল্লেখ রয়েছে। আমাদের ঈশ্বরদের মধ্যে সুরা-রসিকের বৃত্তান্ত রয়েছে। রেকর্ড অনুযায়ী মদের ব্যবসার জন্য কারখানার স্থাপনা প্রথম হয়েছিল জার্মানীতে। ১০৪০ খ্রীস্টাব্দে। আরও কিছু তথ্য জানতে চান। তবে এই নিন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব্রুয়ারী হল আমেরিকার সেণ্ট লুইতে। নাম Anheuser-Busch inc. ১৯৭১ সালে এই কোম্পানি ২৪৩০৮৭১৪ ব্যারেল মদ বিক্রি করেছে। এই কোম্পানি ৯৫ একর জমিতে অবস্থিত। ভাবুন কি এলাহী ব্যাপার। দ্বিতীয় বৃহৎ ব্রুয়ারী হল গিনেস ব্রুয়ারী। আয়ারল্যাণ্ডে সেণ্ট জেম্‌স

গেটে হল এই ব্রুয়ারীর আস্তানা। ৫৮৮·৩ একর জমিতে কারখানাটি বিস্তৃত।

মদের শক্তির উপর নেশা নির্ভর করে জানেন বোধহয়। শক্তি যত বেশী তত বেশী কড়া তার স্বাদ। নির্ভেজাল এলকোহলের শক্তি হল ২০০। রাম ১৯৪ শক্তি পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। পোল্যাণ্ডের এক জাতীয় ভডকা ৯৭·২ পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। তবে বাজারে ১৬০ শক্তির বেশী মদ বিক্রি করা হয় নি। পোল্যাণ্ডের সরকারী ব্রুয়ারী দ্বারা তৈরি 'হোয়াইট স্পিরিট ভড্‌কা'-ই হল পৃথিবীতে সবচেয়ে স্ট্রং মদ। এটা ১৬০ শক্তিসম্পন্ন। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী লিকিওর হল ফরাসী কমলালেবুর গন্ধওয়ালা Le Grand Marnier Coronation ৪৪ ফ্রাংক মানে ধরুন ১২৫ টাকার মত। দামটা ফরাসী দেশের। পৃথিবীতে যে ওয়াইন সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয়েছে তার নাম Chatean Manton ১৯২৯ সালের। দাম ৯২০০ ডলার মানে ৬৩৪০০ হাজার টাকা। এই বোতলটা বড় ছিল, সাধারণ পাঁচ বোতলের সমান। সে হিসাবে এক গ্লাসের দাম দাঁড়ায় ২১০০ টাকা, মানে এক এক চুমুকের দাম ১৭৫ টাকা। এখনো জেগে আছেন, না অজ্ঞান হয়ে গেলেন ?···

নেশাটা কি ? যখন আমরা মদ খাই সেটা সোজা পাকস্থলীর দেয়াল টেনে নেয় ও সেখান থেকে রক্তস্রোতে গিয়ে মেশে। লিভারের কাজ হল রক্তশুদ্ধি। সুতরাং লিভারের উপর চাপ পড়ে ও লিভার রক্ত থেকে এই বিষ আলাদা করে রক্তকে সুরামুক্ত করতে থাকে। লিভার মদের সারাংশকে ধ্বংস করে দেয়। মাত্র ২% পার্সেন্ট শেষ পর্যন্ত রক্তে ও প্রস্রাবে চলে আসে। মদ রক্তস্রোতে মিশলে স্বভাবতই রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, সেজন্য শরীরে সাময়িক উষ্ণতা এনে দেয়। কিন্তু স্নায়ুর ওপর অত্যাচারই সুরার বেশী হয়। স্নায়বিক প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে যায়। মস্তিষ্কে সুরার প্রকোপ আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সাময়িকভাবে বিনষ্ট করে। সেজন্যই ব্যবহার, চলা-বলা থেকে বিচারশক্তি সব হারিয়ে ফেলি আমরা। সেটাকেই

চলভাষায় বলা হয় মাতলামী। স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলার নামই নেশা। মদ কারুর রক্তস্রোতে দ্রুত প্রবেশ করে, কারুর বিলম্বিত লয়ে। সে অনুযায়ী এক একজনের নেশা কম বেশী হয়। এলকোহলের শক্তির উপর, ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্যের উপরও নির্ভর করে পানোন্মত্তার মাত্রা। এবার সুরারসিকদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি ভুল ধারণার উল্লেখ করব। এই 'মিথ,' সব ভিত্তিহীন।

এক: After But Whisky, Very Risky মানে মদ মেশাতে নেই, মেশালেই নেশা বড্ড বেড়ে যায় বা শরীর খারাপ করে। এটা ভুল। নেশা মদের শক্তির উপর নির্ভর করে। বিয়ারে এলকোহল ৬ বা ৭ বা ৮ পার্সেন্ট, হুইস্কিতে ৬০ বা ৭০ পার্সেন্ট, সুতরাং বিয়ার খেলে স্লো চড়বে, এক পেগ হুইস্কিতেই মনে হবে টনক নড়ে গেছে। কারণ এলকোহলের মাত্রার জন্য। সুতরাং যার পর যেটা খুশি খান কোন ক্ষতি নেই। আপনার সিস্টেম এলকোহল যেভাবে গ্রহণ করবে সে অনুযায়ী নেশা হবে। হুইস্কি ও জলের বদলে হুইস্কি সোডাতে বেশী নেশা হয়। কেননা সোডা পেটকে ইরিটেট্ করে ও হুইস্কিকে তাড়াতাড়ি হজম করায়। পেটে খাবার থাকলে নেশা আস্তে আস্তে হয়। খালি পেটে নেশা দ্বিগুণ হয়।

দুই: হ্যাংওভার কাটাবার জন্য ব্ল্যাক কফি, লস্যি, কাঁচা ডিম খুব ভাল। এটাও বাজে কথা। লিভার রক্তকে সম্পূর্ণভাবে এলকোহল-মুক্ত করতে যতটা সময় লাগে তার উপর নির্ভর করে হ্যাংওভার। কফি বা নেবু কোন কাজ করে না। এগুলো মানসিক শান্তির জন্য মাতালরা ভেবে নেয়। ডাক্তারদের মতে এক পেগ হুইস্কি বা অর্ধ বোতল বিয়ার রক্তস্রোত থেকে নির্মূল করতে সুস্থ একটি লিভারের সময় লাগে এক ঘন্টাটাক। বেশী মদ খেলে লিভার কাজ করতে করতে শ্লথ হয়ে যায়। সেজন্যই হ্যাংওভার। ধীরে ধীরে লিভার শরীরকে সুস্থ করে দেয়।

তিন: ড্রিংকস্ যৌন উত্তেজনা বাড়ায় ও যৌন সম্ভোগকে দীর্ঘতর করে। ভুল এটা। সামান্য নেশা যৌনক্রীড়ায় ফলদায়ক হয়, কেননা স্নায়ুর শ্লথচারিতায় যৌন অনুভূতি দীর্ঘ হয়। না হলেও, মনের জোর ও সাহস বেড়ে যায় বলে যৌনভীতি কমে যায়। কিন্তু অধিক মদ্যপান যৌনশক্তিকে সত্যি বলতে, অপহরণ করে। রাজা মহারাজা থেকে জমিদাররা নেশার পর যৌনক্ষেত্রে এত বিফল হতেন যে ডাক্তার বদ্যি হাকিমী থেকে তুকতাক্ কুসংস্কারের প্রচুর কাণ্ড-কারখানা করেও তাঁরা হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। ইংরেজীতে বলে Rich drinkers are poor lovers.

মদ্যপানের অগুণ শুনে যদি ভয় পেয়ে থাকেন তবে ভালই। লিভার যদি কথা বলতে পারত তাহলে এ প্রবন্ধের জন্য আমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করত। মানুষের শরীরে দুটো অঙ্গ সবচেয়ে নামজাদা ও শক্তিশালী। সে দুটো কি কি জানেন? অভিনেতারকার মধ্যে এ দুজন হল ধর্মেন্দর ও অমিতাভ বচ্চন। এই দুটি হল হার্ট ও লিভার। ছেলেদের এই দুই অঙ্গের প্রধান শত্রুও হল দুটি। হার্টের শত্রু নারী, আর লিভারের শত্রু হল মদ—Woman আর Wine. মানব শরীরের সবচেয়ে বৃহৎ অঙ্গ হল লিভার। শৈশবে-শরীরের এক অষ্টমাংশ ও যৌবনে ৫০ ভাগের এক অংশ। লিভার দু'ভাগে বিভক্ত। ডানদিকের অংশ বাঁদিকের অংশের চাইতে দু'গুণ বড়। লিভারের কাজ কি জানতে চান? শুনুন—Regulation of blood volume and manufacture of certain blood clotting factor, storage of glycogen, copper, iron, the metabolism of proteins, carbohydrates and fats, the production of heat, removing of poisonous effects of certain foreign substances in the blood, destrution of old red blood cells and formation of bile.

দেখছেন তো? শরীরের প্রধানমন্ত্রী যেন। কতগুলো পোর্ট-ফোলিও নিজের হাতে রেখেছে দেখছেন তো!

অত্যধিক মদ্যপানের সঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য অঙ্গাঙ্গী জড়িত। দ্বিমুখী এই আক্রমণে লিভার অকেজো হয়ে যায়। সে আর সামান্যতম খাদ্যও হজম করাতে পারে না, রক্ত দূষিত হয়ে যায়। লিভার যেদিন তার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তখনই দেখা দেয় সিরোসিস রোগ। এ রোগ গোড়াতে ধরা পড়লে হয়তো ডাক্তাররা এক-আধজনকে বাঁচাতে পারেন, নইলে cirrhosis মানেই মৃত্যু।

চিত্রজগতে সায়গল, শৈলেন্দ্র, জয়কিষণ, গীতা দত্ত, মীনাকুমারী সবাই এই রোগে মারা গেছেন। সবাই সুরার শিকারী, সবাইকে অতলে তলিয়ে দিয়েছে বোতল, গেলাসেই খালাস। আমার তো ধারণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুজতবা আলীকেও আমরা এভাবেই হারিয়েছি। শিল্পীজগতে (অঙ্কন, সাহিত্য, চিত্র) এই রোগদানবের সাফল্যের সম্পূর্ণ তালিকা খুঁজে বার করলে খুবই দীর্ঘ হবে সে তালিকা। মুশকিল হল এই, প্রথমে শুরুতে বোতল আপনার দাস, ক্রমে ক্রমে ফ্রাংকেস্টাইন হয়ে ওঠে সে বোতল, তখন মানুষই বোতলের দাস। এলকোহলিক তখন আপনি। সেটাই সর্বনাশ। এক-আধটু কখনো-সখনো মন্দ নয়। মদ তখন উর্দু কবিতার শরাব। মদ তখন মদিরা। মাত্রাজ্ঞান হারালেই মদ হয়ে ওঠে বদ তখন সে বদ আপনাকে বধ করে ছাড়বে। আমার মতে মদ আর মেয়ে অল্পবিস্তর দুটোই ভাল। দুটোর সঙ্গেই মাঝে-সাঝে ফ্লার্ট করুন, কিন্তু ধরা দেবেন না। নইলে মেয়ে আর মদ নাছোড়বান্দা হয়ে যাবে। শেষে দেখবেন আপনিই এই দুই আলেয়ার বান্দা হয়ে গেছেন। সাবধান হয়ে যান। জানি সুরার bottle আর নারীর bottom খুবই লোভনীয়। দু বস্তুই বর্টম্ আপ্ মানে খৈয়ামী নন্দনকানন। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকে যেটা নন্দনকানন, কাল সেটাই ক্রন্দনকানন, আজকে যেটা স্বর্গ কাল সেটাই বিসর্গ। মদের বিন্দু আর সিনেমার বিন্দু দুটো থেকেই দূরে থাকবেন। কেননা

আজকে বিন্দুতে লোভ দিলে, কালকে সে বিন্দুই আপনার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবে।

উর্দু কবি যতই বলুক—

"দোকানে ময়পে পৌছকর খুলি হকিকৎ এ হাল
হায়াৎ বেচ রাহা থা, ওহ্ ময়ফরোশ নহীঁ থা।"

মদের দোকানে পৌছবার পর আমি বুঝতে পেরেছি, সুরা-ব্যাপারী সুরা নয়, জীবন বিক্রি করছিল।

মিথ্যে কথা। জীবন নয়, মৃত্যু বিক্রি করছিল। বিশ্বাস করুন। বচন ফকিরের কথা অমৃত সমান, চিয়ার্স, আজ থেকে নো মদ্যপান।

স্ট্রিকিং

অভিধানে পাবেন স্ট্রিকিং (Streaking)-এর মানে হচ্ছে Moving very rapidly like lightning, বাংলায় এক শব্দে বলা যায় 'বিদ্যুৎগতি'। অবশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন কাঞ্চনবাবুর জঙ্ঘা নয়, বিদ্যুৎগতিও, বলা বাহুল্য, বিদ্যুৎবাবুর গতি নয়। স্ট্রিকিং হল আজকালকার নতুন একটা হিড়িক, নতুন একটা ফ্যাড। মার্কিন দেশে এর জন্ম হয়েছে ১৯৭২ সালে, এখন সারা পৃথিবীতেই কলেজের ছেলেমেয়েরা এই নতুন নেশায় মেতেছে। স্ট্রিকিং হল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দৌড় লাগানো। বার্থ ডে স্যুটে ভাগম্ ভাগ। উদোম উত্তম বলা যায় আর কি। শুরু হয় বছর তিনেক আগে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে দুজন ছাত্র ন্যাংটো হয়ে দৌড় লাগিয়েছিল। দুজনেই পড়ল, না নিমুনিয়ার কবলে নয়, পুলিশের কবলে। ওদের কয়েক মাস কারাবাস হয়েছিল। এর কিছুদিন পর দুটি সুশ্রী মেয়ে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্রিকিং করল। গুপ্ত ইতিহাসের নগ্ন পাতায়, না স্যরি, নগ্ন ইতিহাসের গুপ্ত পাতায় এ দুজনের নাম উল্লেখ থাকবে। কেননা এরাই পাইওনিয়ার। মেয়ে স্বাধীনতার অগ্রদূতী বা বলা যায় নগ্নদূতী। এরপর শুরু হল এই ফ্যাড। সাউথ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী স্ট্রিকিং-এর রেকর্ড স্থাপন করলে। কিছুদিন পর কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নগ্নতার রেকর্ড ভঙ্গ করল একসঙ্গে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রী উদোম নৃত্য করে। শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। কে কত বেশি এই নগ্নতার প্রদর্শনী করতে পারে বা কত উদ্ভট ন্যাংটো স্টান্ট দেখাতে পারে। শুরু হল তার নব নব আবিষ্কার।

এ বছরের ৬ই মার্চ ওয়েস্ট জর্জিয়ার পাঁচজন পুরুষ ছাত্র প্লেন স্ন্যাংটো অবস্থায় প্যারাশুট নিয়ে লাফ দিয়েছে। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য নিচে দু'হাজার লোক উপস্থিত ছিল। করতালি দিয়ে তারা অভ্যর্থনা করেছে এই সকল পঞ্চপাণ্ডবকে। কানাডায় একজন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় (ফ্রিজিং পয়েন্টের বিশ ডিগ্রী নিচে) স্ট্রিকিং করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। নিউজিল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের টেস্ট ম্যাচের সময় ত্রিশ হাজার দর্শকদের সামনে নিউজিল্যাণ্ডের একজন ছাত্র স্ন্যাংটো হয়ে দৌড় লাগিয়েছে মাঠে।

লণ্ডনের এক মদের দোকানের মালিক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে কোন মেয়ে যদি স্ন্যাংটো হয়ে আসে তাকে এক বোতল বিয়ার ফ্রি দেওয়া হবে। একটি মেয়ে উদোম হয়ে দৌড়ে গাড়ি থেকে নেমে ফ্রি বোতল সংগ্রহ করে দৌড়ে গাড়িতে চেপে চলে যায়। খদ্দেররা মদ না খেয়েই নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে উঠেছিল। বুঝতেই পারছেন এ হিড়িকের ফিরিস্তি দিলে বিরাট লম্বা হবে তার আকৃতি।

স্ট্রিকিং-এর এই হিড়িকের আগে আমেরিকায় Mooning বলে একটা fad চালু হয়েছিল। হঠাৎ জনসমক্ষে পাৎলুন খুলে পাছা দেখানো হচ্ছে এই খেলার নাম। নিতম্ব প্রদর্শন। নিতম্ব যেহেতু পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ গোলাকৃতি তাই এই পাগলামীর নাম দেওয়া হয়েছিল Mooning। শিশুসুলভ অন্যকে অপমান করার এই নিতম্ব প্রদর্শন প্রতিবাদ করার এক অভিনব প্রক্রিয়া। God father ছবির শুটিঙের সময় মার্লন ব্রাণ্ডো স্টুডিওতে, রাস্তায়, আউটডোর লোকেসনে প্রচুর mooning করেছেন। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরাও বাদ যান নি! Last Tango in Paris ছবির শেষ পার্টি দৃশ্যে মার্লন ব্রাণ্ডোর সাজেসান অনুযায়ীই বার্তোলুসি নায়ক ও নায়িকার প্যান্ট খুলে পাছা দেখিয়ে পার্টির গণমান্য লোকদের চোখ কপালে তোলার দৃশ্যটি চিত্রায়িত করেছেন। Mooning-এর ঢেউ শেষ হতেই শুরু হয়েছে Streaking-এর ঝড়।

মনোবৈজ্ঞানিকরা এই অভূতপূর্ব পাগলামীর নানারকম ব্যাখ্যা

দিচ্ছেন। ইমোরি বিশ্ববিভালয়ের সাইকোলজির প্রধান মাইক নিকোলাস বলছেন—এটা হল জীবনে অসফলতার করুণ প্রতিবাদ, frustration-এর এক নতুন বিজ্ঞাপন। ক্যালিফোর্নিয়ার এক বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট মনে করেন এই fad জনসমক্ষে আত্মপরিচয় প্রকাশ করার এক ছুশ্চেষ্টা। বিখ্যাত হওয়ার জন্য সম্মানজনক কর্ম-পটুতার প্রয়োজন, নইলে ছুর্নামজনক shocking কিছু করার প্রয়োজন। Shock দিয়ে জনমনকে আকর্ষণ করার জন্যই এই নগ্নতার ছড়াছড়ি। এক কথায় Publicity Stunt. Streaking করে সামাজিক কানুনকে ভাঙাতে রয়েছে অন্যায় করে গোপন এক আত্মপ্রত্যয় লাভ। পাপ, অন্যান্য, অপরাধ চিরকালই সামাজিক নাগপাশ বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। সুতরাং লোভনীয়। অস্কার ওয়াইল্ড এজন্যই লিখেছিলেন, 'আমি যা ভালবাসি তা হয় অসামাজিক, অনৈতিক বা বেআইনী।'

নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করা এ যুগের কোন নব্য আবিষ্কার নয়। ৯০০ বৎসর আগে লর্ড অফ কভেনট্রির ধর্মপত্নী লেডী গোডিভা নগ্ন হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ওয়াকউইকশায়ারের প্রজাদের উপর অত্যধিক শুল্ক ধার্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। স্বামীরই বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। জনগণের হয়ে লেডী গোডিভা স্বামীর বিরুদ্ধে এই streaking করেছিলেন। স্বামী বাধ্য হয়ে শুল্ক তুলে নিয়েছিলেন। Sex দেখিয়ে Tax তুলে নেওয়ার দৃষ্টান্ত বোধ হয় এই প্রথম।

আমার মনে হয় shreaking আর streaking একসঙ্গে শুরু হলে দিল্লী সব দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে! ইংলণ্ডের লেডী গোডিভার আগে এই নগ্ন প্রতিবাদ গ্রীসেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভ্যতার অগ্রদূত গ্রীস কেন পিছিয়ে থাকবে? সালামীস দ্বীপ যুদ্ধে অধিকৃত হওয়ার পর নাট্যকার সফোক্লেস এথেন্সের রাজপথে এক নগ্ন শোভাযাত্রার অধিনায়কত্ব করেছিলেন। শোভাযাত্রার শোভা নিশ্চয়ই নগ্নতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। কি বলেন? সরকারের

বিরুদ্ধে streaking-এর প্রতিবাদ যারা করছেন তারা সম্ভবত পাগল। কেননা সে গল্প নিশ্চয়ই জানেন যে এক পাগল ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াত। একজন বললে, এই, তুই কাপড় পরিস না কেন ?

পাগল জবাব দিয়েছিল, কি করব, আমার কোন পাড়ই পছন্দ হয় না।

সে পাগল আর আজকালকার streaker-দের মধ্যে তফাত কি ? সে ন্যাংটো থাকত পাড় পছন্দ হয় না বলে, আর এরা ন্যাংটো থাকছে কেননা এদের সরকার পছন্দ হয় না বলে। দুই একই।

সম্প্রতি দিল্লী, কোচিন, মাদুরাই, আমেদাবাদে কিছু ছাত্র streaking করেছে বলে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। (ছাত্রীরা কেন পিছিয়ে আছেন ?) এরা পশ্চিমী এই পাগলামী নকল করেছে মাত্র। উদ্দেশ্য পাবলিসিটি স্টান্ট দেখিয়ে আত্মপ্রত্যয় লাভ করা ! কিন্তু এরা জানে না এই নগ্নতার উগ্রতা পশ্চিমের দান নয়। এটা আমাদের দেশে প্রাচীন ইতিহাসে অনেক আগেই ছিল। অনেক পশ্চিমী সামাজিক নেতা বলছেন যে streaking আসলে nudist আন্দোলনেরই একটা নতুন শাখা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে জার্মানীতে এই নগ্নতার নব্য সংস্কৃতির জন্ম হয়। জার্মান ভাষায় Nacktbultur মানে naked culturc শুরু হয় কয়েকজন নগ্নতাবাদীর অধিনায়কত্বে। তাঁরা নগ্নতার সপক্ষে বহু সামাজিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি উত্থাপন করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নগ্নতা খুবই স্বাস্থ্যকর আন্দোলন। এই আন্দোলন ক্রমে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, যুগোশ্লাভিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য দেশে নিউডিস্ট কলোনী গড়ে ওঠে। প্রচুর জায়গা নিয়ে এই নগ্নতাবাদীরা ক্লাব, বাসস্থান, সুইমিং-পুল, রেস্তোরাঁ বানিয়ে রীতিমত আধুনিক শহর বানিয়ে নিয়েছে। নিউডিস্টরা সবাই একসঙ্গে নগ্ন থাকেন, আর স্ট্রিকাররা বস্ত্র পরিহিত জনসমক্ষে নগ্ন হচ্ছেন, তফাত হল এই।

কিন্তু না আমেরিকা বা জার্মান, না লেডী গোডিভা বা সক্রেটিস এই নগ্ন আন্দোলনের পুরোধা। এই আন্দোলনের জন্মস্থান হল আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষ। ভিরমী খাবেন না। এটাই ফ্যাক্ট।

আজ থেকে চার হাজার বৎসর আগে মহারাজা জনক তৎকালীন বিখ্যাত ঋষি, মুনি ও মহাজ্ঞানীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে-ছিলেন। সে [illegible] সভায় মহাজ্ঞানেশ্বরী গার্গী এসেছিলেন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। বিত্তার, জ্ঞানের এত বড় বিদগ্ধ নারী নগ্ন হয়ে আসায় অন্যান্য মুনি ঋষিরা অবাক। কয়েকজন গার্গীর এই নির্লজ্জতার সমালোচনা করায় গার্গী জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনারা সত্যিকারের বেদান্তের অর্থ বোঝেন না। সত্যিকারের বৈদান্তিক কখনও নগ্নদেহে শুধু দেহের নগ্নতা দেখতেন না, দেখতে পেতেন দেহাতীত সে মহাসত্যকে, সে মহাজ্ঞানকে, সে মহাবিত্তাকে—যে শক্তির অন্য নাম হল ঈশ্বর। দেহ তো অনিত্য অসত্য, যা সত্য তা অমর, তা দেহাতীত।' ঋষিরা স্বভাবতই চুপ। জ্ঞানেশ্বর ঋষিদের কি ঋষি কাপুরের মত ব্যবহার শোভা পায়? গার্গী তো আর আজকের ডিম্পল নয়। তিনি ছিলেন এম্পল! এম্পল অফ ফ্লেস নয়, এম্পল অফ নলেজ।

এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের বস্ত্র হরণ করে বৃন্দাবনে নিউডিস্ট কলোনী স্থাপন করেছিলেন সেটা কি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের জার্মানদের অনেক অনেক আগে নয়? বলুন? জার্মানদের এই নগ্নতাবাদের দর্শনের অনেক আগে কি মহাজ্ঞানী মহাবীর জৈনধর্মের দিগম্বর সাধু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন নি? জৈনধর্মের এই সম্প্রদায়কে বলা হয় 'দিগম্বরপ'। আকাশই বস্ত্র যাদের, অর্থাৎ দিগম্বর থাকাই যাদের ধর্ম অর্থাৎ নগ্নতাবাদী। তাহলে? এসব কি আজকের কথা?

সেদিন কোপেনহেগেনে যৌন স্বাধীনতার জোয়ারে নারী পুরুষের নানাবিধ যৌন সঙ্গমের ছবির বই বাজারে বেরিয়েছে। কত বিভিন্ন আসন, কত বিচিত্র বিকারগ্রস্ত ভঙ্গী! কিন্তু আমাদের খজুরাহো

আর কোণারকের মিথুনভঙ্গী ও প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার কাছে এসব তো পান্তাভাত। কোণারকে যা বহুকাল আগে জনসমক্ষে প্রকট ছিল, সেটা মাত্র কাল কোপেনহেগেনে প্রচারিত হচ্ছে।

কে আবিষ্কর্তা? ভারতবর্ষের কোণারক, না পশ্চিমের কোপেন-হেগেন? সামাজিক দুঃসাহসিক বিবর্তন যা পশ্চিমে নতুন, তা ভারতবর্ষের অনেক পুরোনো কালের ইতিহাস। অজন্তা ইলোরার টপলেস মেয়েরা অনেক আগে নগ্ন বক্ষ কক্ষ দেখিয়েছেন। ইওরোপ আমেরিকায় টপলেস রেস্তোরাঁ তো সেদিনকার শিশু। ফ্রয়েড মুক্ত মাস্টার ও জনসনের অনেক আগেই বাৎস্যায়ণ 'কামশাস্ত্র' লিখে-ছিলেন। নতুনটা কি?

পশ্চিমের হিপি আন্দোলনের গোড়ায় দেখবেন শিবঠাকুরের কনসেশন। নাট্যবস্তু মহাকাব্য সব আমাদেরই দান। এককালে Random Harvest লিখে হিলটন হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন কেননা উনি নতুন এক নাট্য উপকরণ Amnisia মানে স্মৃতিলোপ এ উপন্যাসে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। একেবারে বাজে কথা। Random Harvest-এর অনেক আগে কালিদাস এই স্মৃতিলোপ ব্যবহার করেছিলেন তাঁর অমর মহাকাব্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' গ্রন্থে। তাহলে বস্ত্রলোপ থেকে স্মৃতিলোপ সব ভারতবর্ষেরই অবদান।

বস্ত্রলোপের কথা লিখতে গিয়ে স্মৃতিলোপে চলে এসেছি। আসুন আবার বস্ত্রহরণ করা যাক। ইদানীং ভারতবর্ষের প্রায় ৫০% ভাগ নরনারী এক না এক ধরনের streaking করছে। সেটা দারিদ্র্যের জন্য। বস্ত্র বা চরিত্র কোনটাই নেই গরীবদের। থাকবে কোত্থেকে, অন্ন না পেলে বস্ত্রও জোটে না, চরিত্রও থাকে না। Pygmalion-এ বার্নার্ড শ এক দরিদ্র চরিত্রের মুখে বলেছেন—Morality? We can't aford it? সত্যি,. এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যজগতে নৈতিকতাও মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। টাকা না থাকলে মরালিটিও সংরক্ষণ করা যায় না। বাধ্যতামূলক নগ্নতা বাদ দিলে থাকে শখের নগ্নতা। সেটা অবশ্য আমার চোখের পক্ষে খুবই

উপাদেয় মনে হয়। বিদেশীদের কাছ থেকে আমাদেরই শেখানো জিনিস নতুন করে ধার করছি আমরা। তবে সত্যি বলব, ইংলণ্ডে একটি নিউডিস্ট কলোনী দেখেছি আমি। সব স্বপ্ন তাতে ধুলো হয়ে গেল। যা ভাবছেন তার উল্টো। ছেলেরা কেউই এপোলো নয়, মেয়েরাও ৩৬″২২″৩৬″ নন। ভেবেছিলাম র‍্যাকুয়েল ওয়েল্‌চ, সোফিয়া লোরেন, ব্রিজিট বার্ডটের ছড়াছড়ি হবে। তার বদলে ঝুলন্ত স্তন, দুরন্ত নিতম্ব ও সঙ্গে দুলন্ত ভুঁড়ি নিয়ে যেসব নগ্ন বামারা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তারা দ্বিপদী হাতি। স্বপ্নো কা সাথী কদাপি নয়। তাই বলছি নগ্ন আন্দোলনের মুশ্‌কিলও আছে। নগ্নিকারা মোটেই সুন্দরী নন। সুন্দরীরা বেশি নগ্ন হতে চান না বোধহয়। ফিগার ভাল যাদের তারা বেশি ইগার নন। কথাটা অবশ্য সর্বৈব সত্য নন। অনেক বিখ্যাত নরনারী নগ্নতার পুজারী। চার্চিল স্নান করার পর অনেকক্ষণ নগ্ন হয়ে চুরুট মুখে পায়চারি করতে ভালবাসতেন। একবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দরজায় নক্ করেছিলেন। নগ্ন অবস্থাতেই অন্যমনস্ক চার্চিল বললেন, কাম ইন। রুজভেল্ট বিবস্ত্র চার্চিলকে দেখে হতভম্ব। চার্চিল হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে বললেন, Now you know Great Britain has nothing to hide from America, সেন্স অফ হিউমার বিব্রত পরিস্থিতিকে রক্ষা করেছিল। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন জ্যাকলিন ওনাসিস গ্রীসে তাঁর স্বামীর প্রাইভেট দ্বীপে যখন নগ্ন হয়ে সমুদ্রস্নান করছিলেন তখন রোমের এক প্রেস ফোটোগ্রাফার টেলিফোটো লেন্স দিয়ে ছবি তুলেছেন। সে ছবি সর্বত্র ছাপা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ এ ঘটনার পর এক পার্টিতে জ্যাকিকে দেখে হেসে বলেছিলেন, Hello jackie, I failed to recognise you with your clothes on.

গ্রেটা গার্বো নগ্ন হয়ে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে ভালবাসেন। স্বর্গীয় মেরিলিন মনরো নগ্ন হয়ে শুতে ভালবাসতেন। একজন

রিপোর্টার প্রশ্ন করেছিল—You sleep without anything on? মার্লিন জবাব দিয়েছিল, Of course not, I sleep with the radio on বুঝুন ঠ্যালা। আমেরিকার অনেক গৃহকর্মী স্বামী অফিস চলে গেলে নগ্ন হয়ে বাড়ির কাজকর্ম রান্না-বান্না করেন। Jaybird club আছে এই গৃহবধূদের জন্য। সেখানে বস্ত্র কাজকর্মে কি রকম বাধা সৃষ্টি করে তার আলোচনা হয়ে থাকে! নগ্নতাবাদের এই হিড়িকে বলা বাহুল্য হাস্যকৌতুকেও অনেক 'নগ্ন কৌতুকী'-র সৃষ্টি হয়েছে। সেসব কৌতুকীর কিছু সংকলন করেছি। আপনাদের শোনাচ্ছি।—

একজন বললে: আমি নিউডিস্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রবার্টসনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। চাকর এসে দরজা খুলে দিলে।

বন্ধু: কি করে জানলে যে ও চাকর?

প্রথম ব্যক্তি: ঝি যে নয় সেটা তো স্পস্ট দেখতেই পাচ্ছিলাম!

* * *

বাবা মশা ছেলেমেয়েদের ডেকে বলল, দুষ্টুমী কর না, আজ তোমাদের পিকনিকে নিয়ে যাব, সেখানে প্রচুর খাবার পাবে। বুকে লাফ বলতে পারো।

মা মশা: কোথায় বলতো?

বাবা মশা: শহরের বাইরে নতুন একটা নিউডিষ্ট কলোনী খুলেছে, সেখানে।

* * *

স্বর্গে শার্লক হোম্‌সের ডাক পড়ল। ঈশ্বর বললেন, দেখহে, স্বর্গ থেকে ইভ উধাও হয়েছে। স্বর্গে গুজব হল পৃথিবীতে অনেক নগ্ন পল্লীর চলন হয়েছে সেখানে ইভ নিউডিস্টদের সঙ্গে যোগদান করেছে। শুনেছি হাজার হাজার নরনারী নগ্ন থাকছে। তাদের মধ্যে থেকে খুঁজে ইভকে ধরে আনতে পারবে?

ঈশ্বরের অনুমতি পেতেই হোমস্ পৃথিবীতে এসে এক ঘন্টার মধ্যেই ইভকে ধরে এনে হাজির করলেন ঈশ্বরের কাছে।

ঈশ্বর অবাক। ঈশ্বর বললেন, হাজারো নগ্ন মেয়ের মধ্যে থেকে কি করে ইভকে খুঁজে বার করলে তুমি?

শার্লক হোমস্ বললে, এলিমেণ্টারী মাই লর্ড, আমি জানতাম ইভ এডামের হাড় থেকে জন্মেছে, মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় নি। ফলে ইভের নাভি থাকবে না। সুতরাং হাজার হাজার ন্যাংটো মেয়ের মধ্যে আমি সেই মেয়েটিকে খুঁজছিলাম যার নাভির ফুটো নেই। এর পর পেতে আর কষ্ট কি বলুন।

ঈশ্বর বলা বাহুল্য চমকিত ও চমৎকৃত হয়েছিলেন।

* * *

ইংলণ্ডের ব্রাইটন অঞ্চলে একটা নিউডিস্ট কলোনীর বাইরে বোর্ড রয়েছে। তাতে লেখা Please bare with us.

নিউডিস্ট কলোনীতে একটি ছেলে ও মেয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে।

ছেলেটি হঠাৎ বলল, এখন আমার দিকে তাকিও না। আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।

* * *

নিউডিস্ট হনিমুন হোটেল। জোড়ায় জোড়ায় নগ্নবাদী নব-বিবাহিত স্বামীস্ত্রীরা ঘর দখল করেছে। কোন ঘর আর খালি নেই। এরপর এক দম্পতি এল। ম্যানেজার বলল, ঘর সব বুক্‌ড হয়ে গেছে। খোলা ছাদে যেতে চান তো দরজা খুলে দিতে পারি। ওরা এখন যায় কোথায়? সুতরাং ছাদেই চলে গেল। ছাদে আলসে ছিল না। স্বামী স্ত্রী জড়াজড়ি করে চুমু খাওয়ার সময় উত্তেজনায় ধারে চলে আসে ও দুজনেই নিচে ফুটপাথে পড়ে যায়। পতনে দুজনেই সংজ্ঞা হারায়। এক মাতাল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সে দুজনকে ওভাবে জড়াজড়ি অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে এসে হোটেলের কড়া নাড়ল। ম্যানেজার দরজা খুলতেই মাতাল বলল, আপনাদের হোটেলের সাইনবোর্ডটা নিচে পড়ে গেছে।

কৌতুকী আর কত দেব। streaking-এর এই হৈচৈ দেখে

চমকাবার কিছু নেই। নগ্নতার আদি জন্ম এদেশেই। আমাদের ইতিহাসে, শিল্পে, কাব্যে, ধর্মে তার নজির রয়েছে। বৃটিশ সভ্যতার ভিক্টোরিয়ান যুগের মনোভাব এদেশে এখনও রয়ে গেছে। ফলে রক্ষণশীলতায় আমরা আর এক extreme-এ পৌঁছে গেছি। এত ঢাক্-ঢাক্ও ভাল নয়। সম্প্রতি দিল্লীতে এক হোটেলে একজন বাথরুমে উঁকি দিচ্ছিল বলে ধরা পড়ে। পরে জানা যায় যে যে বাথরুমে সে উঁকি দিচ্ছিল তাতে যে মেয়েটি চান করছিল সে তারই স্ত্রী। ছ'বৎসর বিয়ে হয়েছে ওদের। কিন্তু স্বামী বেচারা এই ছ' বৎসরে তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একবারও দেখে নি। কি ট্র্যাজেডী। নিউডিজম্-এর আরেক অন্তিম।

নিউডিজমের গুণ অনেক। বয়ঃসন্ধির ছেলেদের পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য নিয়ে দুর্ভাবনায় মুখ ব্রনে ভরে যায়, মেয়েদের দুর্ভাবনা হল স্তনের উচ্চতা নিয়ে। দেহমুখী সাহিত্য ও দেহধর্মী বিজ্ঞাপন দেখে এই অর্থহীন মনোবিকার। নগ্নতার স্বাধীনতা থাকলে ওই সব বিকার লোপ পাবে। দেখুন রীতিমত কঠিন যুক্তি। দর্শনকাম বা প্রদর্শনকাতরতারও উপশম হবে। কি ঠিক কিনা? আজেবাজে যৌন কাগজ কেউ পড়তে চাইবে না। ছবির বই কিনবে না লুকিয়ে লুকিয়ে। 'প্লেবয়'-এর ব্ল্যাকমার্কেট উঠে যাবে। তারপর ধরুন আমাদের এই শ্রেণীযুদ্ধের এক বিরাট অস্ত্র হল বস্ত্র। পোশাক দিয়েই চেনা যায় কে ধনী কন্যা আর কে গরীবের মেয়ে, কে মন্ত্রী আর কে সামান্য যন্ত্রী, কে অভিনেত্রী ও কে দেশনেত্রী, কে রাজা আর কে প্রজা, কে পুলিশ আর কে নক্সাল, কে শিক্ষক আর কে কৃষক, কে ছাত্রী আর কে ধাত্রী, কে মহারানী আর কে ডাক্তারনী, কে মহীয়সী আর কে পাপীয়সী, কে নায়ক আর কে গায়ক, কে গৃহবধূ আর কে বারবধূ। তাই না? পোশাক খুলে নিন, দেখবেন শুধু দুটোই শ্রেণী—নারী ও পুরুষ। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই শ্রেণীভেদ অবশ্য উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। (এই ভেদেই তো জীবনের বেদ রয়েছে। এই difference দেখেই তো ফরাসীতে

সেই বিখ্যাত উক্তি রয়েছে Viva la difference। মানে, জয় হোক এই ভেদের।)

রাজনৈতিক পণ্ডিতরা আশা করি আমার সাজেসান ভেবে দেখবেন। সাম্যবাদের প্রথম সিঁড়ি চড়তে হলে বস্ত্র ত্যাগ হল প্রধান উপায়। ধনীদের কাপড় ধরে টান দিন আগে, তারপর জমি ধরে টান দিন, তারপর অর্থের পুঁজির দিকে হাত বাড়ান।

নগ্নতার সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল মেয়েদের শাড়ি কাপড়ের চাহিদার হাত থেকে রেহাই পাওয়া। ছেলেদের তাতে কি রকম টাকা বাঁচবে ভেবে দেখুন। বেনারসী দাও, সিফন দাও, সিল্ক দাও, কাঞ্জিভরম দাও, ভয়েল দাও, ম্যাক্সি দাও, লুঙ্গী দাও, মিনি দাও, বেলবটস দাও, স্ট্রেচ প্যান্ট দাও, হট প্যান্ট দাও, সারারাদাও, আরও কত নিত্য নতুন ফ্যাশান অনুযায়ী নিত্য নতুন চাহিদা। ওসব থেকে মুক্তি পাবেন। স্বামীরা, বাবারা বেঁচে যাবেন। বিয়ের কনেকে চেলি পরতে হবে না, মন্ত্র পড়লেই চলবে, বাসরঘরে কনেকে দেখতে ঘোমটা তুলতে হবে না, চোখ তুললেই হবে। কাপড় কেনার খরচই শুধু বাঁচবে না, কাপড় ধোওয়ার যাবতীয় খরচও বাঁচবে, সেলাইয়ের খরচও বাঁচবে। মেয়েদের নিজেদের মধ্যে 'শাড়িটা খুব মিষ্টি। কোথা থেকে কিনেছ ভাই?' জাতীয় যাবতীয় অর্থহীন বাক্য বিনিময় কমে যাবে। কম লাভ? সুতরাং streaking-এর জয় হোক। এই নিবারণ থেকেই জাগরণ আসবে। আজকে যদি আমরা কাপড় খুলে এক হতে পারি, কালকে আমরা তাহলে হৃদয় খুলে এক হতে পারব। ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম পদক্ষেপ হল ঐক্যবদ্ধ নগ্নতা। Streaking মানেই Awakeing সুতরাং মাভৈঃ।

কুড়েমি

আমার মতে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ হল কুড়েমি। ন্যাকামি নয়, পাকামি নয়, ভাঁড়ামি নয়, চ্যাংড়ামি নয়, একান্তই কুড়েমি। কুড়ের বাদশার একটা গল্প আছে। সে ভদ্রলোক বিয়ের পর বাসর রাত করতে গেছেন। ফুলশয্যায় বৌকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ পড়ে ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন ভূমিকম্পের। এ হেন কুড়ে ব্যক্তিটি সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। নইলে এত কুড়ে হয়? সত্যি বলতে আলস্য আমার প্রিয়। আলস্য আমার মতে দু'প্রকার। এক নম্বর হল কিছু না করা। সেটা শক্ত। দু'নম্বর হল যে কাজ করতে হয় আপনাকে প্রয়োজনের খাতিরে, জীবনরক্ষার তাগিদে, তা না করে অপ্রয়োজনায় কাজ করা, সে কাজ করা, যাতে মনে শান্তি হয়, সুখ হয়, কিন্তু কর্মের কৃচ্ছ তা হয় না। যার কোন মানে নেই, সে কাজ করাটাই একধরনের কুড়েমি। সে কুড়েমির আনন্দ অঢেল। যেমন ধরুন, আমার সিনেমার গল্প নিয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক না করে যদি আমি মেরিন ড্রাইভের পাঁচিলে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে প্রতিটি চলমান মেয়ের অ্যানাটমি বিশ্লেষণ করি তবে এর মত আনন্দদায়ক কুড়েমি আর কি হতে পারে? বলুন? কত সমস্যা-মূলক প্রশ্ন মাথায় আসতে পারে। যেমন শাড়ি পরা সব মহিলারাই কি আণ্ডারওয়্যার পরেন? কিংবা ম্যাক্সি পরলেও কি ওদের সেক্সী দেখায়? নয়তো এই যে এইমাত্র মেয়েটা গেল, তার চুলটা কি নিজের না পরচুল? আপনারা ভাবছেন এই সব অর্থহীন ভাবনা নিয়ে আলস্যে যারা দিন কাটায় তারা পৃথিবীর মানব-জীবনের কলঙ্ক। কিন্তু তা সত্যি নয়। পৃথিবীর যত শিল্প, যত রূপ, যত

সৌন্দর্য সব অলস মনেরই মানস সরোবর। রবীন্দ্রনাথ তাই 'ভুল স্বর্গ' নিবন্ধে লিখেছেন একজন বেকার যুবকের কথা। সে কুড়ে, সে বেকার। অথচ 'সমস্ত জীবন অকাজে গেল, মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ সে অলস যুবকের সম্পর্কে লিখেছেন—"এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না।

রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে বসতে চায়, শুনতে পায় সেখানেই ফসলের ক্ষেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয় সরে যেতে হয়।

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে। পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন দ্রুত তালের গতের মত। তাড়াতাড়ি সে এলোখোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু'চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে বলে উঁকি মারছে। স্বর্গীয় বেকার মানুষটি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝর্ণার ধারে তমাল গাছটির মত স্থির। জানালা দিয়ে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, একে দেখে মেয়েটির তেমন দয়া হল।

আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই?

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বললে, কাজ করব তার সময় নেই।

মেয়েটি ওর কথা বুঝতে পারলে না। বললে, আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?

বেকার বললে, তোমার হাত থেকে কাজ নেব বলেই দাঁড়িয়ে আছি।

কি কাজ দেব?

তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পারো—

ঘড়া নিয়ে কি করবে ? জল তুলবে ?

না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।

মেয়েটি বললে, আমার সময় নেই, চললুম।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক কখনই পেরে ওঠেন না। মেয়েটি বেকারকে একদিন ঘড়া দিতে বাধ্য হল। সেইটে ঘিরে বেকার আঁকল নানাবর্ণে সুন্দর চিত্র। আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল সেই চিত্র। তারপর "ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলে, এর মানে ?

বেকার লোকটি বললে, এর কোন মানে নেই।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তারপর মেয়েটির সঙ্গে আবার বেকার যুবকের দেখা হয়। রঙিন সুতো বুনে বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেয় সে। মেয়েটি সেই সুন্দর দড়ির উপহারেরও কোন মানে খুঁজে পেল না।

এদিকে কেজো স্বর্গে কাজে ফাঁকি দেখা যেতে লাগল। স্বর্গের প্রবীণরা চিন্তিত। স্বর্গের ইতিহাসে এত বড় অন্যায় আর হয় নি। স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করল। সে বললে, আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি। ভুল লোককে সভায় আনা হল। সভাপতি তাকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার শাস্তি দিলে। সে তার রঙের ঝুলি তুলি কোমরে বেঁধে বললে, তবে চললুম।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রবীণ সভাপতি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন একটা কাণ্ড যার কোন মানে নেই।"

("লিপিকা"—ভুল স্বর্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কুড়েমির সপক্ষে এর চেয়ে ভাল যুক্তি আমি আর কি দেব বলুন। শিল্প, রূপ, প্রেম এসব তো কেজো জগতের কর্মফল নয়, এ হল বেকার জগতের অকর্মের ফসল। কেজো পৃথিবীতে এই সব আলসেমির কি কোন মূল্য আছে, মানে আছে ? নেই।

আজকের এই অর্থহীনতারই তার সবচেয়ে বড় মূল্য। "এর

"কোন মানে নেই" বলেই এ এত অমূল্য, এত বিরল বলেই এত দুষ্প্রাপ্য বলেই এত মূল্যবান এই বস্তু—যার নাম আলস্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রও 'কুড়েমি'র সপক্ষে কম ওকালতি করেন নি। উনি লিখেছেন, "কুড়েমিই যদি না করলাম তাহলে মানুষ হবার দুর্লভ গৌরব কিসের? কাজ তো সবাই করে—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, জড় থেকে চেতন সমস্ত সৃষ্টি কাজের অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা। কুড়েমি করবার অধিকার শুধু একমাত্র মানুষের।"

উনি আরও লিখেছেন, "কুড়ে লোক ফাঁকা মাঠ দেখলে দাঁড়ায়, খানিক বাদে শুয়ে পড়ে। কিন্তু কাজের লোক মাঠ দেখলেই আগেই যায় মাপতে, তারপর দখল করার জন্য লাঠালাঠি বা মামলা না বাধিয়ে তার সোয়াস্তি নেই। ফাঁকা মাঠ দেখলে শুয়ে পড়বার লোক যদি পৃথিবীতে বেশী থাকত, তাহলে মাঠ খুঁড়ে পরিখা কাটার প্রয়োজন অন্তত হত না।"

কি গভীর বিশ্লেষণ। প্রেমেনদা এক লাইনে এই কুড়েমির সংজ্ঞা দিয়েছেন। উনি লিখেছেন, "কুড়েমি মানে তো মনের শূন্যতা নয়, অসীম রহস্যে ডগমগ মনের নিথর নিটোল পূর্ণতা।"

("বৃষ্টি এল"—কুড়েমি : প্রেমেন্দ্র মিত্র)

বাংলা সাহিত্যের দু'জন হস্তী 'কুড়েমি'র মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। এরপর বাংলা সাহিত্যের অনেক মূষিকও সেই সুরেই পোঁ ধরেছে। এতেও কি আপনারা মানতে রাজি নন?

কুড়েমির দৃষ্টান্ত অনেক। আপনাদের একজন ইতালিয়ানের গল্প শোনাই। ঝকঝকে দিন। বছর বিশ বয়েসের একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে টিভলি ফোয়ারার পাশে চোখের উপর টুপি টেনে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। ব্যস্তবাগীশ ধনী এক মার্কিন ভদ্রলোক ছেলেটির চরম আলস্যে রেগে গিয়ে বললেন, ওহে, জলজ্যান্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে হয়ে এভাবে কুড়ের মত ঘুমুতে তোমার লজ্জা করে না?

ছেলেটি চোখের উপর টুপিটা তুলে বলল, না। কেন, আপনার আপত্তি, কেন?

ভদ্রলোক   এই বয়সে তোমার মেহনৎ করা উচিত, কাজকর্ম করা উচিত, পয়সা রোজগার করা উচিত।

ছেলেটি   তারপর?

ভদ্রলোক   রোজগার করে অন্য দশটা পুরুষের মত বিয়ে করা উচিত।

ছেলেটি : তারপর?

ভদ্রলোক : তারপর ছেলেপুলে হলে তাদের মানুষ করা উচিত।

ছেলেটি : তারপর?

ভদ্রলোক : তারপর বৃদ্ধ বয়সে রেস্ট করবে।

ছেলেটি বলল : আমি এখনই তাই করছি। বলে টুপিটা চোখের ওপর টেনে নির্বিকার চিত্তে দিবানিদ্রায় মগ্ন হল।

খাসা লজিক। শেষজীবনে তো ওই বিশ্রামই করতে হবে। মাঝখানে টাকা রোজগার কর, সংসার কর! কি দরকার এই ঝড় ঝামেলায়। তাই সোজা বিশ্রাম করতে লেগে গেছে সে। এতে মনে পড়েছে আমার এক বন্ধুর কথা। সে বিয়ার খাচ্ছিল আর বার বার পেচ্ছাপ করতে যাচ্ছিল। সবাই জানেন বিয়ার দ্রুতবেগে পাকস্থলী কিডনী ব্লাডার হয়ে ইউরিন রূপে বেরিয়ে আসে। আরেক বোতল যখন আনা হল তখন সে বোতল নিয়ে সোজা বাথরুমে চলে গেল। সোজা বোতল উপুড় করে ঢেলে দিল কমোডে। রেগে বিড়বিড় করল, শালা, যাবে তো সোজা যাও। আমার পেটে গিয়ে তোমাকে বেরুতে হবে না। সোজা চলে যাও বাওয়া। অনেক বোকা বানিয়েছ আর বোকা বনছি না বাপু।

আমি আরেক কুড়ের গল্প জানি।

সে ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীর আলস্যে বিরক্ত বিব্রত। একদিন শয্যাবিলাসী স্বামীকে বললে, তোমার এত কুড়েমি করতে লজ্জা করে না। আমার বাবা বাড়ি ভাড়া পাঠান বলে ভাড়া দেওয়া যাচ্ছে। মামা টাকা পাঠান বলে সংসার খরচা খাবার-দাবার চলছে। বড়দা টাকা পাঠান বলে কাপড়-চোপড় কিনতে পারছি।

সব আত্মীয়রা এরকম সাহায্য করছে বলে বেঁচে রয়েছি। এতেও লজ্জা নেই তোমার ?

ভদ্রলোক বললেন লজ্জা বরং তোমারই করা উচিত। তোমার ছোট কাকা এত রোজগার করছে, তোমার জামাইবাবু এত পয়সাওয়ালা অথচ এ দুজন আমাদের এক পয়সাও পাঠান না। এরকম অবিবেচক আত্মীয় তোমারই, আর বলছ কিনা আমার লজ্জা করা উচিত !

এরপর ভদ্রমহিলা লজ্জিত হয়েছিলেন কিনা জানি না।

কুড়েমি স্থবির কোন মানস নয়, কুড়েমি অনেক মহৎ চিন্তার উৎসও। বিশ্বাস করেন না ?

থমাস হব্‌স্ বলেছেন—Leisure is the mother of philosophy.

তাহলে ভাবুন দর্শনের মাতৃমূর্তি হল আলস্য। তার মানে এই নয় যে কুড়ে মাত্রেই দার্শনিক। তবে দার্শনিক মাত্রেই কুড়ে এটা আমি দেখেছি। কুড়ে এক দার্শনিককে জানি যে এত কুড়ে যে জীবনের কোন কর্মই উনি দু'বার করতে নারাজ। সিগারেট অফার করুন—বলবেন, একবার খেয়েছি, আর নয়। চা অফার করুন, একই উত্তর—একবার খেয়েছি আর নয়। হুইস্কির উত্তরও তাই। জিজ্ঞেস করুন, সিনেমা যাবেন ? উত্তর পাবেন, একবার দেখেছি আর নয়।

বলা বাহুল্য, তাঁর সন্তান একটিই।

স্ত্রী একদিন ভয়কণ্ঠে বলেছিলেন, কোন অ্যাকসিডেন্টে যদি আমার মাথা থেঁতলে যায় আমার স্বামী আমার শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ দেখে সনাক্ত করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কেননা সেক্ষেত্রেও 'একবার দেখেছি, আর নয়।' বুঝুন কাণ্ড। দর্শন নিয়ে মত্ত উনি, অন্য কিছু দর্শন করার অবকাশই নেই।

আমাদের মাইথোলজী (ছাপাখানার দাদারা, থ-এর জায়গায় ভুল করে 'খ' ছাপবেন না যেন) খুলে দেখুন, তাতেও কুড়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেক হিন্দুর আলাদা আলাদা 'আইডল' রয়েছে।

কেউ কৃষ্ণভক্ত, কেউ কালী, কেউ রামভক্ত, কেউ দুর্গা। সেদিক দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের সংখ্যায় তো আর কম নেই। ছত্রিশ কোটি। বলা বাহুল্য, স্বর্গে কোনদিন জন্মনিয়ন্ত্রণের ঝামেলা ছিল না। থাকগে। যা বলছিলাম। আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তোর আইডল কে ? সে বলল, আইডল্ মানে ? যে, 'ডল্'কে আমার 'আই' সর্বদা তৃষ্ণার্তের মত দেখতে চায় সে তো ? সে হল—হেমা মালিনী। বোঝ ঠ্যালা। Eye আর Doll-এর সন্ধি ভেবেছে IDOL।

আমি বোঝাই, আরে না না। কোন্ দেবতা বা অবতারের তুমি ভক্ত ?

এবার বোধগম্য হল তার। উত্তর দিল, কর্ণের।

বললাম, বীর ও দাতা কর্ণের ?

না না। সে কর্ণের ভক্ত আমি নই। আমি যে কর্ণের ভক্ত তার নাম কুম্ভকর্ণ। ঘুমের রাজা ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি গণেশ ঠাকুরের ভক্ত। কেননা আমার ধারণা উনিও কুড়ের রাজা। মা দুর্গা যখন কার্তিক ও গণেশ দুই ছেলেকে বলেছিলেন, যা পৃথিবী ঘুরে আয়। দেখি কে তাড়াতাড়ি ঘুরে আসতে পারে।

কার্তিক ময়ূরে বসে সুপারসোনিক জেটের মত উধাও হলেন। কিন্তু মহাচালাক হলেন গণেশ। উনি ভাবলেন ইঁদুর বাহন নিয়ে লোকাল ট্রেনের স্পীডে ঘোরা চাট্টিখানি কথা নয়। এছাড়া চেহারা দেখেই বোঝা যায় গণেশ বাবাজী মহাকুড়ে। তাই বুদ্ধি দিয়ে কাজ সারলেন উনি। চট করে মা'র চারদিকে ঘুরে এসে বললেন, মা, তুমি আমার পৃথিবী। তোমাকে প্রদক্ষিণ করে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ হয়ে গেছে আমার।

মা দুর্গা ছেলের মাতৃভক্তি দেখে মহাখুশি। কিন্তু ভেবে দেখুন, ওই মোক্ষম ডায়ালগটার জন্য গণেশের কত পরিশ্রম কম করতে হল। এরপরও বলবেন গণেশ কুড়ে নন ?

বিয়ে করা, বিশেষ করে মেয়েমানুষকে যে কত ঝামেলার

ব্যাপার তাও ভাল জানতেন গণেশ ঠাকুর। তাই কলাবৌ রেখেছিলেন। কলাবৌ রেখেই মেয়েদের উনি কলা দেখিয়েছেন। শাড়ি দাও গয়না দাও এসবের ঝামেলা নেই। বরং কলাবৌ শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে আর মাঝে মাঝে স্বামীকে ফল খেতে দেবে। কুড়ের ঠাকুরের জন্য উপযুক্ত স্ত্রী। নয় কি? এজন্যই গণেশ ঠাকুরকে আমার পছন্দ।

আজকাল কুড়েইজ্‌ম্ (নতুন আবিষ্কার—আবিষ্কারক আচার্য শচীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক) খুব বেড়ে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে। নিউডিস্ট যারা থাকেন তারা কি আসলে কুড়ে নন? কাপড় কেন, সেলাই কর, তারপর এক এক অনুষ্ঠান অনুযায়ী পর। কম ঝামেলা? তারপর মেয়েদের তো ঘন ঘন ফ্যাশন পাল্টায়। আজ মিনি, কাল বেলবট্‌স্, পরশু লুঙ্গী, তরশু ম্যাক্সি। তারপর ম্যাচিং করে পরা। ছেলেদেরও কখনো ফোল্ডওয়ালা প্যাণ্ট, কখনো ফোল্ড ছাড়া ড্রেন পাইপ, আজকাল বেলবট্‌স্। কোট কখনো দু' বোতাম, কখনো তিন। টাই কখনো সরু, কখনো মোটা। শার্টের কলার কখনও হ্রস্ব কখনও দীর্ঘ। ভাবুন, বস্ত্রপরিধান কত অর্থ, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। নগ্ন থাকা মানে এত সব পরিশ্রম থেকে রেহাই। সেজন্যই, অলসতার জন্যই প্রাচ্যে আজকাল এত নগ্ন আন্দোলনের ঢেউ।

তারপর এই হিপি আন্দোলন। এটাও আলস্যের পূজারীদেরই নতুন দর্শন। চুল কাটা নয়, দাড়ি কামানো নয়, স্নান নয়, কাপড় সামান্য পরলে তার বদলানোর ব্যাপার নেই, না পরলে তো ল্যাঠাই চুকে গেল। এসব কি? কুড়েমিরই জয়গান। ঠিক বলি নি? ঘর নেই, চালচুলো নেই, বিয়ে-শাদি নেই। স্রেফ গাঁজা খাও আর বসে বসে গ্যাঁজাও বা ভোঁস ভোঁস ঘুমোও। সেদিক থেকে আমাদের শিবঠাকুরও কম হিপি ছিলেন না। উনিও কুড়ের ঠাকুর ছিলেন। মার্কিন করুয়াক বা গিন্‌সবার্গ হিপিইজম্-এর প্রতিষ্ঠাতা নন।

শিবঠাকুরই এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ভেবে দেখুন ভুল বলি নি আমি।

কুড়ের সম্পর্কে আরেকটা গল্প আছে।

একটা লোক মাছ ধরতে বসেছে। ফাৎনা ডুবে গেছে তবু সে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। সে বলল, ওহে, ছিপ ধরে টানো, তোমার টোপ তো মাছে খেয়েছে ?

মৎস্যশিকারী বলল, আপনি একটু টেনে দেবেন স্যার ?

ভদ্রলোক টেনে মাছ তুলল ডাঙায়।

মৎস্যশিকারী বলল, বঁড়শী থেকে মাছটাকে খুলে ঝাঁকায় রেখে দেবেন স্যার ?

লোকটা তাই করল।

তখন শিকারী আবার বলল, ওই ডালা থেকে টোপ লাগিয়ে ছিপটাকে আবার জলে ফেলে দেবেন স্যার ?

লোকটা এবারও কথামত ছিপ ফেললে। তারপর তাকিয়ে দেখে লোকটা যথারীতি আবার ঝিমুচ্ছে। ভদ্রলোক এবার বললেন, তুমি যদি এতই ক্লান্ত তবে ছেলেপুলেকে বল না কেন মাছ ধরতে ? তারাই তো তোমার কাজ করতে পারে

আধ বোজা চোখ তুলে লোকটা বলল, কথাটা ঠিক বলেছেন। আপনার জানাশোনা কোন গর্ভবতী মেয়ে আছে স্যার ?

বুঝুন! এর চেয়েও কুড়ে লোক আপনার জানা আছে ? বৌয়ের সঙ্গে বাসরঘরে শুয়ে যে ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করে এ লোকটা তার চেয়েও কুড়ে

যাই বলুন, কুড়েমির একটা স্বাদ আছে। রকে বসে আড্ডা বা কফি হাউসে গ্যাঁজানোর চাইতে এই শীতে লেপের তলায় কুম্ভকর্ণ হওয়া অনেক বেশী আরামপ্রদ নয় ? যত খুশি স্বপ্ন দেখুন কেউ আপত্তি করবে না। আদিরস থেকে অনাদিরসের সমুদ্রে হাবুডুবু খান কেউ তার জন্যে আপনাকে দোষী করবে না। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এত আলসেমীর মানে কি ?

আপনি জবাব দেবেন—'এর কোন মানে নেই।'

ইণ্টার ন্যাশনাল ব্রিডিং ব্যাঙ্ক ২০৫০ সাল

বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রুখিবে কে ? কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল চাঁদে হাত দেওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা রয়েছে শুধুমাত্র মুকুল দত্তের। কেননা উনিই চাঁদ উসমাজীর স্বামী। কলকাতার চাঁদের কথা জানি না। , রাজশ্রী বসুর ডাক নাম নাকি চাঁদ। ওঁর অবশ্য স্বামী হয় নি এখনও, অন্য কোন আসামী আছে কিনা জানা নেই। আসামীদের ব্যাপার শ্রদ্ধেয় বিমল মিত্রের জানা থাকার কথা। উনিই আসামীদের মাঝে মাঝে হাজির করিয়ে থাকেন! যাকগে। বলছিলাম বিজ্ঞানের কথা। আর্ম.যতোই স্ট্রং হোক চাঁদে হাত দেওয়া চাট্টিখানা কথা নয়। চাঁদ দূরে থাক আমার তো মশাই ছাদেও হাত দিতে ভয় হয়। তবু দেখুন মার্কিন দেশের কোন এক নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে শুধু হাত নয়, পা দিয়েও চলে এল। সব বিজ্ঞানের বাহাদুরী। সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হরগোবিন্দ খরোনা সাহেব 'জীবন' সৃষ্টিতে ব্যস্ত। উনি আর্টি-ফিসিয়েল 'জেনি' প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন। ভাবুন কি কাণ্ড, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, সেক্স নেই, বিয়ে নেই তবুও ল্যাবরেটরীতে প্রাণের জন্ম হবো হবো। খরোনা সাহেবের আবিষ্কার আমাকে খুশী করতে পারছে না। জীবনের সারাংশ যৌবনের আগডুম বাগডুম ছাড়া জীবনের জন্য কেমন বিস্বাদ ব্যাপার! খোদার ওপর খোদকারী করে লাভ কি ? তাই বলি, খরোনা, ও কাজটি তুমি করো না।

সম্প্রতি আর্ট বুশওয়াল্ড লিখেছেন আমেরিকায় জানোয়ারদের বীর্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বিখ্যাত স্বাস্থ্যবান ষাঁড়ের শুক্রকীট বাঁচিয়ে রাখছেন ও সেটা কোন দুর্বল জাতীয়

গাভীকে দিয়ে সুস্থ বাছুরের জন্ম দেওয়াচ্ছেন। টেস্টটিউব বেবী বলতে পারেন। এতে ভালো জাতের ক্যাটল্ তৈরি হবে। দুধও বেশী দেবে এইজাতের ক্রশব্রিড গরুর পাল। সারা পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে সুস্থ জানোয়ারের শুক্রকীট সংগ্রহ করে রাখা হবে এই ব্রিডিং ব্যাংকে ও যে কোন কৃষক কিনতে পারবে এই সুস্থ জানোয়ারের জীবনীশক্তি। আর্ট বুশওয়াল্ড় লিখেছেন জানোয়ারের ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া গেছে সুতরাং বলা বাহুল্য কিছুদিন পর মানুষের ক্ষেত্রেও সফলতা প্রাপ্ত করবে এই বিজ্ঞানীরা।

সুতরাং আসুন দু'হাজার পঞ্চাশ সালের একটি দিনের কথা ভাবা যাক। সারা বিশ্বে ততদিনে ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রিডিং ব্যাংক-এর স্থাপন হয়েছে দু-ভাগে। একদিকে 'এনিম্যাল সেকসান'। অন্যদিকে 'হিউম্যান সেকসান'। হেড অফিস জেনিভা। এটা 'হু'র দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'হু' মানে W. H. O মানে ওয়ার্লড হেল্থ ওর্গানাইজেশন। সে আগামী যুগের একদিনের ঘটনা শুনুন। নব বিবাহিত দম্পতি। নাম দুর্বলচিত্ত ভট্টাচার্য ও স্ত্রীর নাম যৌবন-বহ্নি। দুর্বলচিত্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে কিন্তু বাবা, ঠাকুরদা হার্টের অসুখে মরেছেন বলে নিজে দুর্বলচিত্ত নাম নিয়েছেন ও বিয়ের আগেই ঠিক করেছিল যৌবনবহ্নির সঙ্গে পরামর্শ করে যে নিজে সন্তানের বাপ হবে না। প্রতি জায়গায় যখন ব্রিডিং ব্যাংক রয়েছে তবে কেন হার্টের দুর্বলতাসহ শিশু জন্ম দেওয়া? এই হেরিডিটির কলঙ্কমোচনের অমোঘ উপায় রয়েছে ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রিডিং ব্যাংক, হিউম্যান সেকসানে। ইচ্ছেমতো সন্তান পাওয়ার অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা কাজে লাগাতে মনস্থ করলেন ওঁরা। সুতরাং একদিন স্বামী-স্ত্রী সোজা এসে দাঁড়ালেন ব্রিডিং ব্যাংকের কাউন্টারে।

সেচ বিভাগের কর্মচারী বৃষকেতু সরকার এগিয়ে এলেন,—বলুন, কি চাই? আপনারা কিনতে এসেছেন তো? কার 'জন্মবীজ' চাই বলুন? সব ফ্রিজ্ করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এখানে।

দুর্বলচিত্ত বললেন, আমি ফুটবলের খুব ভক্ত। ভালো ফুটবল প্লেয়ারের মধ্যে কার কার স্টক আছে? সুভাষ ভৌমিক বা চুনী গোস্বামীর পাওয়া যাবে?

কর্মচারী : স্যরি, চুনীর তো দু'বছর ধরে সোল্‌ড আউট। সুভাষের কালকে পর্যন্ত ছিল কিন্তু এক পাঞ্জাবী দম্পতি লাস্ট স্যাম্পল্ নিয়ে গেছে। সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের রয়েছে। চাই?

স্বামী : দিন না।

স্ত্রী : চেঁচিয়ে উঠলেন,—না, চাই না।

স্বামী : মোহনবাগানের ক্যাপটেন ছিলেন।

স্ত্রী : জানি। কিন্তু খেলার চাইতে রেফারীর নাক ভেঙেছে বেশী। আমি এমন ছেলে চাই না যে খালি রেফারীর নাক ভাঙুক। সভ্যভব্য আর্টিস্টিক ছেলে চাই। করেন আর্টিস্টের আছে? পিকাসোর?

কর্মচারী : পাবেন। দেবো?

স্বামী : না মশাই। অগ্নি, তুমি ভুলে গেছো চাটুয্যে, আরে আমাদের কুমড়োপটাশ চাটুয্যে পিকাসোর নিয়ে গিয়েছিল না? তাদের ছেলে কি হয়েছে? পাঁচটা বিয়ে করেছে শুধু। ছবি মোটেই কিছু আঁকে নি!

কর্মচারী : সেটা সম্ভব। দাতার সব কয়টি গুণ পাবে এরকম না-ও হতে পারে। হয়তো ওদের সন্তান পিকাসোর আঁকার ক্ষমতা পায় নি, শুধু ওঁর বার বার বিয়ে করার গুণটা পেয়েছে।

স্ত্রী : তাহলে চাই না বাপু। ফিল্মস্টারের রয়েছে?

কর্মচারী : হ্যাঁ। তবে দিলীপকুমার, উত্তমকুমার ও রাজেশ খান্নার সব ফুরিয়ে গেছে।

স্বামী : ধর্মেন্দরের রয়েছে?

কর্মচারী : ওর স্টক তো মশাই এক মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সব নতুন স্বামী-স্ত্রীরা ধর্মেন্দরের জন্তে পাগল। তবে রাজেন্দ্রকুমারের রয়েছে।

স্ত্রী : না। রাজেন্দ্র তো দিলীপকুমারের নকল করতেন, তার চাই না। অরিজিন্যাল হওয়া চাই।

কর্মচারী : পতৌদির চাই। ভালো ক্রিকেটার ছিলেন।

স্বামী : না মশাই। যদি বড় হয়ে একটা চোখ কানা হয়ে যায়? সব মেয়েই তো শর্মিলা নাও হতে পারে। তখন ছেলের বিয়ে দিতে প্রাণান্ত হবে। ওয়াডেকার বা ইঞ্জিনিয়রের নেই?

কর্মচারী : না স্যরি। গভসকার পাবেন।

স্ত্রী : না। বড্ড তাড়াতাড়ি ওর ফর্ম নষ্ট হয়েছিল। ওর চাই না।

স্বামী : রাইটার কারুর আছে।

কর্মচারী : সমরেশ বসুর চলবে?

স্ত্রী : না। খালি 'বিবর' আর 'প্রজাপতি' লিখবে।

কর্মচারী · শচীন ভৌমিকের?

স্ত্রী : মাগো, নোংরা নোংরা প্রশ্নোত্তর দিতেন তো? ঠাকুমা বলতেন ওর কথা। অশ্লীল লেখকদের বাদ দিয়ে ভালো লেখকদের নেই। যেমন বিমল মিত্র?

কর্মচারী : না। পুরনো জমিদার পরিবারের বৌরা সব নিয়ে গেছে। ওঁদের প্রিয় লেখক তো উনিই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু রয়েছে বোধ হয়।

স্বামী : না। বড্ড ড্রিংক করতেন। সত্যজিৎ রায়ের?

কর্মচারী : স্যার, ব্ল্যাকে বিক্রি হয়েছে। এখনও সে কর্মচারী ও ম্যানেজারের নামে সি, বি, আই-এর কেস চলেছে। ম্যানেজার এত লোভী ছিলেন যে আসল ফুরিয়ে যাওয়ার পর বি, আর ইসারার সত্যজিতের বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। উনি সাসপেণ্ডেড। জেল হয়ে যাবে বোধ হয়। ঋত্বিক ঘটকের চলবে? তবে একটা ভয় আছে। মানে এলকহলিক হতে পারে সন্তান।

স্ত্রী : না। বিপদ দেখছি। যা পছন্দ তাই দেখছি আউট অফ্ স্টক্।

কর্মচারী : বিদেশী নিন। আরব কোন লিডারের দেবো?

স্বামী : না। খালি হাই জ্যাকিং করবে হয় তো। কেনেডীর আছে ?

স্ত্রী : না, ভয় করে। ওদের পরিবারের বেশির ভাগই অপঘাতে মরেছে। জেনেশুনে নিতে চাই না।

কর্মচারী : তা ঠিক। দেশী মন্ত্রী চলবে ? পি সি সেন, বিধান রায় ও অজয় মুখার্জির অনেক স্টক।

স্বামী : জানি স্টক ওতে রয়েছে কেন। এঁরা সবাই ব্যাচেলর ছিলেন। ছেলে বিয়ে না করে চিরকুমার থাকুক ওটা আমরাও চাই না।

কর্মচারী : দেখুন সব লেবেল্ লাগানো। এদেশী বিদেশী সব রয়েছে। পছন্দ করে বলুন।

হঠাৎ স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি।

স্বামী : কার ?

স্ত্রী : দেখো, ছেলের নাম আগেই ঠিক ছিল আমার মনে। ঠিক করেছি নাম রাখবো মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি বললে ড্রিংক বেশি করতেন, মানিক ওরকে সত্যজিৎ রায় শুনলে যে র‍্যাকে বিক্রি হয়েছে। আরেক মানিক দেখো এখনও রয়েছে। আমি এটাই চায়।

স্বামী লেবেল্ পড়লেন, জেনারেল মানিক শা।

স্বামী খুশি হয়ে, আমি রাজি। যুদ্ধে জিতেছিলেন ও বাংলা দেশের মতো দেশকে মুক্ত করেছিলেন। পরে ফিল্ড মার্শাল হয়েছিলেন। শুনছেন বৃষবাবু।

কর্মচারী দৌড়ে এলেন।

স্বামী : এটাই দিন। জেনারেল মানিক শা।

কর্মচারী : ভেরী গুড্। খুব লাকি আপনারা। ওটাই ওর লাস্ট স্যাম্পল। এরপর ওঁর স্টকও আউট হয়ে গেল। নিন, বিল করে দিচ্ছি। পেমেন্ট করুন ওই কাউন্টারে।

স্ত্রী : বেশ।

স্বামী : চলো। কাজের মতো কাজ হল একটা। —

দুজনে হাতে হাত ধরে ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল জেনারেল মানিক শা'র জীবনী বীজ।

২০৫০ সালের ঘটনাটা কেমন লাগল? ভাবছেন গুল্ মারছি? না মশাই, এটাই ঘটবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমি নিঃসন্দেহ। জয় হোক বিজ্ঞানের।

কাগজ

কাগজ নিয়ে বসে মগজে যখন কিছু গজাচ্ছে না তখন কলকের একটা টান দিতেই মনে হল কাগজ নিয়েই গজগজ করা যাক খানিকটা, গজগজ না করতে পারি, গুজগুজ করা যাক। আমাদের জীবনে কাগজের স্থান অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। খবরের জন্যও কাগজ রয়েছে, খাবারের জন্যেও কাগজ। প্রণম্য শাস্ত্র গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরান শরিফ, বাইবেলে রয়েছে কাগজ। আবার মুখ মোছার জন্য টিস্যু পেপার থেকে পিছন মোছার জন্য টয়লেট পেপার পর্যন্ত সর্বত্র কাগজের জয়জয়কার। মোটা মোটা থিসিস লিখে এই কাগজ মারফতই অনেকে নিজেদের দিগ্‌গজ প্রমাণিত করছেন।

কাগজ ধার্মিকদের জন্য শাস্ত্র হয়েছে, আবার বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র। কাগজ কথাটায় 'গজ' রয়েছে বলেই মনে হয় অনেক সাহিত্যিকরা হাতির মত মোটা মোটা উপন্যাস লিখেছেন। সত্যি বলতে আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই কাগজী, একমাত্র নেবু ছাড়া কাগজী সব কিছুই শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক। প্রেমপত্র থেকে আত্মহত্যার পত্র (যদিও দুটো একই। প্রেম ও আত্মহত্যায় কোন তফাত নেই। মেয়ে ও মৃত্যুতে কি তফাত? ম্যারেজ আর মার্ডার মানে একই। বিবাহ যা, উদ্বাহও তাই। বাসর রাত মানেই শেষের রাত, ফুলশয্যাই শূলশয্যা; নারীকেই জাপানী ভাষায় সম্ভবত বলে 'হারাকিরি', 'উম্যান' মানে আসলে 'আমেন'।) সর্বত্রই কাগজ। একজন কাগজেই লেখে 'আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে তোমার জন্যই বেঁচে আছি।' আবার আঁরেকজন কাগজেই লেখে—'আমি তোমাকে এত ঘৃণা করি যে তোমার জন্যই মরতে যাচ্ছি'। বুঝুন

কাণ্ড, কাগজেই একজন 'ভালবাসি' করে মরছে, আ রকজন 'ফাঁসি দিচ্ছি' বলে বাঁচছে। তার মানে পেপার কারুর কাছে পাঁপরের মত কুড়মুড়ে, কারুর কাছে 'পিপারে'র মত চিড়চিড়ে। এই কাগজেই বিপ্লবী সাহিত্য লিখে কেউ জেলে গেছেন, কেউ আবার জেলে গেছেন অশ্লীল সাহিত্য লিখে। দিগ্‌গজ সাহিত্য বা দিগম্বর সাহিত্য—দু'ক্ষেত্রেই কাগজের প্রয়োজন। এই কাগজেই তিন নদীর সঙ্গমের ছবি ছাপা হয়েছে (প্রয়াগের ......র্থে), আবার তিনজন নরনারীর একত্রে দৈহিক সঙ্গমের ছবিও ছাপা হয়েছে (কোপেনহেগেনের নগ্নসঙ্গতীর্থে)। আর কত বলব বলুন। প্রফেসরের নোট থেকে উকীলের প্রোনোট এবং সর্বোপরি আমাদের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে বস্তু সেই টাকার নোট, সব কিছু কাগজেই তৈরি। যে টাকা না থাকলে আপনি পাতলা রঙিন কাগজের ঘুড়ি কিনতে পারবেন না, পাতলা রঙিন শাড়ির ছুঁড়িও না। ভাবুন তাহলে কাগজ কি বস্তু। এ বস্তু ছাড়া মানুষের অবস্থান অসম্ভব। এ বস্তু না থাকলে আপনি আসলে উদ্বাস্তু। বুঝেছেন ?

কাগজ নিয়ে আলোচনা করতে করতে একটা কৌতুকী মনে পড়ছে। কৌতুকীটা যুদ্ধ নিয়ে শুরু, কাগজ দিয়ে শেষ। শুনুন।

একজন নারীবিদ্বেষী স্বাস্থ্যবান যুবক খুবই দেশভক্ত। একদিন সে ঠিক করল সে যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে নাম লেখাবে। বন্ধুরা তার সাহসকে প্রশংসা জানাল। সে বীরদর্পে রিক্রুটিং অফিসে নাম লেখাতে গেল। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে নাম না লিখিয়ে ফিরে এল। বন্ধুরা ঘিরে ধরল তাকে। বলল, কি রে, মরবার ভয়ে ফিরে এলি ? এই তোর দেশভক্তি ? এই তোর সাহস ? ছেলেটি বলল, আরে না, সেজন্য নয়। মেয়েদের হাতে লাঞ্ছনা হতে হবে ভেবেই জয়েন করলাম না।

বন্ধুরা অবাক, সে কি রে, যুদ্ধে মেয়েরা আসে কোত্থেকে। ছেলেটি বলল, তবে শোন্। ধর সৈনিক দলে নাম লেখালাম। দেন দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্—হয় আমাকে পিছনে রাখবে, নয় ফ্রন্টে

পাঠাবে। পিছনে রেখে দিলে নো প্রবলেম। কিন্তু ফ্রন্টে পাঠালে এগেন দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় যুদ্ধে আমি শত্রুকে মারব নয়তো শত্রু আমাকে মারবে। আমি শত্রুকে মারলে নো প্রবলেম্, কিন্তু শত্রু আমাকে মারলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় আমি আহত হব, অথবা নিহত হব। আহত হলে নো, প্রবলেম্ কিন্তু নিহত হলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় ওরা আমাকে জ্বালিয়ে দেবে নয়তো ওরা আমায় কবর দেবে। জ্বালিয়ে দিলে নো প্রবলেম্, কিন্তু কবর দিলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। ওরা পাথুরে জায়গায় কবর দেবে বা মাটি চাপা দিয়ে কবর দেবে। পাথর দিয়ে কবর দিলে নো প্রবলেম্, কিন্তু মাটি চাপা দিয়ে কবর দিলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় আমার কবরের ওপর বড় বড় গাছ জন্মাবে, নয়তো ঘাস জন্মাবে। ঘাস জন্মালে নো প্রবলেম্ কিন্তু বড় গাছ জন্মালে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় সে গাছের কাঠ দিয়ে ফার্নিচার তৈরি হবে, নয়তো সে গাছের কাঠ থেকে কাগজ তৈরি হবে। ফার্নিচার তৈরি হলে নো প্রবলেম্। কিন্তু কাগজ তৈরি হলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় সে কাগজ দামী ভাল কাগজ হবে, নয়তো সস্তা বাজে কাগজ তৈরি হবে। দামী কাগজ হলে নো প্রবলেম্ কিন্তু সস্তা বাজে কাগজ তৈরি হলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্। হয় সে কাগজ দিয়ে খবরের কাগজ তৈরি হবে নয়তো সে কাগজ দিয়ে টয়লেট পেপার তৈরি হবে। খবরের কাগজ হলে নো প্রবলেম্, কিন্তু টয়লেট পেপার হলে দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস্।

বন্ধুরা ভির্মি খায় আর কি। এরপরও কি দুটো পসিবিলিটিস্ হতে পারে ওরা ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু ছেলেটা বলে চলল, বুঝলি না এখনো। দেখ, টয়লেট পেপার হয় পুরুষরা ব্যবহার করবে, নয়তো মেয়েরা ব্যবহার করবে। পুরুষরা ব্যবহার করলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়েরা আমাকে তাদের বটম্ সাফ করার জন্য ব্যবহার করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে রাজী

নই ভাই। সেইজন্যই আমি যুদ্ধে যেতে রাজী হলাম না। মেয়েদের পায়ুর জন্য আমি আমার আয়ু কখনই দেব না।'

বন্ধুরা সবাই ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে দিনের আকাশেই অজস্র তারা দেখতে পেয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

দেখলেন তো যুদ্ধ থেকে কাগজে নেমে আসার অসাধারণ কৌতুকী!

কাগজ আজকের আবিষ্কার নয়। খুবই প্রাচীন ব্যাপার। এই বস্তুর আবিষ্কারক হল শচীন। মাফ করবেন, ওটা শচীন হবে না, হবে চীন। হ্যাঁ, চীনদেশ প্রথম আবিষ্কার করেছে এই কাগজ। চীনের এই মহৎ আবিষ্কার আজকাল কোচিন থেকে ইন্দোচীন, যে কোন অর্বাচীন থেকে যে কোন শচীন, সবাই কলঙ্কিত করে চলেছে। ৫৯৪ সনে এই কাগজ চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেছে। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে তারপর। সেদিনের চায়না অনেক সেয়ানা হয়েছে। কাগজ মারফতই আমরা জানতে পারছি যে চায়না আজকাল অন্য কোন দেশের ময়না হতে চায় না। এখন অনেকের কাছে সে গয়না, আর অনেকের কাছে হায়না।

কাগজ চীনী ব্যাপার কিন্তু কাগজ ছাপার যন্ত্র হল মার্কিনী আবিষ্কার। ১৮০৯ সনে জনৈক ডিকিনশন আমেরিকান নেশনকে এই মেশিন উপহার দেন। লোককলা থেকে হয়ে গেল যন্ত্রকলা। ব্যাস, শুরু হল যন্ত্রণা।

তবে এর আগেই যন্ত্র ছাড়া কাগজ মারফত ছাপার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছাপার যন্ত্র প্রথম তৈরি হয় জার্মানীতে। আবিষ্কারক গুটেনবার্গ। ১৩৯৪ সালের ব্যাপার। ছাপার কাজ ব্যবসায়িকভাবে শুরু হয় ১৪৪৮ সালে। সংবাদপত্র প্রথম ছাপা হয় ১৫৮২ সালে ইংলণ্ডে। ধর্মীয় কাগজ। নিয়মিতভাবে নিউজ বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছে ১৬৬২ সাল থেকে। এ'ও ইংলণ্ডের কাজ। তার মানে চীন, জার্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা সবার দান রয়েছে এই কাগজ ও মুদ্রণের ইতিহাসে।

সারা বিশ্বে কাগজ সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় সংবাদপত্র মুদ্রণে। মানে খবরের কাগজে। রাজনীতির জন্য সংবাদপত্র একান্ত প্রয়োজনীয়। মানে কনস্টিটিউশন থেকে কনস্টিপেশন সর্বত্র খবরের কাগজের দরকার। গদীতে বসে কাগজ না পড়লে অনেকের মাথা পরিষ্কার হয় না, আবার কমোডে বসে কাগজ না পড়লে কারুর পেট পরিষ্কার হয় না। ফ্রেশ মেয়েদের মত সকালে ফ্রেশ কাগজ পাওয়ার জন্য সবাইকার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে। ফ্রেশনেস চলে গেলে মেয়েদের যেমন কদর কমে যায়, পড়া হয়ে গেলে কাগজেরও সেই একই অবস্থা। সকালের তাজা কাগজ যেন তাজা একটি নগ্ন সোমত্ত মেয়ে। লুফে নেয় সকলে। পরে কি হয়? কি আবার, নো চার্ম। খবর পড়া কাগজ আর কাপড় পরা মেয়ের কি আর আকর্ষণ বলুন। কাগজে আর মেয়েতে অনেক মিল কিন্তু। দেখুন, কাগজের শেষের পাতায় থাকে স্পোর্টস্ সেকসন, মেয়েদেরও, ইয়ে, মানে, স্পোর্টস্ সেকসনটা শেষের দিকেই থাকে! নয় কি? এছাড়া খবরের কাগজ আগাগোড়া মিথ্যেয় ভরা, মেয়েরাও তাই। কাগজে খালি ফল্‌স, আর মেয়েদের খালি ফল্‌সি। কাগজের দিকে তাকালে প্রথমে চোখে পড়ে বিজ্ঞাপন, মেয়েরাও আজকাল শুধু বিজ্ঞাপন। একজন বলেছেন, Papers are for crying and lying মানে সংবাদপত্র শুধু নানা দুঃসংবাদে ভর্তি থাকে আর থাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে। মেয়েরাও তাই। ওরা crying-এর জন্য বিখ্যাত, আর lying-এও ওদের জুড়ি নেই। সে lie মানে মিথ্যে কথাই হোক বা শোয়াই হোক। যে সব ছেলেরা lie বলা মেয়েদের লাই দেয় তারা জানে কত তাড়াতাড়ি ওরা বিছানায় lie down হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সব মেয়েরই এক রা। সে মালাইয়ের মত নরম মেয়েই হোক, বা ভিলাইয়ের মত শক্ত মেয়ে। দেখলেন তো কত মিল। নতুন কাগজ আর নতুন মেয়ে তো নেশা মশাই। সর্বনাশা নেশা বলা যায়। নেশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সুরঞ্জনাই তখন আবর্জনা। সব পেপারই তখন টয়লেট পেপার। মেয়েদের সঙ্গে

শুধু খবরের কাগজের তুলনা চলে বললে কম বলা হয় না। বইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকে। বিশেষ করে ডিটেকটিভ নভেলের সঙ্গে। দেখুন এটাও কাগজেরই ফসল। রহস্য উপন্যাসের রহস্যের নিরসন করতে হলে কোথায় পাবেন সেটা? উপন্যাসের অন্তিম ভাগে। মেয়েদেরও সব রহস্যের সমাধান থাকে অন্তিম ভাগেই। ডিটেকটিভ নভেলের শেষের দিকের পা খুলুন — আহা, বইয়ের আবার পা হয় না কি, আমি বলছিলাম পাতা খুলুন, দেখবেন সব রহস্যের সমাধান সেখানে, রহস্যময়ী নারীজাতির সঙ্গে হুবহু মিল রহস্যময় উপন্যাসের। ডিটেকটিভ গল্পে থাকে সাসপেন্স, সারপ্রাইজ, সলিউশন। মেয়েদের মধ্যেও পাবেন এই ত্র্যহস্পর্শ। সেজন্যই আমার এক বন্ধুকে সর্বদা দেখি হয় সে বৌকে নিয়ে প্রমত্ত, নয় কোন হত্যা-কাহিনী নিয়ে মত্ত। বৌ বা বই, একটা হলেই তার সময় কেটে যায়।

কাগজের বইয়ের সঙ্গে মেয়েদের তুলনা করলাম বলে অনেকে গোঁসা করবেন। কিন্তু গোঁসাই মশাই, বই কেন, ফুলের সঙ্গেও ওদের তুলনা চলে। কবিরা আকচারই করছে। Fool মাত্রই মেয়েদের ফুল বলছে, বিউটিফুল বলছে। সেটা কি ফুল জানেন? কাগজের ফুল। এখানেই মেয়েদের সঙ্গে কাগজের সম্পর্ক শেষ নয় কিন্তু। আজকাল মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলেই সবাই বলে যে ওরা নাকি উড়তে থাকে। উড়বেই তো, কেননা এই উড্ডীয়মান ছুঁড়ি আর উড্ডীয়মান ঘুড়িতে কোন তফাত নেই। আর ঘুড়ি, বলা বাহুল্য, কাগজেরই।

কাগজ বলতে গেলে সূর্যের চাইতেও বেশী জনপ্রিয়। জিজ্ঞেস করুন কাউকে, সকালে উঠে সে সূর্য দেখেছে ক'বার? আমৃতা আমৃতা করবে। কিন্তু সকালে উঠে কাগজ দেখে প্রায় সবাইই। আমাদের ভোর হয় সূর্যোদয়ে নয়, হকারোদয়ে! হকার এসে উদয় হলেই সকাল হয়। এক কবি নাকি লিখেছিলেন,

শুনিয়াছি সূর্য তুমি ওঠ খুব ভোরে,
চক্ষে কভু দেখি নাই থাকি ঘুমঘোরে।—খাঁটি কথা।

একটা কথা মানতেই হবে কাগজ যে আবিষ্কার করেছিল সে বোধহয় জানতই না একসময়ে এই কাগজ ফ্রাংকেনস্টাইন হয়ে উঠবে। কাগজ আমাদের দাস না হয়ে ক্রমে প্রভু হয়ে উঠেছে। এই কাগজের পাতায় হিটলারের 'ম্যাইনকামফ্' পড়েই জার্মানী যুবকরা নাৎসী হয়ে উঠেছিল, মার্কস-এঙ্গেলের বই পড়েই দেশ-বিদেশে হাজার হাজার মার্কসবাদী হয়ে উঠেছে। চীনের মাও সে তুঙের লাল বই পড়েই হয়ে উঠেছে মাওয়ালী বা মাওবাদী। কাগজের জ্ঞানের পরই এত হানাহানি। একদিকে অশ্লীল সাহিত্য ও ছবি দেখে দেশে শরীর নিয়ে ছানাছানি, অন্যদিকে রাজনৈতিক মতবাদের বই পড়ে দেশ নিয়ে হানাহানি। আজকাল কজন আর দর্শন বা ধর্মসাহিত্য পড়তে চায়। একটা যুগ ছিল যখন বাঙালী ছেলেমাত্রই 'বঙ্গদর্শন'-এর ভক্ত ছিল, কিন্তু এখন বঙ্গদর্শন নয় বঙ্গললনা দর্শনেই বঙ্গসন্তানরা উৎসাহী। সাক্ষাতে না হলে সিনেমায়। সিনেমায় না হলে কাগজে।

কাগজ অনেক সময় বেশ বিপদে ফেলে থাকে। যেমন দেখুন ওই ঘটনাটা। ফার্স্ট ক্লাসে দুজন মাত্র যাত্রী। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। গাড়ি হাওড়া স্টেশন ছাড়তেই ছেলেটি আলাপ করার অভিপ্রায়ে মেয়েটিকে বলল, আপনি আমার কাগজটা দেখতে চান?

কনভেণ্টে পড়া দিল্লীর বঙ্গললনা চমকে উঠল। বলল, যদি সে চেষ্টা করেন তাহলে গাড়ি থামিয়ে আমি পুলিশ ডাকব।

বুঝুন ঠ্যালা, কাগজ পড়তে বলল ছেলেটি আর মেয়েটি কি উল্টো বুঝল।

আমার এক বন্ধু একদিন আমাকে একটি মেয়ের কাছে চড় খাওয়ার গল্প বলেছিল। সেটাও কাগজ-ঘটিত। সংবাদপত্র নয়, বই। সে তার ক্লাস ফ্রেণ্ড মেয়েটিকে গিয়ে বলেছিল আপনার বুকটা দেখাবেন একটু?

সঙ্গে সঙ্গে রামচড়। বন্ধু বলল, গালে পাঁচআঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল।

আমি বললাম, গাধা কোথাকার। বুকটা না বলে বইটার নাম নিয়ে দেখতে চাইলি না কেন? তাতে মেয়েটা ভুল বুঝত না নিশ্চয়ই। বরং বইটার নাম 'শেরশায়রী' বলতে পারত, আপনার 'শেরশায়রী'টা দেখাবেন একটু?

বন্ধু বলল, এভাবে বললে এতক্ষণে আমি জেলে থাকতাম।

প্রশ্ন করলাম, কেন?

বন্ধু, বইটার নাম 'শেরশায়রী' ছিল না।

প্রশ্ন করলাম, কি ছিল?

বন্ধু বলল, বিবর।

এরপর, বলা বাহুল্য আমার বাক্যস্ফূর্তি হয় নি। কাগজ-এর বিপদে ফেলার ক্ষমতা দেখলেন? সেজন্য মাঝে মাঝে ভাবি এমন জায়গায় পালিয়ে যাওয়া উচিত যেখানে কোন কাগজ থাকবে না, বই থাকবে না, খাতা পত্র কালি-কলম কিছু না। কাগজহীন সেই শান্তির পৃথিবীর ঠিকানা জানা আছে কারুর? থাকলে জানাবেন। যতদিন সেই বিনকাগুজে দেশে যেতে না পারছি ততদিন অবশ্য কাগজ ছাড়া বাঁচা যাবে না। অন্তত সরকারী প্রেসে ছাপা দিস্তে দিস্তে কড়কড়ে টাকার নোট তো চাইই! এই ধরনের কাগজ যদি গজের ওজনে পাই তবে আর কিছু চাইনে। সত্যি বলছি। বিত্তের কুমড়ো হওয়ার চাইতে টাকার কুমীর হওয়া ঢের ভাল মশাই। তখন কাগজে এসব হিজিবিজি লিখে আপনাদের জ্বালাব না। বচন ফকিরের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আপনাদের বলে দিলাম। ফকিরের গাঁজা থেকে বাঁচার ফিকির বলে দিলাম। আজই খুলুন 'বচন ফকির নিধন ফাণ্ড'। আমার হানি চান তো মানি দিন। বচন ফকিরকে খারিজ করার একমাত্র উপায় তাকে রিচ করে দেওয়া। ভেবে দেখুন। মুক্তিমন্ত্র দিয়ে দিয়েছি, দেরী করবেন না।

বিমল মিত্র মশাই রাগ করবেন না জানি। 'নকর সংকীর্তন' আর সফর সংকীর্তনে অনেক তফাত। যতটা তফাত বিবেকানন্দ আর দেব আনন্দে। যতটা তফাত ধর্ম ও ধর্মেন্দ্ররে। তাঁর লেখা নকর সংবাদ পাঠক-পাঠিকদের আনন্দদান করেছে আর আমার এই সফর সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের নির্মম দণ্ডদান! আমার যেটা সফরের ব্যাপার, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেটা suffer-এর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। সহ্য করার জন্যে রেডি তো আপনারা? বেশ, তৈরি হোন। নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান, গো।

প্রথমে Go-এর আগে একটু গোঁ-এর দরকার। যখন শুনলাম চিত্রজগতের অরুণ বরুণ কিরণমালা সবাই ইওরোপ ও আমেরিকা যাচ্ছে আমারও গোঁ চাপল আমিও যাব। যাওয়া কি চাট্টিখানা কথা! গোঁ চেপেছে বটে তবে ইচ্ছেটা তখনও নেহাতই ডিমমাত্র। সে ডিমে তা দিলে এসে আমাদের চিন্টু। মানে ঋষি কাপুর। বলল, দাদা, হাম 'বারুদ' কা শুটিং মে যা রাহা হাঁয়, আপভি চলিয়ে না? মজা আয়েগা। হিরোরা লক্ষ লক্ষ টাকার হিরো আর আমি ওদের কাছে জিরো। কিন্তু জিরোরা সর্বদা যে জিড়োতে ভালবাসে তা নয়, জিরোদেরও শখ হয় মাঝে মাঝে Zorro হতে। তাই Zorro-র মত জোর লাগালাম। ফলে দু'মাসের জন্যে ইওরোপ ও আমেরিকার ট্রিপ হয়ে গেল। ইওরোপ আমার আরও তিনবার দেখা ছিল। সুতরাং ইফেল টাওয়ার, লুভর মিউজিয়াম, মাদাম টুসো, পিকাডিলি, কলোসিয়াম, টিভলি—এসব কিছুরই প্রবেশ নিষেধ ছিল আমার তালিকায়। আমার মেজাজ ছিল মার্কিন পর্যটকের মত, যে

বলেছিল, I have not come here to see the old ruins, have come to see the young ruins.

ফ্রান্সে এসে তাই যোগাযোগ করলাম ফরাসী সিনেমা প্রযোজক পেট্রিক হিউবার ও ইয়ানিক বার্নার্ডের সঙ্গে। তারপর একটা লেটেস্ট সিত্রন X-90 গাড়িতে চেপে সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়িয়েছি।

হাইওয়ে ধরে গেছি কত শহরে ও গ্রামে তার সবগুলোর নামও মনে নেই। নাম মনে হলেও উচ্চারণ মনে নেই। প্যারিসের পর সেকেণ্ড সিটি লিয়ঁতে গেছি, মার্সাই বন্দরে গেছি, মনটার্জি'র মত ছোট শহরে গেছি। সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালীর সীমানার নিকটবর্তী হিলস্টেশন চিমোনি-তে গেছি, আরও কত ছোট বড় শহরে। কত মজার ঘটনা ঘটেছে ফ্রান্সে। নেমোর বলে একটা ছোট জায়গায় মোটেলে ছিলাম কয়েকদিন। পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী সেখানে ফ্রান্সের বিখ্যাত মোটর স্টান্টম্যানদের সঙ্গে নায়ক ঋষী কাপুরকে নিয়ে হাইওয়েতে ভয়াবহ শুটিং করছিলেন তার 'বারুদ' ছবির জন্যে। ঋষী বলল, চল দাদা, লোকেশনে যাব। গাড়িতে দূর দূর জায়গা ঘুরে বিখ্যাত ফরাসী ওয়াইন খেয়ে স্বভাবতই একসময় দুজনেরই ব্লাডারে চাপ পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে কাঁচা একটা রাস্তার মোড়ে দুজনে ঘাসের উপর যখন ভারতীয় কিডনির সকল কর্ম-কুশলতার নিদর্শন জলধারায় বিগলিত করছিলাম তখন হঠাৎ একটা বোর্ড চোখ পড়ে ব্লাডার সাডার করে উঠল। লজ্জায় প্যান্ট বন্ধ করে বললাম, চিন্টু, লুক্ হিয়ার। চিন্টুও দেখল। নার্গিস। হ্যাঁ মশাই নার্গিস আমাদের এই অপকর্ম দেখছিল পিপিং টমের মত। বুঝলেন না? বোর্ডটা হল রাস্তার চিহ্ন। লেখা ছিল বড় বড় অক্ষরে NARGIS—4KM. মানে নার্গিস মাত্র চার কিলোমিটার দূর। অবাক কাণ্ড নয় কি? ফ্রান্সের অভ্যন্তরে কোথায় এক ছোট গ্রাম তার নাম নার্গিস। ক্যামেরা ছিল চিন্টুর। সে বোর্ডের ছবিটা তুলে নিল। বলল, দাদা, বোম্বে গিয়ে নার্গিসজীকে দিলে খুব খুশি হবে। মজার ব্যাপার নয়?

আরেকদিনের ঘটনা বলি। আমি সাবান কিনতে বেরিয়েছি। শহরটার নাম মারযাই। ভাষা বিভ্রাটে কিছুতেই বিরাট এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেল্‌স-গার্ল মেয়েটিকে বোঝাতে পারছি না যে আমি টয়লেট সাবান কিনতে এসেছি। আমি সোপ সোপ বলে ইঙ্গিতে গায়ে মাথার ভঙ্গী করে ব্যর্থ হলাম। মেয়েটা 'উই' 'উই' (মানে yes yes) করছে। কিন্তু কখনো পারফিউম দেখাচ্ছে, কখনো বডি-লোশন, কখনো সানট্যান অয়েল। বিরক্ত হয়ে সাদা বাংলায় বললাম, সুন্দরী, সাবান বোঝ? সাবান? সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হল বলল, সাবুঁ মসিঁয়ে? উই। বলে সাবানের কাউন্টারে নিয়ে সাবান দেখাল সে। কাণ্ড আর কি?

ইংরেজী বলে বলে হদ্দ হচ্ছিলাম অথচ আমি কি ছাই জানতাম বাংলা 'সাবান' ফরাসী ভাষায় Savon—প্রায় একই শব্দ? উচ্চারণও কাছাকাছি। ওরা 'সাবুঁ' বলে। দেখলেন তো ব্যাপার-স্যাপার।

ফ্রান্সে খাদ্যসমস্যা দূর করেছিলাম দুটো শব্দ শিখে। সেটা হল 'গাম্বাস' আর 'রিস'। গলদা চিংড়িকে ওরা 'গাম্বাস' বলে, 'রিস' বলে রাইস মানে ভাতকে। সুতরাং গলদা চিংড়ি আর গরম ভাত দিয়ে চুটিয়ে খেয়ে গেছি, কোন অসুবিধে হয় নি।

প্যারিসে যদি যান পিগেল-এ যেতে চাইবেন আপনার যদি নারী শরীরে লোভ থাকে। যে ব্যাচেলারদের এখানে বলে রাখি পিগেল থেকে অনেক ভাল জিনিস পাবেন রু স্ত টিস্‌লিনে। এই অঞ্চলে বারবনিতারা সাদা গাড়ি করে ঘোরে ও কাস্টমার তুলে ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়।

লণ্ডনের সোহো, নিউ ইয়র্কের ফরটিসেকেণ্ড স্ট্রীটের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল এই রু স্ত টিসলিনের উর্বশী কন্যারা।

ফরাসী দেশটা আমি এ ট্রিপে খুবই দেখে নিয়েছি। ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মেনি ও স্পেন ঘুরেছি। তারপর বলা বাহুল্য, মোল্লার দৌড় লণ্ডন পর্যন্ত। মানে লণ্ডন শহর তো আছেই।

বিদেশে গেলে লণ্ডনের বুড়ি ছুঁয়ে না আসলে যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

লণ্ডনে ভাষা সমস্যা হয় না বলে নাটক, সিনেমা দেখা, স্রেফ অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে শুধু হাঁটা, পিকাডিলি সার্কাস আর মার্বল আর্চের চক্কর, 'সেজান' রেস্তোরাঁ আর 'গেলর্ডে' ভারতীয় খাবার খাওয়া, লণ্ডনের 'পাবক্রলিং,' মানে এক মদিরালয় থেকে অন্য সুরামন্দির প্রদক্ষিণ করা আর সোহোতে গিয়ে ব্লু ফিল্ম আর নেকেড শো দেখা, এতেই দশদিন কেটে যায়। কি করে কাটল টেরই পাই নি। অকপটে এখানে স্বীকার করি পৃথিবীতে যে দুটো শহর আমার সবচেয়ে প্রিয় সে দুটো হল কলকাতা আর লণ্ডন।

তারপর লণ্ডন থেকে এলাম নিউ ইয়র্কে। আমেরিকায় এটা আমার প্রথম পদক্ষেপ। সুতরাং বলতে পারেন মার্কিন দেশে আমি ১৯৭৫ সালের কলম্বাস।

আমেরিকা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বলছি। চিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণে আমি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত হব। কেননা সেটা হল আমার Forte. শুনুন আমার ডিসকভারী অফ ইউ এস এ। আমার মনে হয় আমেরিকা দীর্ঘতম প্রাসাদাবলী আর গভীরতম কণ্ঠনলীর জন্যে বিখ্যাত। বুঝলেন না? এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং অনেকদিন আগেই হার মেনেছে ট্রেড সেণ্টারের যুগ্ম যমজ প্রাসাদদ্বয়ের কাছে। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম প্রাসাদ এখন আর নিউ ইয়র্কের এক্তিয়ারে নয়। সে সম্মানের অধিকারী হল চিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার। সে টাওয়ারের ছাদে উঠে আমি ঠাকুরকে ডাকতে কুণ্ঠিত বোধ করেছি, কেননা আমার ধারণা ঈশ্বরদের নিবাসস্থল বৈকুণ্ঠধাম তার খুব বেশি দূরে নয় সম্ভবত। তবে বাঙালী হিসেবে একটা খবর দেব যাতে বাঙালী-মাত্রেরই গর্ব হবে। এই সুউচ্চ প্রাসাদের স্থপতি হল একজন বাঙালী। হ্যাঁ মশাই, বাঙলাদেশের (অতীতের পূর্ব পাকিস্তানের) একজন মুসলমান আর্কিটেক্ট এই প্রাসাদের স্রষ্টা। উচ্চতম প্রাসাদের পর আমি কেন গভীরতম কণ্ঠনলীর

কথা বলছি অনেকে সে তথ্য নিশ্চয়ই অবধাবন করতে পারেন নি।

শুনুন তাহলে অশ্লীল ছায়াছবির জগতে আলোড়ন তুলছে যে ছবি সেটার নাম হল 'ডিপ থ্রোট্'। লেস ভেগাস শহরে আমি ও রাজকাপুর (রাজকাপুরও তখন সেখানে বেড়াচ্ছিলেন) সে ছবিটি দেখেছি। ছবিটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'ফেলাসিও' বা লিঙ্গলেহন। নায়িকা লিণ্ডা লাভলেস্ তার কাম-বিগ্রার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে সেও আমেরিকার এক অবিস্মরণীয় দ্রষ্টব্য বলে উল্লেখযোগ্য থাকবে। সেজন্তেই বলেছি আমেরিকা উচ্চতম প্রাসাদাবলী ও গভীর কণ্ঠনলীর জন্তে বিখ্যাত! 'ডিপ থ্রোট্' আমেরিকার পর্নো-গ্রাফীর জগতে সবচেয়ে বড় হিট্ ছবি। লিণ্ডা লাভলেস্ হলেন র‍্যাকুয়েল ওয়েলচ্ অফ পর্নোমুভি। মানে উনি একজন সেলিব্রিটি!

একটা কথা মানতেই হবে আমেরিকানরা খুবই বন্ধুবৎসল, সরল, আনন্দপ্রিয় খোলামেলা মনের মানুষ। বৃটিশ বা ইউরোপীয়ানদের মত ইন্ট্রোভার্ট জাত নয়, ওরা এক্সট্রোভার্ট জাতের লোক। প্রতিটি ট্যাক্সি ড্রাইভার এক একটা বিশ্বকোষ বিশেষ। আমার মনে হয় আমেরিকায় সেজন্তে এনসাইক্লোপিডিয়ার বিক্রি কমে গেছে! হার্লেম থেকে গ্রীনউইচ ভিলেজে গিয়ে দেখলাম হিপি আন্দোলন এখন আর জনপ্রিয় নয়। তাদের সংখ্যাল্পতায় আমার বিশ্বাস এ কাল্ট এখন মুমূর্ষু। সারা ইওরোপে যা দেখেছি আমেরিকায়ও তাই। মানে পোশাকে ছেলেমেয়েদের সর্বপ্রিয় পোশাক হল নীল রঙের জীন্স। ছেঁড়া হলে সেটা বেশি ফ্যাশনেবল, তালি থাকলে সে তো কুলীন জাতের। আমেরিকার জনপ্রিয় পোশাক হল জীন্স আর জনপ্রিয় খেলা হল জীন্স খুলে ফেলা! বুঝেছেন! নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মধ্যে আজকাল 'বার' উঠেই গেছে! নো, কালার বার। অন্তত নর্থে নেইই। শুধু কালার কেন, কোন 'বার'-এই ওরা বিশ্বাস করে না আজকাল। সম্ভবত সেজন্তে মেয়েরা ব্রা আর আণ্ডার-ওয়ার পরা বন্ধ করে দিয়েছে। বাধা মুক্ত থাকাটাই মুক্তির

সোপান বোধ হয়। মুক্ত আর যুক্তে সম্ভবত দূরত্ব কম। এতে সময়ের অপচয়ও কম হয়ে থাকে। নিউইয়র্ক, বাফেলো, ওয়াশিংটন, সল্ট লেক সিটি, ডালাস, ডেট্রয়ট, লেস ভেগাস, লস এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো, চিকাগো, মায়ামী ওর্লেণ্ডোর ডিসনিল্যাণ্ড—যত শহরেই গিয়েছি, মার্কিন সংস্কৃতির চেহারা সর্বত্র একই দেখেছি। রুচি প্রকৃতিও এক। শুধু ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যে জায়গাগুলোর চেহারা আলাদা। সব শহরেই আমি চুটিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখেছি, নাইট শো দেখেছি, রেড লাইট্ এরিয়ার খোঁজ নিয়েছি, আর কৃতিমান বাঙালীদের সঙ্গে দেখাশোনা করেছি।

সমীক্ষার ফলাফলটা বলি আপনাদের। মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রব্যমূল্য ইওরোপীয় দেশগুলোর (বিশেষত সুইজারল্যাণ্ড। সুইজারল্যাণ্ড আর জাপান এখন কস্টলিয়েস্ট ইন্ দা ওয়ার্লড) চাইতে বেশ কম। সবচেয়ে চোখে পড়েছে হলিউডের অবনতি। এককালে বিশ্ব চিত্রজগতের রাজা হলিউড এখন ধুঁকছে। দুদিক দিয়ে মার খাচ্ছে। পর্নো ছবির জগৎ থেকে আর টি ভি থেকে। আমেরিকার সাধারণ জীবনে চার অক্ষরের সেই অ্যাংলো স্যাক্সন শব্দটির, যার মানে 'মৈথুন', এত বেশি প্রচলিত যে আমার মনে হয় ওখানে শিশুর মুখের প্রথম শব্দ 'মাম্মা' বা 'পাপা নয়, বরং সেই পাপী শব্দটা! সাহিত্যে, সিনেমা, থিয়েটারেও সে শব্দটার যথেচ্ছ ব্যবহার দেখলাম। (নিক্সনের টেপ-এ যে সে-সব শব্দের অঢেল ব্যবহার ছিল যা 'এক্সপ্লিসিট ডিলিটেড' বলে বার বার শোনা গেছে। প্রেসিডেন্টও ঐ ভাষায় কথা বলত। ভাবুন।) চিত্র সমালোচনা পরে করছি তার আগে আমেরিকার সবচেয়ে প্রশংসনীয় যে বস্তু তার একটু তারিফ করে নিই। সেটা হল ব্যক্তি স্বাধীনতা। প্রেসের ও বক্তার এত বেশি স্বাধীনতা কোন দেশে নেই। ফ্রি স্পীচ এবং ফ্রি প্রেসের দেশ আমেরিকা। ভুললে চলবে না যে, দুজন সাংবাদিকই ওয়াটারগেটের ব্যাপারটা ফাঁস করে ও নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। এখনও সিয়া (CIA) কাঠগড়ায়

দাঁড়ানো আসামী। প্রচুর অপকর্মের তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে ও সিয়ার কর্তাব্যক্তি কল্‌বি সাহেব বিপদগ্রস্ত।

আমেরিকার সবচেয়ে মজার শহর হল লেস ভেগাস। সারা বিশ্বে এত বড় জুয়ার আড্ডা আর বিলাস ও প্রমোদের রকমারী আয়োজন কোথাও পাবেন না। মন্টিকার্লো বা বেরুটের ক্যাসিনো ও প্রমোদ উপকরণ লেস ভেগাসের কাছে শিশু। এখানে বারবনিতার ব্যবসা নিষিদ্ধ নয় অন্যান্য মার্কিন জেলার মত। সেজন্যে কাগজে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন বেরোয় It is legal here ছাপা হয় Girls of Europe and Orient will please you. তারপরের লাইনটা শুনুন Expert in prench and Greek Love বুড়বাক হয়ে ভাবছেন 'ফ্রেঞ্চ' আর 'গ্রীক লাভ' আবার কি? লেহন ও পায়ুমৈথুনের নামান্তর হল এই দুটো 'লাভ'-এর মানে! বিকারের জন্যেও বিজ্ঞাপন! সত্যি কলম্বাস, কি বিচিত্র এই দেশ। লেস ভেগাস হল মরুময় নেভেদা স্টেটে। জুয়া ও নাইট লাইফ ছাড়া এখানে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের খুব দ্রুত ব্যবস্থা আছে। ফলে কুইক্‌ ম্যারেজ ও ডিভোর্সের জন্যে প্রচুর আমেরিকান অন্যান্য অঞ্চল থেকে লেস ভেগাস ও রিও শহরে এসে থাকে। সুতরাং এখানে যত ক্যাসিনো আছে তার চেয়ে বেশি চ্যাপেল রয়েছে। পয়সা ও জীবনের দু'রকম জুয়ারই তীর্থক্ষেত্র আর কি!

এবার চলচ্চিত্র আলোচনায় আসি। পর্নোগ্রাফী আইনসিদ্ধ করার পর ডেনমার্কের মত যৌন-অপরাধের সংখ্যা সমাজজীবনে নাকি কমে গেছে। তবে আজকাল যৌনচিত্রগুলির জনপ্রিয়তাও একেবারেই কমে গেছে। আমি Deep Throat, Behind The Green Door, The Devil In Miss Jones এসব সুপারহিট পর্নোছবিগুলো দেখেছি। এ জাতের অন্যান্য আরও ৬-৭টি ছবি দেখেছি। কোথাও দশজনের বেশী দর্শক বসে থাকতে দেখি নি। তদুপরি কোথাও একজনও মহিলা দর্শক দেখি নি। অথচ বাইরে প্রত্যেক X মার্কা অশ্লীল ছবিঘরের সামনে বোর্ড টাঙানো আছে,

Ladies Free। বুঝুন, মেয়েদের বিনি পয়সায় দেখাচ্ছে তবু একটিও মেয়ে আসছে না। মনোবৈজ্ঞানিকরা বলেন যে ভিশুয়াল মেয়েদের মোটেই উত্তেজিত করে না, এছাড়া যৌনচিত্র মেয়েদের বড্ড ডিগ্রেডেড লাগে তাই ওরা দেখতে রাজী নয়। মেয়ে তো বাদ ছেলেদের ভিড়ও তো নেই। মানে পর্নোগ্রাফীর মৃত্যু আসন্ন এতে সন্দেহ নেই। শরীরের সার্কাসের আয়ু নেহাতই কম। কিন্তু এসব ছবির নায়িকারা সব এখন এক একজন তারকা বিশেষ। যে কোন আমেরিকান লিণ্ডা লাভলেস, মেরিলিন চেম্বারস্, জেভিয়েরা হলাণ্ডার বা মিস স্পিলভিন্‌কে এক ডাকে চেনে! এ তো গেল পর্নোছবির পাঁচালী। এছাড়া ফীচার ফিল্ম বা সামাজিক চিত্র দেখেছি অনেক। যেমন Earth-quake, Jaws, Towering Inferno, Tommy, Mandingo, Godfather II, French Connection II, All Capone, The Happy Hooker, Shampoo, Four Masketeers, Breakout, Funny Lady, Magnum Force, The Great Waldo pepper, At Long Last Love এ আরও গাদা গাদা হংকং তৈরি অধুনা জনপ্রিয় স্বর্গীয় ব্রুস লি'র কুংফু মার্কা ছবি। এত ছবি দেখে নিশ্চয়ই আমার বিশ্লেষণ করার অধিকার জন্মেছে। কি বিশ্লেষণ বলছি। চিন্তার দিক থেকে ওরা দেউলে হয়ে গেছে।

Earthquake, Jaws, Towering, Inferno আর Tommy সুপারহিট ছবি। এগুলো বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, যান্ত্রিক কলানৈপুণ্যের জন্যে জনপ্রিয় হয়েছে। যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Technical Jugglary এসব বড়জাতের স্টান্ট ছবি ছাড়া কিছু নয়। Earthquake ছবিটির অপূর্ব Qudraphonic আবহ সঙ্গীতই মাথা খারাপ করে দেয়। মনে হয় যেন চিত্রগৃহের অভ্যন্তরে ভূমিকম্প হচ্ছে। কিন্তু এসব ওদের যন্ত্রশিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়। চারুকলার ক্ষেত্রে অগ্রসরের বিন্দুমাত্র পরিচয় দেয় না। বাকি ছবিগুলোর মূল মসলা হল—সেক্স ও হিংসা। নগ্নতা তো

পুরনো টুপি, এখন দেহসঙ্গম ও রক্তপাতের, খুনখারাপীর বন্যা প্রতিটি ছবিতে। Mandingoতে শ্বেতরমণী নিগ্রো ক্রীতদাসের কাছে দেহদান করেছেন, Shambooতে মা ও মেয়ে দুজন একই পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করছে, French Connection IIতে নায়ক হেকমেন কথায় কথায় খিস্তি করে যাচ্ছে, এ ছাড়া সব ছবিতে মারপিটের তো অন্তই নেই। গণ্ডগোলের কারণটা হল এই। ভদ্র, হৃদয়স্রাবী ছবি দিয়ে টেলিভিশন চলচ্চিত্রের বাজার খারাপ করে দিয়েছে। চিত্রশিল্প এখন বাধ্য হয়ে অশ্লীল চিত্রজগতের ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। বাঁচবার জন্যে সেক্সকে প্রচুর নগ্নরূপে দেখাতে লেগে গেছে। হিংসা-দ্বেষের স্টাণ্টে ভরে দিয়েছে বক্স অফিস সাফল্যের লোভে। সফল স্টাররা আজকাল নগ্ন ছবিতে নেমে তাদের কৌলিন্য প্রদান করেছেন। এ ধারার সূত্রপাত করেছেন মার্লন ব্রাণ্ডো। বার্নাডো বার্টুলুসী The Last Tango In paris ছবি করে প্রথম ১৯৭৩ সালে বাজার মাৎ করেন। তারপর এল Exorcist ছবি। তারপর সবারই এখন চেষ্টা দুঃসাহসিক। ইদানীং যাস্ট জেকিন বলে এক ফরাসী ভদ্রলোক Emmanuelle ছবি করে পুরনো ট্যাঙ্গো-ফ্যাঙ্গোকে কাৎ করে দিয়েছেন। 'ইমানুয়েল' যৌনস্বাধীনতার কুতব মিনার। শুধু ফ্রান্সে ষাট লক্ষ ডলারের ওপর ব্যবসা করেছে এ ছবি। (কত টাকা হয় জানতে হলে ষাট লক্ষকে নয় দিয়ে গুণ করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন।) God-father-এর ব্যবসা এর কাছে কিছু নয়। খুব সম্ভব Emmanuelle হল পৃথিবীর biggest hit। নায়িকা সিলভিয়া ক্রিস্টাল তো এখন ওয়ার্লড সেক্স সিম্বল হয়ে গিয়েছে। মেরিলিন মনরোর পর এ স্থান ছিল র‍্যাকুয়েল ওয়েলচের কবলে। তাকে সিলভিয়া সিংহাসনচ্যুত করেছে নিঃসন্দেহে। যাই হোক, পশ্চিমী চলচ্চিত্র শিল্পের গতি ও প্রগতি কোন্‌দিকে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। হিংসা হচ্ছে ওদের সবচেয়ে শক্তিশালী অবলম্বন। তারপরই তালিকায় আসে যৌনস্বাধীন দৃশ্যাবলী। হিংসা যে থাকবে না সে কথা আমি বলছি

না। যারা স্ট্যানলি কুবরিকের Clockwork Orange ছবি দেখছেন তারা জানেন যে মানুষের সক্রিয় যে ক'টা রিপুর প্রয়োজন তার মধ্যে হিংসা অন্যতম। হিংসা যদি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে দেওয়া যায় তবে মানুষ তখন আর মানুষ থাকে না। সে তখন উদ্ভিদ মাত্র। আত্মরক্ষা বা আত্মজনরক্ষার ক্ষমতা লোপ পায় তার। সে সম্পূর্ণ মানুষের সংজ্ঞা নয়। কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। সেজন্যে জাপানে অহিংসার পূজারী বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা 'ক্যারাটে' (অস্ত্রহীন আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধপ্রণালী) নামের যুদ্ধশাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে। চলচ্চিত্রে হিংসার প্রাচুর্যের কারণ এর জনপ্রিয়তা। শিশুকালে থেকে পশ্চিমী মানুষরা 'সুপারম্যান' 'টার্জানে'র ভক্ত হয়ে ওঠে। জেম্‌স বণ্ড, যা বক্স অফিস সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে তার এত জনপ্রিয়তার কারণও তাই। প্রতিটি মানুষ তার সহজাত রিপুর তাড়নায় বহু শত্রুনিধন ও বহুনারী সঙ্গমে ইচ্ছুক হয়ে থাকে। সংস্কার ও বিবেকের দংশনে সে নিজেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু জেম্‌স বণ্ড অনায়াসে ছমদাম শত্রুনিধন করে যায় আর যখন তখন মেয়ে নিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি যায়। এ চরিত্র জনপ্রিয় হবে না?

কেন হবে? কেননা জেম্‌স বণ্ডসের এই সব হিংসাত্মক কার্য-কলাপের ও যৌন স্বাধীনতার কোন অপরাধবোধ মানে guilty complex নেই। কারণ এ সব কিছু সে করছে দেশকে বাঁচাবার জন্যে! দেশপ্রেমের এই গঙ্গায় তার অপরাধগুলো সব ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে ওঠে। ফলে জেম্‌স বণ্ড সব মানুষের কাছে এক Utopian God বা বলতে পারেন 'মহাগুরু' লোক। জেম্‌স বণ্ডের সাফল্য দেখেই পশ্চিমী চিত্রজগতে আজ এত হিংসাত্মক ছবির ছিড়িক। আমি যেমন হিংসা-উচ্ছেদে বিশ্বাস করি না, তেমনি হিংসার বন্যাকেও করি না। আমার মতে সংযমের প্রয়োজন। হিংসার অত্যাচার ও যৌনাচার দুটোরই সংযমের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবসার বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখে আজ হলিউডের এই দিশেহারা অবস্থা। টি ভি এসে ফাঁচার ফিল্মকে বিপদে ফেলেছে,

কীচার ফিল্ম দুঃসাহসিক হয়ে পর্নোফিল্মকে বিপদে ফেলেছে, আর পর্নোফিল্ম এখন প্রায় শেষ নিশ্বাস ফেলছে, এই হল ছবির জগতের মূল বিশ্লেষণ। খুব আশাপ্রদ ছবি নয়, জানি। কিন্তু সত্যই ফিল্মের এই দুরবস্থা থেকে আশাবাদী হওয়া মুশকিল। যা কিছু ভরসা সেটুকু গুটিকয়েক বুদ্ধিমান পরিচালকের ওপর। তাঁরা হলেন —মাইক নিকল্‌স্‌, জন ফ্র্যাঙ্কেনহাইমার, পিটার বোগডানোভীচ্‌, ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলো, জর্জ রয় হিল, কুবরিক। দেখা যাক, মুমূর্ষু চিত্রজগৎকে এঁরা বাঁচাতে পারেন কি না।

চিত্রকলার আলোচনার ইতি টানি এবার। সফর সংকীর্তনেরই ইতি টানা উচিত জানি। আপনারা সবাই 'বোর্‌' হচ্ছেন খুব। তবে মার্কিন জন-সাধারণের সেন্স অফ হিউমার মানে কৌতুকপ্রিয়তার উল্লেখ না করলে ওদের অপমান করা হবে। হাসতে ও হাসাতে পৃথিবীর কম জাতই ওদের মত নিপুণ। উদাহরণ দিচ্ছি। সানফ্রান্সিসকোর একটা সেক্স শপে ঢুকে দেখি মেয়েদের জন্যে ভাইব্রেটার সাজানো রয়েছে যার মাথায় চার্লস ব্রনসনের মাথা আঁকা, রবারের পূর্ণ সাইজের ডল আছে যার মুখ জেকলীন ওনাসিসির মত, ছেলেদের প্রফেলেকটিক্‌ পাওয়া যায় যার মাথায় নিক্সনের মুণ্ড আঁকা। লেস ভেগাসের দোকানে ছেলেদের টি শার্ট পাওয়া যায় যার সামনে লেখা UP YOURS, একটার পিছনে লেখা I LOST MY ASS AT LES VEGAS (মানে এখানের জুয়োতে আমার পাছার প্যান্টটাও গেছে।) ছেলেদের আণ্ডারওয়্যার পাওয়া যায় যার সামনে লেখা Ladies only বা Sleeping Tiger—রসিকতার নমুনা দেখছেন তো। আপনারা অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন মেয়েদের আণ্ডারওয়্যারের সামনে কি লেখা থাকে। দোকান কিছু চোখে পড়ে নি। একটি মেয়েকে সাহস করে জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম। সে কি জবাব দিয়েছিল জানেন? সে বলল— I would not know. I never wear any. তবেই বুঝুন! সত্যি কলম্বাস, বড়ই বিচিত্র জাস এই আমেরিকা।

এতদিনে মানুষ কথাটার সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পেরেছি আমি। ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গে আমাকে এক চাষা বলেছিল, মানুষ কারে কয় জানস্ না? যে মনিষ্যির মন আর হুস আছে সেই অইল মানুষ, বুঝলি? মন আর হুস যোগ কর, কি অয়? মানুষ। মন আর হুসটাই অইল সব, বাকি সব তালিবালি। বুঝলি।

আমাকে এ হেন জ্ঞান দিয়ে সে হুঁকোয় একটা জব্বর টান দিয়েছিল। সে টানে চাষীর সে কি কাসি। হুঁস যাবার উপক্রম। মানুষ থেকে তার আত্মারাম প্রায় ফানুস হয়ে যাচ্ছিল আর কি। শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল বেচারা। তার ফুসফুসে হুঁস ফিরে এসেছিল। যাই হোক, এতদিনে জানলাম তার সন্ধিবিচ্ছেদে ব্যাকরণ ভুল ছিল। চাষার ভাষাজ্ঞান সঠিক ছিল না। এতদিনে মানুষের সন্ধিবিচ্ছেদ সঠিক করেছি আমি। মন+Anus=মানুষ। হ্যাঁ মশাই, নাক সিঁটকোবেন না। মন আর এনুষ রয়েছে বলেই আমরা মানুষ। কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলার মত আমাদের শরীরের যে অঙ্গটা একান্ত অবহেলিত ও ঘৃণ্য সেটা হল এই মলদ্বার। কিন্তু এইবার সেই ধারণা বদলে ফেলুন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে Every dog has his day—সব কুকুরেরই একটা দিন আসে। সেরকমই আজ বলতে হবে—সব অঙ্গেরই একদিন অবরজঙ্গ মূল্য হয়। মলদ্বার নয়, এখন এর নাম হওয়া উচিত অমলদ্বার। এখন বুঝতে পারছি, পায়ু আছে বলেই আমাদের আয়ু আছে। দুর্গন্ধময় colon না থাকলে সুগন্ধময় ও-ডি কোলনের জীবন যাপন করা যাবে না। ধাঁধা লাগছে? আসুন বুঝিয়ে বলি।

প্রথমে কয়েকটি খবর বলি। 'ব্লিংস'-এ ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৪ ছাপা হয়েছে—Power from Garbage— An Endless source of clean energy. Consequent upon the oil squeeze and hike in oil price by Arab countrise efforts are to find out the alternative sources of energy. Garbage has been discoverd endless source of energy. In India, tonnes of refuse are dumped in open spaces to decay and spread disease. Why can't we tap this easily availabe source,—Blitz. Page-14 Dt. 5. 1. 74

আরব দেশের তেল-অস্ত্রের প্রয়োগ বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে। পেট্রলের দাম ক্রমে আকাশচুম্বী হচ্ছে। উপায় কি? পেট্রল হচ্ছে শক্তির মূল উৎস। কিন্তু উপায় হল আবর্জনা। আবর্জনাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে এনার্জি ক্রাইসিস বা শক্তির দৈন্য দূর করা যায়। আবর্জনা থেকে অর্জন করা সম্ভব এনার্জি। আর ভারতবর্ষে সবচেয়ে যা সহজলভ্য, তা হল এই অসীম ঐশ্বর্য, যার নাম আবর্জনা। এবার পড়ুন আরেকটা খবর। মার্কিন নিউজউইক কাগজে প্রকাশিত।

Chicken power. A process that promises to power cars on chicken manure has, in fact, been developed by Harold Bate of Devon, England. Called the Mathane Gas Digester, the systm consists of a sealed, heated drum containing the manure and gas-feeder device that fits over the carbureter. The manure filled drum produces mathane gas, while the carbureter device mixes the mathane and air and rams it directly into the engine cyinders,—Newsweek 7. 1. 74

বুঝলেন তো? মোটর চলবে পেট্রলের বদলে মুরগীর দেহজ অপচয় দিয়ে। ইংলণ্ডের জনৈক হ্যারল্ড বেট এই নতুন শক্তির আবিষ্কার করেছেন। মুরগীর পুরীষ ম্যাথেন গ্যাস হয়ে যাবে আর তাতে চলবে মোটরগাড়ি। খরচও কম। কেননা উনি বলছেন The fuel tank needs to be filled only once every six months. ছ'মাসে মাত্র একবার এই নতুন পেট্রল বদলাতে হবে। ভাবুন। স্রেফ মুরগীর নোংরা সংগ্রহ করার ঝামেলা। মুরগীর বদলে মানুষের দেহজ অপচয় থেকে পেট্রল বানাতেও বেশি দেরি হবে কি? মোটেই না। কেননা প্রক্রিয়া একই। শুধু উপযোগ করা বাকি। আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে সেটা আগের উদ্ধৃতিতেই পড়েছেন। আর আবর্জনার সত্তর ভাগ তো মানুষের মলমূত্র দ্বারা সৃষ্ট। কেবলমাত্র মানুষের মলমূত্র থেকেও ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ প্রস্তুত হয়ে গেছে। নিচের খবরটা পড়ুন। ঐ নিউজউইকেরই খবর।

TOTAL LIVING

Finally the supreme solution to the energy crisis may lie in a set up designed by two University of Colifornina scientists called Algal Regeneration system, it is a circular house replete with a livestock shed to house steady supply of high protein food for its inhabitants.

এ তো গেল আত্মনির্ভরশীল বাড়ির খাবার ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ সমস্যা? দেখুন তার সমাধান। It generates its own gas and electricity from human waste. মানে এই অভিনব বাড়ির বিদ্যুৎ ও জ্বালানী গ্যাস তৈরি হবে যাঁরা থাকবেন তাঁদেরই দেহজ অপচয় থেকে। সব অটোমেটিক। সুতরাং রান্নার গ্যাস আর রাতের আলোর চিন্তা নেই। 'এই আত্মনির্ভরশীল অভিনব গৃহ' ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত করেছেন।

তাঁদের হিসাবে বাড়ির দাম পড়বে মাত্র ২০০০ হাজার ডলার। মানে ধরুন গিয়ে হবে মাত্র কুড়ি হাজার টাকার মত। দেখলেন তো? এই পেট্রল সমস্যার দিনে মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য কর্মফলের কি গুণ। কে জানত বলুন, এত গুণ রয়েছে এই 'গুণ' কথাটার প্রথম অক্ষরে? এরপরও বলবেন আমার 'মানুষ'এর সন্ধিবিচ্ছেদে ভুল? মানলেন তো যে, মন+Anus=মানুষ। সময় বদলাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ বদলাবে না? বদলাতে বাধ্য। মল শুধু অমল হয়ে যাচ্ছে না, অমূল্যও হয়ে যাচ্ছে। শক্তির সব প্রয়োগ সম্ভব হবে এই উপকরণ থেকে। গাড়িও চলবে, উনুনও জ্বলবে, বাতিও জ্বলবে। বিদ্যুৎ তো শুধু ঘরের বাতি জ্বালায় না, বিদ্যুৎ ট্রাম ট্রেন থেকে কারখানা সবকিছু চালায়। কে জানত, এত প্রচণ্ড শক্তি লুকায়িত ছিল আমাদেরই নিতম্বের পুচ্ছে! আমাদেরই বর্জনক্ষেত্র যে একদিন রূপান্তরিত হবে অর্জনক্ষেত্রে, সে কথা কি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন? এতদিন কবিরা কি ভুলই না বকতেন! সুন্দরী মেয়ের বর্ণনায় বলতেন তার নয়নে বিদ্যুৎ, অধরে বিদ্যুৎ। বাজে কথা বিদ্যুতের উৎস ওদের নয়নেও নয়, অধরেও নয়। মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করবার স্টাইলও বদলাবে। পশ্চিমে নাকি ইতিমধ্যেই বদলে গেছে।

ছেলেরা আগে সরু-কোমর মেয়ে দেখলেই গদ্‌গদ কণ্ঠে বলত, Darling, I love your waist. এখন এতে আর মেয়ে পটছে না। বলতে হচ্ছে, I am in love with your waist, more so with your waste.

বাংলায় হয়তো এরকম বলতে হবে—তোমার হ্রস্ব কোমরকে আমি ভালবাসি অঞ্জলি, তার চেয়েও বেশি ভালবাসি তোমার কোষ্ঠাঞ্জলি। ঠিক অনুবাদ হয় নি? না হলে বলতে পারেন, তোমার সরু নিবি দেখাই ছিল আমার হবি। কিন্তু শর্মিষ্ঠা, আজ অনেক লোভনীয় তোমার বিদ্যুৎবাহী বিষ্ঠা। অবাক কাণ্ড আর কাকে বলে, মেয়েরাও কি কোনদিন ভাবতে পারত যে তার স্বামী তার নিষ্ঠার চাইতে তার বিষ্ঠার বেশি দাম দেবে?

ভারতবর্ষ অনেক ব্যাপারে পিছিয়ে আছে জানি। কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে পশ্চিম দেশের চাইতে এগিয়ে আছে। যেমন হিপি আন্দোলন। করায়ুক গিন্সবার্গ এঁরা শুরু করেছেন বলে যতই ওরা চেঁচাক আসলে বিশ্বের প্রথম হিপি হলেন আমাদের শিবে ঠাকুর। নয়? বমভোলা, চান-টান, দাড়ি কামানোটামানোর বালাই নেই। ষাঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে অর্ধমুদ্রিত নেত্রে গাঁজার কলকেয় টান মেরে যাচ্ছেন। বলুন, এর চেয়ে হিপি আন্দোলনের প্রতীক কি আর হতে পারে। তাহলে মানলেন তো, হিপি ধর্মের সূত্রপাত আমাদের শিব ঠাকুরই করেছেন?

এবার শুনুন আমাদের আরেক কীর্তির কথা। এই যে সারা বিশ্বে আজ 'পাওয়ার ক্রাইসিস' বলে আবর্জনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার হিড়িক চলেছে, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের অপচয়কে জ্বালানী গ্যাস বা বিদ্যুতে পরিণত করা হচ্ছে,—এটা আমাদের দেশে কি নতুন কিছু ঘটনা? না। বহুযুগ থেকে আমরা কি জন্তু বিশেষের অপচয়কে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে আসছি না? বলা বাহুল্য, আমি গোবরের কথাই বলছি। ঘুঁটে কি জ্বালানী হিসেবে আমরা ব্যবহার করি না? তাহলে? পশ্চিম আর আমাদের নতুন কি জ্ঞান দিলে? বলুন? তফাত শুধু এই যে, আমাদের জ্বালানী প্রস্তুত প্রণালী স্থূল হাতের কাজ, বলা যায় কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি বা হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট, আর পশ্চিমের এই নব আবিষ্কার যান্ত্রিক ব্যাপার, বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত বিরাট এনার্জি মেকিং সিস্টেম। গালভরা নাম বাদ দিলে মোদ্দা কথটা ভোলা যাবে না যে আমরা অনেক আগেই গোময়কে এনার্জিতে রূপান্তরিত করেছি। সেজন্যেই মনে হয় গোময়কে গোবর বলা হয়। 'গো'এর তরফ থেকে মানবসমাজকে এটা বরদানই। গরুর দান এই 'বর' বলেই এর নাম গোবর। মানছেন কিনা? মানুষের দেহজ অপচয়ের নাম বদলে এখন গোবর-এর মতই রাখা হোক 'নরবর'। নড়বড়ে প্রপোজাল ভেবে আমার সুপারিশ অগ্রাহ্য করবেন না। সভ্যতার

অগ্রগতিতে নবসমাজের এই নোংরা যখন বরদানের মতই মহৎ শক্তি রূপে প্রতিভাত হচ্ছে তখন কেন এর নাম বদলে নরবর রাখা হবে না। পণ্ডিতরা ভেবে দেখুন। নারীসমাজ যদি আপত্তি তোলেন, কেন নামকরণে শুধু 'নর' থাকবে। এ কল্যাণ কর্মে আমাদের দান কি কম? তাহলে অবশ্য আরেকটু ভাবতে হবে। ভাষা-বিদ্‌রা অচিরাৎ ভাবতে শুরু করে দিন। 'পায়ুধ' কেমন নাম? পায়ু নিঃসৃত আয়ুধ তো বটে। ভাষা ব্যাকরণ ভুল থাকলে শোধরাবেন ভাষাবিদ্‌রা। আমি নাগরিক হিসাবে শুধু আমার সামান্য সাজেসান জানালাম।

সব পুরুষরাই জানেন এমন একটা বয়স আসে ছেলেদের জীবনে, যাকে বলা হয় বয়ঃসন্ধি। তখন সব মেয়েদের ভাল লাগতে শুরু হয়। সে এত বেশি ভাল লাগা যে মেয়ে মাত্রই মনে হয় পবিত্র সুন্দর নম্র সৌন্দর্যের এক দেবী। আমাদের ছেলেদের মত মেয়েরাও এইসব দৈনন্দিন নোংরা কাজগুলো করে ভাবাই যায় না? মনে হয়, অসম্ভব, মেয়েরা এসব কখনই করতে পারে না। রূপের স্বর্গীয় সুষমার আধার ওরা। আর সে স্বর্গে মলমূত্রের প্রবেশ নিষেধ। ওরা সুন্দর, সুন্দর আর সুন্দর। ভাবতেই পারা যায় না আমাদের মত মেয়েদেরও লোয়ার ইণ্টেস্টাইন, কলোন, বাওয়েল, রেকটাম্ ও এনুস আছে। ভাবাই যায় না ওদেরই কিডনি, ব্লাডার ও য়ুরেথা আছে। ছিঃ ছিঃ, অসম্ভব। আমি অবশ্য মেরিলিন মনরো, এলিজাবেথ টেলর, এসথার উইলিয়ম্‌স, মধুবালা, মীনাকুমারী, সুরাইয়া, সন্ধ্যারাণী সম্পর্কে ভাবতেই পারতাম না। সে কতদিন আগের কথা। এ যুগেও হয়তো আপনি এমন সরল নিষ্পাপ বয়ঃসন্ধির ছেলে পাবেন যারা মমতাজ, শর্মিলা, আশা পারেখ, হেমা মালিনী, জিনত আমন বা ডিম্পল্ সম্পর্কে এমন কথা ভাবতেই পারে না।

'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু এই বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণার বাস্তব একটি চিত্র এঁকেছেন। ছেলেদের সেই বেদনার্ত মানসিকতার কথা আর কোন লেখক এমন সঠিক বর্ণনা করেছেন বলে আমার মনে

হয় না। উনি লিখেছেন "জানি না সব ছেলেরই ওরকম হয় কিনা, কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময়টাতে আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম।" চৌদ্দ বছরের নায়কের প্রথম প্রেম, ঠিক প্রেম নয়, প্রথম স্বপ্ন-রঙিন প্রেয়সী হল কুসুম। উনি একদিনের কথা লিখেছেন—"কিন্তু ভোলা যায় না সব মেয়েরই শাড়ি জামার তলায় শরীর আছে। কুসুম—এমন কি কুসুমেরও। হয়তো ক্লাশে বসে আছি, মাস্টারমশাই ফরাসী বিপ্লব পড়াচ্ছেন, হঠাৎ আমার মনের সামনে ভেসে উঠল একটি ছবি : বাথরুমে কুসুম খুব নির্দোষ ও প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর কাজ করছে, ওসব কাজ তাকেও করতে হয়, আর অমনি করেই শাড়ি তুলে ধরতে হয় তখন! আমি মনে মনে চিৎকার করি—'না, না। এ আমি মানব না, এ মিথ্যে, এ অসহ্য।' দুই হাতে আঁকড়ে ধরি বাতাসের মত অন্য এক কুসুমকে—শাদা লম্বা পোশাক তার পরনে। এক পুরোন বাড়ির বড় বড় অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মত তার ঝিলিমিলি।" 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'—বুদ্ধদেব বসু। পৃষ্ঠা : ৫১

চমৎকার। সত্যি, সে বয়েসে ভাবাই যায় না যে মেয়েরাও 'ওসব কাজ' করে। তখন হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখি পৃথিবী, আর সে কাঁচা হৃদয়ের সমস্ত আকাশটাই রূপ, গন্ধ, আর বর্ণে স্বর্গীয়। মেয়েরা তখন তিলোত্তমা। আর তিলোত্তমারা কি কোনদিন বাথরুমে যেতে পারে? কক্ষনো না।

সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে মনে হল, এই দুঃসাহসিক বন্ধনহীন পারমিসিভ সমাজে সেক্স সাহিত্যে শিল্পে সিনেমায় ঢুকে পড়েছে বাঁধভাঙা বন্যার মত। নগ্নতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি সর্বত্র, কিন্তু বাথরুমে বেচারা 'নান'—ও ঢুকতে পারে নি সেখানে। জন আপডাইকের 'কাপল্‌স্‌'-এ, হ্যারল্ড রবিন্স-এর 'দি বেট্সী'তে উল্লেখ আছে এক-আধটু, তাও বেশ ভয়ে ভয়ে। কারণ আমাদের জীবনেও এই কর্ম দুটির গোপনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য 'ল্যাট্রিন' বা 'ল্যাভেটরী' কমই লেখা থাকে। তার বদলে দেখবেন—টয়লেট, ক্লোক রুম, রেস্ট রুম, পাউডার রুম, জেন্টস্‌, লেডিজ, কিংস্‌, কুইন্স,

হিজ, হারস্, ইত্যাদি হয়েক রকম লেখা থাকে। আগে বলা হত আউট-হাউস। ইংরেজী স্ল্যাং-এ ও লু, ক্যান, থোন বলা হয়। সবগুলোই শ্লীলতার মুখোশ আঁটা নাম। ছেলেরা যদি বা 'বাথরুম যাব' বলে কখনও, মেয়েরা অন্যদের বাড়িতে ব্লাডার ফেটে গেলেও বলবে না যে বাথরুম পেয়েছে। সেজন্যেই একজন ডাক্তার বলেছেন, ছেলেদের কিডনি খারাপ হয় অ্যাল্‌কোহলে, মেয়েদের খারাপ হয় লজ্জায়। খাঁটি সত্যি কথা। বিদেশী মেয়েদের চাইতে আমাদের দেশের মেয়েরা আরও বেশি লাজুক। আমাদের দেশের মেয়েরা মেমসাহেবদের মত ফ্রাঙ্ক নয়।

অবশ্য একদিন কি বেচারীরা জানত যে একদিন এই ফ্রাঙ্ক থেকে বিরাট শক্তির দানব ফ্রাঙ্কেস্টাইন জন্ম নেবে। কেরোসিনের বদলে মূল্য পাবে এই মূত্রশক্তি বা অবসিন্। এটমের চাইতেও শক্তিশালী হয়ে উঠবে আমাদের বটম্! Tale of Two Cities-এর চাইতে বড় হয়ে উঠবে আমাদের এই Tail of Electricity! জেনিটাল-ই হয়ে উঠবে আমাদের ক্যাপিট্যাল! নিতম্ব হয়ে উঠবে শক্তির জয়স্তম্ভ! নেশনের জন্য একদিন প্রয়োজন হবে প্যাশনের নয়, নেহাতই পেছনের!

এই নবশক্তির আর্বিভাব হবে অচিরাৎ—আগে থেকে এই সত্য যে দেখতে পায় সে-ই তো দার্শনিক, সত্যিকারের শিল্পী, সত্যদ্রষ্টা। বার্নাডো বার্টোলুসি কি সেইজন্যই প্রস্তুত করেছেন তাঁর বিখ্যাত বিতর্কমূলক চিত্র 'লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস'? কেননা শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নতুন যে কাল আসছে তাতে নায়ক নায়িকাকে হৃদয় দেখাবে না, পেছন দেখাবে। নায়ক নায়িকা পার্কে বা বাগানে সাক্ষাৎ করবে না, সাক্ষাৎ করবে বাথরুমে! কেননা, কর্মক্ষম হার্টের চাইতে, কর্মচঞ্চল ব্লাডারের দাম বেড়ে যাবে। সেইজন্যেই আগামীকালের সেই নায়িকা জেনি বাড়ি ভাড়া নিতে এসে দেখে সেখানে নায়ক পলও বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য ঘর-টর ঘুরে ঘুরে দেখছিল। দুজন দুজনের নাম জানে

না। জিজ্ঞেসও করে নি। পল (মার্লন ব্রাণ্ডো) মেয়েটার, মেয়েটার মানে জেনির (মারিয়া স্নাইডার) শরীরের প্রতিবিম্ব দেখছিল কাঁচের ওপর। জেনি ওতে লজ্জা পাচ্ছিল আবার ওর ভালও লাগছিল। এইবার আসুন লেখকের ভাষায়—

I wonder who lived here, She said, It's been empty for a long time. She stepped out in the corridor, and walked back towards the bathroom. She thought he would follow, but she heard the footsteps moving in the direction of the kitchen. (গাধা কোথাকার!) Jeanne paused to. pat her hair, and to glance at her make up in the mirror. (মেয়ে আয়না দেখে দাঁড়াবে না, এ হতে পারে ?) Then in a sudden daring moment, she pulled down her pant, raised her coat and skirt, and sat on the toilet. (বুঝুন কি কাণ্ড! কি ফ্রাঙ্ক মেয়ে দেখুন।) She know it was outrageous thing to do without locking or even closing the door, that he might walk in any moment, and yet that possibility exhilarated her. She was terrified that he might find her there, at the same time hoped that he would.

—The Last Tango in Paris by Robert Alley. Page 10

জেনি আতঙ্কিত ছিল যে খোলা দরজা দিয়ে পল এক্ষুনি ঢুকে পড়ে তার এই কাণ্ডটা দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু মনে মনে আশাও করছিল যে পল এসে দেখুক তার কাণ্ডখানা! এবার বলুন, এই মেয়ে এত নির্লজ্জ হয়েছে কেন ? কারণ সে একালের মেয়ে। সে জানত এই বর্জনীয় জলই কিছুদিন পরে হয়ে উঠবে গর্জনীয় গজল, হিসিই একদিন হিষ্ট্রি তৈরি করবে, এই ইউরিনই হয়ে উঠবে

ইউনিক। পস্টেরিয়রই একদিন হয়ে উঠবে সুপিরিয়র। এখন আমি বুঝতে পারছি 'লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস' ছবি হিসেবে সারা জগতে এত হৈচৈ কেন ফেলে দিয়েছে। কারণ সোজা। এই প্রথম মোশন পিকচার তৈরি হয়েছে যাতে নায়িকার ইমোশন নয়, মোশন দেখানো হয়েছে ছবিতে। নায়িকার নগ্ন পাছা মানে bum দেখিয়ে পরিচালক বলছেন যে আগামীকালের নরনারী বামপন্থী হবে না, হবে bumপন্থী। Assই হবে আমাদের Asset, আমাদের backই হবে আমাদের bank. প্রতি মানুষের বস্তিদেশে রয়েছে এক একটি শক্তির ঐরাবত, রয়েছে হস্তী। পাঁকেই রয়েছে পদ্ম।

দেখবেন এইবার পেটরোগা মেয়েদের বিয়ের বাজারদর বেড়ে যাবে। ডাইবেটিস ছেলেদের গুণাবলীর মধ্যে গণ্য হবে। হয়তো কাগজে পাত্রপাত্রী সংবাদে পড়বেন—"পাত্রী ব্যানার্জী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী বি এ। বয়সে কুড়ি। ইঞ্জিনীয়র, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা সরকারী নাম্বার ওয়ান অফিসার পাত্র চাই। পাত্রীর বিশেষ গুণ হল জন্মাবধি ক্রনিক ডিসেন্টির রোগী। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে প্রস্তুত।"

বা পাত্রী চাই কলামে বিজ্ঞাপন থাকবে—

"পাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্ক। কলকাতায় নিজস্ব বাটী আছে। ব্যবসায়ী। মাসিক আয় দু' হাজার টাকা। পূর্ব স্ত্রী মৃতা। একটি মাত্র কন্যা রয়েছে। হেরিডিটরী ডায়াবেটিস। পাত্রের এই ডায়াবেটিসের জন্য মাসে উপার্জন আরও তিনশত টাকা। পাত্রী ডায়াবেটিস রোগিণী হইলে অসবর্ণেও আপত্তি নেই। নিজস্ব ফোটো ও একটি শিশিতে ছ' আউন্স ইউরিন সহ পত্র লিখুন। অঘ্রানেই বিবাহ। পোস্ট বক্স ৪২০। লোকবার্তা, কলকাতা-০"

হাসবেন না, এই যুগ এল বলে। ডায়ারিয়া আর ডায়াবেটিস বর ও কনের বিশেষ উপার্জন ক্ষমতা হিসেবে ধরা হবে। রূপ বর্ণনায় মেয়েদের ৩৬" ২২" ৩৬" ইঙ্গিতে চলবে না, আরও দুটো অঙ্ক যোগ হবে। হয়তো ছাপা হবে—

বুক ৩৬" ইঞ্চি, কোমর ২২" ইঞ্চি নিতম্ব ৩৬" ইঞ্চি। দৈনিক স্থূল আবর্জনা বর্জন : ৫ কেজি। দৈনিক জলীয় অবর্জনা বর্জন : ১৫ লিটার।

স্বভাবত এই মেয়েই বিউটি কমপিটিশনে 'বিউটি কুইন' হবে। হয়তো দেখবেন কনষ্টিপেটেড সুন্দরী মেয়েদের জন্য পাত্রই জুটছে না। হঠাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে ডাইভোর্সই করে বসল। সব সম্ভব। পার্গেটিভ, ল্যাক্সেটিভ ব্লাকে কিনতে হবে। বিয়ার ও ডাবের দাম বেড়ে যাবে। হাসপাতালে হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কের মত থাকবে Stool Bank. পথে পথে বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন We need your stool give them generously. হয়তো আপনাকে উৎসাহিত করার জন্য বিষ্ঠার অসীম ক্ষমতার কথা পত্রেও ছাপা হবে। তাই পথের মোড়ে মোড়ে দেখবেন বোর্ড। তাতে লেখা—More stool mean more school. অথবা ক্যানেডী স্টাইলে—

Dont ask how much water the Government can supply, Ask how much water you can supply to the Goverment অথবা

Dont be in haste
And waste your waste
Unload your load
In energy comode.

প্রেম করবার ধারাও বদলে যাবে। ধরুন সমীর ও বিশাখার বেশ ভাব, কিন্তু সমীর এখনো বিয়ের প্রপোজাল দিয়ে ওঠে নি। সাহস হচ্ছে না। একদিন সমীর বিশাখাকে তার ব্যাচেলার ঘরে ডেকে পাঠাল। ইচ্ছে, আজ তার হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা জানাবে। বিয়ের প্রস্তাব রাখবে। অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে সমীর বসে আছে। বিশাখার দেখা নেই। এমন সময় সমীরের বাথরুমের দরজা খুলে বেড়িয়ে এল বিশাখা।

সমীর : তুমি এখানেই ছিলে ?

বিশাখা : এক ঘণ্টা আগে এসেছি। বাথরুম গিয়েছিলাম।

সমীর : সত্যি তোমার চোখ-মুখ উজ্জল লাগছে। লাক্স ব্যবহার করেছ বুঝি ?

বিশাখা : না গো, পার্গোলাক্স ব্যবহার করেছি। এই গত এক ঘণ্টায় তিনবার গিয়েছি তোমার বাথরুমে।

সমীর : সত্যি ? বিশাখা, এ ঋণ আমি কি ভাবে শোধ করব ? আমার কমোডের কি সৌভাগ্য আজ যে তুমি বসেছিল। তিন তিনবার। বিশাখা, এমন হয় না যে সারা জীবন তুমি আমার কমোড আলো করে বসে থাক ?

বিশাখা : সমীর মাই ডার্লিং, তুমি কি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ ?

সমীর : হ্যাঁ, তোমার উত্তর কি ? হ্যাঁ কি না ?

বিশাখা : বাচ্চা ছেলে, যেন আমার মন তুমি বুঝতে পার নি। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকেই বিয়ে করতে চাই।

সমীর : বিশাখা—

সমীর বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর ঠোঁট নামিয়ে আনল এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ডিং-এর জন্যে নেমে আসা জেট বিমানের মত। কিন্তু বিশাখা ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল, একটু পরে সোনামণি, আমি আরেকবার বাথরুম ঘুরে আসি।

বিশাখা বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আর মুগ্ধ নয়নে সে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল সমীর। দেখে বোঝা যায় যে বিশাখার বাচনযন্ত্রের চাইতে রেচনযন্ত্রেরর চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ ও।

দেখলেন তো লাভ-সিন্ ? সে যুগ এল বলে। অন্ধের মত আমরা স্থলে, জলে, মাটির নিচে, অন্তরীক্ষে শক্তির উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। জানতামই না যে ধূমকেতুর মত আমাদের পুচ্ছে এত শক্তি ছিল, ছিল এত অগ্নি। হনুমান পুচ্ছাগ্নির তেজ দেখিয়েছিলেন তো ত্রেতা যুগে ? এবার কলিযুগে সব মানুষই এক

একটি হহ্মান। কস্তুরী মৃগের মত এতদিন শুধু বৃথা হক্তে হয়ে খুঁজে মরেছি। এখন সে শক্তি আয়ত্তগত হয়েছে। অপচয়ের জয় হোক। নিষ্ঠার সঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করুন। রিফুইজীর মত পেট্রোলের জন্য হাত পাতব না আমরা। আমরা নিজেদের refuse থেকেই তৈরি করব huge energy.

আমরা stoolকেই tool বানিয়ে এগিয়ে যাব।

Arseকে ঘৃণা না করে আমরা ভাবব আমাদের Arseই মহাকাব্যের varse, কোন ডাইনীর curse নয়। সুতরাং মাভৈঃ।

পটের বিবি থেকে POTএর বিবি

ছাত্র বয়সে কোলকাতার ফুটপাথ থেকে পুরনো 'লাইফ' পত্রিকা কিনে 'মোনা লিসা'র ছবি কেটে বাঁধিয়েছিলাম। স্বর্গীয় হাসি নিয়ে মেয়েটির অপূর্ব ছবি শুধু দা ভিঞ্চির নয় পশ্চিমী সংস্কৃতির নিদর্শন ধরে নিয়েছিলাম। সে 'মোনা লিসা' তখন সন্ত যৌবনা প্রতিটি মেয়েতে খুঁজেছি, জীবনানন্দ দাশ মেরে একটি মেয়েকে চাটুকারিতায় অন্ধ হয়ে লিখেওছিলাম।

'চুল তব কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
হাসি তব দাভিঞ্চির মৃত্যুঞ্জয়ী মোনা লিসা'

ভাবুন ছবিটা আমাকে কি রকম অভিভূত করেছিল। 'মোনা লিসা' ছিল আমার মানসপ্রতিমা, আমার পটের বিবি। আর আজ? যে জুন মাসে য়ুরোপ ও আমেরিকায় সফর শেষ করে ফিরেছি। সঙ্গে এনেছি ওদেশের জনপ্রিয় (লক্ষাধিক বিক্রি) একটি বিরাটাকার পোস্টারচিত্র। ছবিটি হল একটি মেয়ে নগ্ন অবস্থায় কমোডে বসে তার প্রাতঃকৃত সারছে। হ্যাঁ স্যার, মোনা লিসা ছিল একটি মেয়ে হাসছে, আর এ ছবি হল একটি মেয়ে হাগছে! পশ্চিমী সভ্যতা সংস্কৃতির ১৯৭৫-এর চূড়ান্ত নিদর্শন। 'কমোড'কে 'পট'ও বলা হয় Pot। চালু ভাষায় মেয়েটি Pot-এ বসে তার দৈনন্দিন অতি প্রয়োজনীয় কর্মটি নির্লজ্জভাবে করছে। এ যুগধর্মের প্রতীক হল আজকের এই Pot-এর বিবি? হাসবেন না। পশ্চিমী সভ্যতার অধঃপতনের ইতিহাস এক লাইনে হল এই —পটের বিবি থেকে Pot-এর বিবিতে অবতরণ, স্বর্গ থেকে নরকে অবতরণ, অমল শুভ্রের সুষমা থেকে মলমূত্রের গ্লানিমায় অবতরণ,

চাঁদ থেকে ক্লেদে অবতরণ। য়ুরোপের ও [illegible] বড় বড় শহরে প্রচুর পোস্টার দেখেছি নানা ভঙ্গীমায় মলমূত্র ত্যাগে ব্যস্ত মেয়েরা, ছেলেদের সঙ্গে এক প্রস্রাবাগারে দণ্ডায়মান পুরুষদের সঙ্গে, মূত্রত্যাগ করছে। দণ্ডায়মানা এক সুন্দরী নারী (নিচে লেখা— WOMANS LIB মানে নারী স্বাধীনতার প্রতীক।) সর্বত্র নানাবিধ রূপে দেহজ অপচয় নিষ্কাষণে ব্যস্ত মেয়েদের বিভিন্ন ছবির ঢের লেগে আছে ও অনুসন্ধানে জেনেছি এগুলোর বিক্রি আকাশচুম্বী, কেননা যুগের 'টেস্ট' নাকি এখন এই সব ছবি। লেটেস্ট ফ্যাড্! তার মানে পশ্চিমী যুগের মানসপ্রতিমা হল এই Pot-এর বিবি। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সব আনো উপহার।'

সে যুগ আর নেই। বুদ্ধির ও হৃদয়ের খোলাদ্বার থেকে তখন অনেক উপহারই আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে, করে ধন্য হয়েছি। আমাদের জীবনকে উন্নত করেছে, বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেছে, মনকে জাগ্রত করেছে। আর এখন? বলা উচিত—

পশ্চিমী আজি খুলিয়াছে বাথরুম দ্বার।
সেথা হতে সব আনো নোংরা পোস্টার।

ভাবুন ওরাই আমাদের স্যানিটরী বিজ্ঞান শিখিয়েছে, ওরাই অতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর অপচয় বর্জন ক্ষেত্রকে সভ্য ও রুচিসম্মত নামকরণ করেছে Toilet, Rest Room, Gents ও Ladis, Bathroom ইত্যাদি। আর আজকাল স্থূলভাবে তার প্রদর্শনী করে চলেছে। আজকাল অনেক নাইটক্লাবে স্থূল নামকরণও করেছে ওরা এই বর্জন-কুঠুরীর। যেমন HE PEE ROOM, SHE-PEE ROOM, THOSE WHO DOES IT STANDING ও THOSE WHO DOES IT SITTING আর, দুটো জায়গায় ছেলেমেয়েদের একটাই বাথরুম নাম LOO FOR BOTH SEXES। সবচেয়ে সর্বজনীন কৌতুককর নাম হল, POTTY—BARE IT AND

SHARE IT এসব সব হল নারীপুরুষ ভেদাভেদ হীনতার চূড়ান্ত উদাহরণ। সত্যি এরপর আর কোন্ নরকে নামবে ওরা বলতে পারেন? পর্নোগ্রাফী আইনসিদ্ধ করেছে ওরা অনেকদিন। ডেনমার্ক থেকে শুরু করে সারা ইউরোপে আমেরিকায় কোথাও এখন অশ্লীল ছবি ও সাহিত্য নিষিদ্ধ নয়। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতেও বাৎস্যায়ন যৌনবিজ্ঞানের অনেক চর্চা করেছেন, খজুরাহো কোনারকে মিথুনকর্মের নানা ভঙ্গির প্রস্তরশিল্প রয়েছে (ফেলাশিও, কানিলিংগাস, সোডোমি কিছুই বাদ নেই তাতে) এ সবকিছুই শিল্পসম্মত মানতে রাজী আছি—এ রসের নাম আদিরস। কিন্তু বলুন তো শিল্পসাহিত্যে কোথাও আপনি কি মলমূত্র ত্যাগের কোন নজির দেখেছেন? বর্জনপ্রক্রিয়াও কি কোন রসের অন্তর্গত? মোটেই না। ঐ এক বস্তু এখনও আমাদের একমাত্র লজ্জাকর ও গোপনীয় বস্তু। নাযা কারণেই, শিশু ও ডাক্তার ছাড়া এ নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। কেননা এ বস্তু স্বাস্থ্যকর নিশ্চয়ই তবে রুচিকর নয়। প্রয়োজনীয় বটে, তবে প্রচারযোগ্য নয়। বাঙালী মেয়েদের সংস্কৃতি এত ভালো যে ব্লাডার ফেটে গেলেও সে মুখ ফুটে বলবে না যে তার কোন গোপনীয় প্রয়োজন রয়েছে। এটাই তো কালচার। ছোটবেলায় মেয়েবহুল পরিবারে মানুষ হয়ে কোনদিন আমি জানতেই পারতাম না যে কখন ওরা ছোট বাথরুম বা বড় বাথরুম করতে যেতো বা কবে ওদের ঋতু হতো। সেজন্যে আজ আমি গর্বিত বোধ করছি। এটাই রুচিসম্মত, এটাই সভ্য। ছোট বেলায় অতিরোমান্টিকতায় নারী মাত্রই মনে হতো দেবী। আর দেবীরা কখনও কি সাধারণ মানুষদের মত্তো মলমূত্র ত্যাগ করতে পারেন? ছিঃ ভাবতেই পারতাম না। স্বপ্নসুন্দরীরা, স্বর্গের দেবীরা এসবের ঊর্ধ্বে, ওরা পবিত্রতার গঙ্গা ওদের এইসব স্থূল মানবিক প্রয়োজনীয়তা থাকতেই পারে না, এই ছিল আমার বদ্ধমূল ধারণা। আজকের পশ্চিমী সভ্যতা এইসব সুন্দর পবিত্র বয়ঃসন্ধির রোমান্টিকতার মুখে

কুঠারাঘাত করেছে। ওরা শৈশব কৈশোর সব হারিয়েছে। দেহসর্বস্ব সুখের ক্লিনিক্যাল বস্তুতান্ত্রিকতায় অনুভূতির সৌকুমার্যকে হত্যা করা হয়েছে।

শরীরসুখী সভ্যতা আজ শরীরের সুখ খুঁজতে খুঁজতে বেডরুম হয়ে বাথরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রিয়্যালিটি শিল্প নয়। জীবন সাহিত্য নয়। শিল্প হচ্ছে সুন্দরতার চয়ন, জীবনের ত্রিস্তর দর্পণ নয়। শতদলের পরিচয় তার পঙ্কিল জন্মস্থান নয়, তার প্রস্ফুটিত রূপলাবণ্যে, তার নির্মল নৈবেদ্য।

আসলে ওরা সুখই খুঁজেছে, সুখের খোঁজে অন্ধের মতো ওরা অসুখের কলুষতাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কারণ ওরা জীবনকে দ্রুতলয়ে বেঁধে ফেলেছে। দ্রুত আনন্দের মোহে ওরা আজ দিশেহারা। রবিশংকর একবার বলেছিলেন আমেরিকানদের পক্ষে গভীর কোন শিল্প আয়ত্ত করা শক্ত। কেননা Instant coffeeর মতো ওরা সবকিছু Instent পেতে চায়। সেতার শিখতে এসে ভাবে দু'দিনে শিখে ফেলবে। যখন বোঝে তা সম্ভব নয় তখন ধৈর্য হারায়। অধ্যবসায় নেই ওদের। ফলে সব জিনিস fad ওদের কাছে। দীর্ঘ-স্থায়ী নয়। সত্যি কথা। দ্রুতগামী যুগে জীবন কাটানো যায়, উপভোগ করা যায় না। সুখটা জীবনের বড় কথা নয়। সুখের চেয়ে শান্তি অনেক বড়। আর শান্তি হল একটা state of mind, শান্তি বাজারে ডলার পাউণ্ড ফ্রাঁ দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। কথায় আছে আপনি টাকায় দামী পালংক কিনতে পারেন কিন্তু ঘুম কিনতে পারেন না। টাকা দিয়ে রেকর্ড ক্যাসেড স্টিরিও কিনতে পারেন, আনন্দ কিনতে পারেন না। টাকা দিয়ে তিলোত্তমা নারী কিনতে পারেন কিন্তু প্রেম পারেন না। টাকা দিয়ে চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় কিনতে পারেন, কিন্তু খিদে কিনতে পারেন না। মানে অর্থ দিয়ে সুখ কিনতে পারেন, শান্তি কিনতে পারেন না। অর্থ দিয়ে পরমার্থ কেনা যায় না। মনের বিকাশ থেকে অধ্যাত্ম জগতে যে উত্তরণ, যে উচ্চমার্গে সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সে ঐতিহ্য

শুধু ভারতবর্ষের নন্দনতত্ত্বে রয়েছে। আজকে পশ্চিমকে তাই এদেশে খুঁজতে হবে সেই সম্পদের জন্য, সেই ঐশ্বর্যের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নরকাগ্নি দেখে রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন পূর্ব দিগন্তে সূর্য ওঠে, সেই সূর্যোদয়ের দেশ থেকেই শান্তির বার্তা গ্রহণ করতে হবে অস্তগামী সূর্যের দেশ পশ্চিমকে। ক্রিস্টোফার ইশারউড, আলডুস হাক্সলী, রোমাঁ রলাঁ, ম্যাক্সমুলার এই সব মনীষীরা অনেক আগেই এ তথ্য বুঝতে পেরেছিলেন। ম্যাক্স-মুলারের বিখ্যাত সে লাইন ক'টি অমর হয়ে আছে। উনি বলেছিলেন —If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which will deserve attention even of those who have studied Plato and kant—I should point to India.

মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় একথা ভেবে যে আজ থেকে তিরানব্বুই বছর আগে প্রখ্যাত জার্মান মনীষী এ কথা বলেছিলেন। উনি ভারতের মর্মবাণী বুঝে পশ্চিম জগতের জন্য খুবই মহৎকর্ম করে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে ছেলেকে লেখা চিঠিতে উনি লিখেছিলেন —I have laid foundation that will last, and though people dont see the blocks buried in a river, it is on these unseen blocks that bridge rests সেতুবন্ধন করেছিলেন দুই সংস্কৃতির মধ্যে। ভারতের অন্তরাত্মা ভারতের দর্শনের উচ্চমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন।

আজ Pot-এর বিবি সভ্যতার বেনোজলে ওরা শান্তির গঙ্গা খুঁজে পাচ্ছে না। রিপুর খাঁচায় কোনদিন শান্তির পাখিকে ধরা যায় না। অসহায় হয়ে কিছু কিছু লোক পূব দিকে তাকাতে শুরু করেছে। শরীরের অপচয়ে শান্তির উপচার যে নেই সে কথা কিছু লোক বুঝতে পারছে। তবে দুঃখের বিষয় সে দুর্বলতার সুযোগ

নিয়ে এদেশের অনেক ভক্তরা সাধু, মহারাজ, গুরু সেজে ওদেশে গিয়ে ভগবানের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। অতীন্দ্রিয় শান্তির নামে এঁরা ওখানে গিয়ে ত্বরিৎ শান্তি বিতরণের দোকান খুলে বসেছে, এইসব ঠগদের জন্য ভারতবর্ষের গৌরবময় মানসপ্রতিমা কলঙ্কিত হচ্ছে। যুগধর্মের এই corruption বন্ধ করা সম্ভব হলে করা উচিত। ঐতিহ্য ও সভ্যতার অবমাননা সহ্য করার মানে হয় না। Pot-এর বিবির রুগ্ন সভ্যতার আরোগ্য এইসব কপট 'বাবা'দের হাতে নয়। দেহাতীত শান্তির ঠিকানা দেওয়া ভুয়া ব্যবসায়ী ভক্তদের সাধ্যাতীত। কিন্তু সর্বপ্রথমে আমাদের ঘর আগে ঠিক করতে হবে। পশ্চিম থেকে জিনিস স্মাগলিং বন্ধ করলেই হবে না। বিজ্ঞান ওদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে রাজি আছি, কিন্তু অজ্ঞান নয়। আমাদের ঐতিহ্যময় মহৎ সাংস্কৃতিক শক্তিকে নতুন করে জানতে হবে আমাদের, চিনতে হবে, শিখতে হবে। আত্মার মোক্ষ যে জ্ঞানে, যা আমাদের পরমার্থ, যা আমাদের বিধাতা তাকে চিনতে হবে। ওদের বিজ্ঞান আমাদের বিধাতা এই দুয়ের সঙ্গমের যে প্রয়াগ, সে প্রয়াগে অবগাহন করতে পারলেই আজ বিশ্বমানব-সমাজের গ্লানি মুক্ত হওয়া সম্ভব? সেই মুক্তিস্নানেই বিশ্বের পাপ-মুক্তি সম্ভব। এ প্রয়াগেই রয়েছে মানবমনের শান্তির জল, মানব-জীবনের সার্থকতার মূল্যায়ন। সেজন্যে আমাদের নিজেদের প্রার্থনা হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নির্ধারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

ভারতকে সেই স্বর্গ হতে হবে। তখন পশ্চিম ওদের নরক থেকে এই স্বর্গের দিকে হাত বাড়াবে। কামনা করি উদয় দিগন্তের মতো এবার আমাদের হৃদয় দিগন্তে সূর্য উঠুক। সে সূর্য পশ্চিম দিগন্তকেও আলোকিত করে তুলুক। পৃথিবীতে আজ অমাবস্যার গহন রাত্রি। আলোর বড় প্রয়োজন। সূর্য উঠুক, রাত কাটুক। Lead kindly light পূর্বকে আজ অভূতপূর্ব হতে হবে। পূর্বকে আজ গর্ব হয়ে উঠতে হবে। জাগতে হবে, আর জাগাতে হবে। 'সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমি'—একথা প্রমাণ করতে হবে। প্রচার করতে হবে।

গুজবের সংজ্ঞা কি ?

'চলন্তিকা'য় রাজশেখর বসু তো গুজব মানে "জনরব" বলে বুঝিয়েছেন। অক্সফোর্ড ডিক্শনারীতে রয়েছে Rumour=Report of doubtful accuracy. এগুলো গুজবের মানে হতে পারে কিন্তু সংজ্ঞা বলা যায় না। সংজ্ঞা ভাবতে গিয়ে আমার সংজ্ঞাহীন হবার যোগাড়। "মিথ্যে রটনা" বলতে পারেন। শেকসপীয়র অবশ্য বলেছেন চমৎকার। উনি বলেছেন—

Rumour is a pipe
Blown by surmises, jealousies
conjectures.

—Henry IV

বুড়ো ঠিক সংজ্ঞা দিয়েছে। নয় কি ?

সবসময়ে শুনবেন লোকে বলবে—গুজবে কান দেবেন না। কান দেবো না তো কি দেবো, নাক দেবো ? গুজব এ যুগের অনেকেরই Main Job. মানুষের জীবনে ত্রিগুণ কি কি অবশ্যপ্রয়োজনীয়. আমার জানা নেই, কিন্তু 'ত্রিগু' কি কি বলতে পারি। ত্রি-গু হল— গুল, গুজব ও গুঞ্জন। এই তিন বস্তু ছাড়া সাধারণ লোক, বিশেষ করে স্ত্রীলোক, বাঁচতেই পারবে না। গুল থেকে গুঞ্জন আর গুঞ্জন থেকে গুজব। গুলের উৎপত্তি কোথায় ? উর্দুভাষীরা বলবেন বাগানে কেননা ওই ভাষায় গুল মানে ফুল। কিন্তু আমাদের ভাষায় গুলকে উর্দুভাষীরা বলবেন 'ফেক্না'। গুলবাজকে বলবেন ফেকুমাস্টার। যাই হোক ভাষার মাস্টামী না করে আসুন গুলের গুলতানীতে। গুলের উৎপত্তি হয় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বা হীনমন্ততা থেকে।

আত্মপ্রচারণা প্রণোদিত ও ঈর্ষাপরায়ণা প্রণোদিত। অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছিলেন—Whatever I like it is either immoral, illegal or illicit. মানে অনৈতিক, বেআইনী ও বিকারগ্রস্ত। এই তিনক্ষেত্রে থেকেই কিন্তু বেশীর ভাগ গুল ও গুঞ্জনের সূত্রপাত হয় আর সেটা ক্রমে গুজবের নায়েগ্রা প্রপাত হয়ে দেখা দেয়। তিল থেকে তাল হয়। গাগর থেকে সাগর হয়। বিন্দু থেকে সিন্ধু হয়। চেস্ট্ থেকে ব্রেস্ট্ হয়। ক্যারাভেল্ থেকে কনকর্ড হয়।

এই ধরুন আমার বন্ধু রমেশ চাড্ডা। চাড্ডা আড্ডা মারতে ওস্তাদ আর গুলের গাঁজা মানে গুলের রাজা। আমাকে এসে একদিন বলল,—জানিস গুজরাটের বরোদা থেকে সত্তর মাইল দূর একটা জায়গা আছে নাম 'ভবিষ্'। ছোট্ট শহর এই ভবিষ্। মানে ভবিষ্যৎ। ওখানে বড়লোকেরা সব যায় গোপনে হলিডে করতে। সবাই নেকেড্ থাকে সেখানে। একেবারে ইডেন গার্ডেন বা নন্দনকানন বলতে পারো।

চোখ গোল গোল করে আমি বললাম,—নিউডিস্ট কলোনী বুঝি এদেশেও শুরু হয়েছে? হ্যাঁ রে চাড্ডা, কমপ্লিট্ নিউড থাকে ছেলে ও মেয়েরা?

ডোণ্ট্ বি সিলি,—জবাব দেয় চাড্ডা,—না। কমপ্লিট থাকবে কেন? দে আর নট্ পারভার্ট। সে শহরে একটা ব্যাংক আছে ও আরেকটা পোস্ট অফিস আছে। ছেলেদের পোশাক ব্যাংক সরবরাহ করে, মেয়েদের পোশাক পোস্ট অফিস।

আমি বুড়বাক,—মানে?

চাড্ডা আমার গাড্ডার মতো খোলা মুখ দেখে হাসে। তারপর বলল,—ছেলেরা তাদের লজ্জাস্থান ঢাকে টাকার নোট দিয়ে। একর্ডিং টু ফাইনানসিয়াল্ স্ট্যাটাস্, বুঝেছো? গরীবরা এক টাকার নোট দিয়ে ঢাকে, মধ্যবিত্তরা দশ টাকার নোট দিয়ে, ধনীরা একশ' টাকার নোট দিয়ে। যারা দেশী পোশাক পছন্দ করে না তারা অবশ্য স্মাগ্ল্ নোট ব্যবহার করে। লিরা, ফ্রাংক, পাউণ্ড, ডলার পাওয়া যায়।

স্মাগ্‌ল্‌ বিদেশী নোরে টভীষণ দাম। আমি ষোল টাকা দিয়ে ছ'টো পাকিস্তানী নোট কিনে পরেছিলাম। মেয়েরা পোশাক কেনে পোস্ট অফিসে। সেটা হল স্ট্যাম্প। ওদের লজ্জা ঢাকতে তিনটে স্ট্যাম্প কিনতে হয়। এখানেও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী পোশাক।

গরীব মেয়েরা দশ পয়সা থেকে পঁচিশ পয়সার স্ট্যাম্প কেনে, মধ্যবিত্তরা এক টাকার স্ট্যাম্প পর্যন্ত কেনে, পাঁচটাকা দশ টাকার স্ট্যাম্প পরে ধনীর দুলালীরা। রতনপুরের মহারানীকে দেখলাম স্মাগ্‌ল্‌ করা ইংলণ্ডের স্ট্যাম্প পরেছিলেন। সেগুলোর একটার দাম চল্লিশ টাকার কম হবে না। মেয়েরা স্মাগ্‌ল্‌ পোশাকই বেশী পছন্দ করে। তোদের ধর্মেন্দর আর হেমা মালিনীকেও দেখলাম। ধর্মেন্দর দেশী একশ' টাকার নোট পরেছিল। কিন্তু হেমা পরেছিল তিনটে লাইট্‌ ব্লু কালারের ফ্রেঞ্চ স্ট্যাম্প। তোদের হেমা কিন্তু ধর্মেন্দরের মতো এতটা পেট্রিয়টিক্‌ নয়। ভদ্রমহিলার হংকং, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়ার স্ট্যাম্প পছন্দই নয়। উনি চান শুধু ফ্রেঞ্চ ও আমেরিকান স্ট্যাম্প। কাঁচা টাকা তো, তাই। রমেশ চাড্ডার এই গুলতানী শুনে কি জাবাব দেবেন? আমি তো সরকারকে অনুরোধ করেছি আগামী বছর যেন চাড্ডা মশাইকে 'গুলভূষণ' না হোক, নিবেদন পক্ষে 'গুলশ্রী' উপাধি দেওয়া হয়। এরকম গুলের গোলন্দাজ কমই পাওয়া যাবে এদেশে।

হলিউডের একটা রিপোর্টারের গুল শোনাই।

উনি লিখেছিলেন যে একদিন বিরাট এক প্রিমিয়র শো ভাঙার পর বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালকরা লাউঞ্জে বেরিয়ে এসেছেন। গেটকীপার মাইকের সামনে একে একে স্বনামধন্য অতিথিদের নাম বলে তাঁদের গাড়ির জন্য ডেকে পাঠাচ্ছে। হলের পেছনে পার্কিং লটে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে সে নাম শুনে ড্রাইভাররা গাড়ি চালিয়ে হলের সামনে আসছে ও সে অতিথি গাড়িতে উঠে বাড়ি যাচ্ছেন।

অভিনেতা জন কাবু লাউঞ্জে এলেন।

গেটকীপার ঘোষণা করলেন—জন কার্‌স্‌ কার্‌ প্লিজ।

গাড়ি এল। উনি উঠে চলে গেলেন।

ডেবোরা কার্‌ বেরিয়ে এলেন। উনি ঘোষকের কাছে গিয়ে বললেন—শোন, আমি আমার পদবী Curr-এর উচ্চারণ 'কার্‌' করি না। আমি 'কুর্‌' করি। সুতরাং সঠিক ঘোষণা করো।

গেটকীপার বলল,—ইয়েস্‌ ম্যাডাম। তারপরই মাইকে ঘোষণা করল,—মিস্‌ কার্‌স্‌ কুর্‌ প্লিজ। নো নো স্যরি। মিস কুরস্‌ কুর্‌ প্লিজ। নো নো, মিস কুরস্‌ কার্‌ প্লিজ।

উল্টোপাল্টা বলে বেচারা ঘেমে অস্থির।

এরপর গেটকীপার দেখল এলিজাবেথ টেলর আর আলফ্রেড হিচকক্‌ এগিয়ে আসছেন। মাইক ধরে সে ঘোষণা করল,—মিস্টার আলফ্রেড হিচকক্‌স্‌ কক্‌ প্লিজ।

শুনে সবাই বোবা। লোকটা আলফ্রেড হিচককের গাড়ির বদলে তাঁর পুরুষাঙ্গকে আহ্বান জানিয়েছে?

কিন্তু সবাই ধাতস্থ হবার আগেই মাইকে গমগম করে উঠল গেটকীপারের গলা,—মিস্‌ এলিজাবেথ টেলর্‌স্‌ টেল্‌ প্লিজ। হিচককের লিঙ্গকে আহ্বান করার পর গাধাটা এলিজাবেথ টেলরের গাড়িকে না ডেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভদ্রমহিলার টেল্‌ মানে তাঁর মূল্য নিতম্বকে।

ল্যাঠা আর কাকে বলে। উপস্থিত অতিথিদের ভিরমি যাবার যোগাড়। কিন্তু সম্প্রতি আল উইলসনের একটা প্রবন্ধে জানলাম উপরোক্ত সমস্ত ঘটনাটাই গুল। সেই রিপোর্টারের কৌতুকোর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো। গুল বটে, তবে রসিক রিপোর্টার এমন গুল্‌ ঝেড়েছেন যা পাঠক-পাঠিকাদের মশগুল রাখতে পারে।

যদিও নামের ওপর কমেডী করে ওপরের উল্লিখিত গুলটির সৃষ্টি হয়েছে তবু নামকরণের বিপদের সত্যিকারের নজিরও আছে। দুটো ঘটনা এখানে আমি অনায়াসে উল্লেখ করতে পারি। দুটোই ফ্যাক্ট, ফিকশন্‌ নয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র

আমার সঙ্গে হলিউডে বেভারলী হিল্‌স্ হিলটন্ হোটেলে দেখা করতে এসেছিল। লস্ এঞ্জেলেস্ শহর থেকে বেশ দূরে আমার এই হোটেল। ওদের ক্যাম্পাস থেকেও দূরে। যাই হোক সদ্য দেশ থেকে আসা ভারতীয়কে পেয়ে বেশ খানিকক্ষণ বিশুদ্ধ আড্ডা মারা গেল। লক্ষ্য করছিলাম ওদের মধ্যে একটি ছেলে রাজেন্দ্র দিক্ষিত একটু বেশী চুপচাপ।

প্রশ্ন করলাম—মিঃ ডিকশিট্ আপনি এত চুপচাপ কেন?

বঙ্গসন্তান প্রসূন বোস বলল,—আমি বলছি শচীনদা ওর মৌনের কারণ।

বললাম,—নিশ্চয়ই কোন মার্কিন তনয়ার সঙ্গে প্রেম।

প্রসূন বলল—প্রেমে ব্যর্থতা বলতে পারেন।

মানে?—আমি জানতে চাইলাম।

প্রসূন বলল,—আপনি বোম্বে থাকেন তাই নিশ্চয়ই জানেন ওর সঠিক পদবীর উচ্চারণ। আমরা বাংলায় দিখ্যিত' বলি, কিন্তু আসলে 'দিকশিত' ইংরেজীতে Dikshit লেখা হয়। ঠিক কিনা?

আমি বললাম,—ঠিক।

এখানের ছাত্র ছাত্রী, বিশেষত মার্কিন মেয়েরা ওকে জ্বালিয়ে মারে। ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছেড়েছে।

কেন?—আমি শুধোলাম।

প্রসূন বলল,—মেয়েরা সহজকণ্ঠে ওকে প্রশ্ন করে,—What you said your name? Dik,—then what?

এর জবাব কি হয় বুঝতেই পারছেন। Dik-এর পর ওর পদবীর শেষাংশ ইংরেজী ভাষায় Shit হয়। মানে বিষ্ঠা। তাহলে বুঝুন বেচারীর অবস্থা। প্রেম করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। মেয়েরা ওর পদবী নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করে। এক একবার বেচারী কেঁদে ফেলে। বলুন দাদা, পদবী নিয়ে কি বিভ্রাট। এ দেশে ওর প্রেমের চান্স শূন্য।

হাসি আমারও পেয়েছিল। নাম বেচারাকে সত্যি বিপদেই

ফেলেছে। Dik-এর পর Shit থাকলে বিদেশে বাঁচবে কি করে। আপনারাই বলুন।

আরেকটি সত্যি ঘটনা শুনুন। এটা কোলকাতার।

এটাও Dikshit-এর মতো বানানঘটিত না হলেও উচ্চারণ—ঘটিত। পাঞ্জাবী মেয়ে। আমার—বন্ধু প্রকাশ মেহরার বোন পদ্মিনী মেহরা। চেহারাটির লচক আছে। বক্ষপ্রদেশ ও বস্তিপ্রদেশে ঈশ্বরের দানে কৃপণতা নেই। ওর দোদুল্যমান তরঙ্গায়িত পশ্চাৎ-দেশটির পেছনে পেছনে রগরগে যে কোন ছেলে পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক দিয়ে হেঁটে হেঁটে চাই কি নরক পর্যন্ত যেতে রাজী হবে। যাই হোক, এই পদ্মিনীর কোলকাতায় চাকরির বদলী হল। তিন মাস পর সাতদিনের ছুটিতে বোম্বে এসে আমার কাছে কেঁদে ফেলার যোগাড়।

কাঁদছ কেন?—প্রশ্ন করলাম।

ইউ বেঙ্গলীজ্ আর টু মাচ্,—বলল পদ্মিনী।

কেন কি হয়েছে?—প্রশ্ন করলাম।

ও যা বলল তার সারমর্ম হল এই।

বাঙালীরা ওর নাম উচ্চারণ করতো 'পদ্মিনি'। ভুল উচ্চারণ বলে বেচারী সবাইকে বলত,—নো নো। রং প্রনানসিয়েশান্। ম্যাই নেম ইজ্ পোদ্মিনি। ব্যাস্, যায় কোথায়? সব বাঙালী ছেলেরা, এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত তখন থেকে পেছনে লাগল। তোমার নামের সঠিক উচ্চারণটা যেন কি,—প্রশ্ন করত ওরা। তারপর হাসি চেপে বলত,—'পোদমিনি'। তাই না? বেশ নাম। বলে অনেকে হেসে গড়িয়ে পড়ত। বেচারী, বাংলায় তার এই নাম উচ্চারণের প্রথম দুই অক্ষরে মিলে যে এমন অসভ্য কথা হয় তা সে মোটেই জানত না। জেনে লজ্জায় মরে যায় আর কি।

যাই হোক, আমি ওর দুঃখের কথায় সায় দিয়ে বললাম,—সত্যি নাম নিয়ে কোলকাতায় বাঙালীমহলে তুমি বড্ড বিপদে পড়েছো। তবু একটা কথা বলব অসভ্য অর্থেও কিন্তু সার্থকনামা তুমি।

কি ?—চোখে বিদ্যুৎ এনে বলল পদ্মিনী—, তুম্‌ভী এয়সা বাৎ করতা হ্যায়।

স্যরি,—বললাম আমি,—অন্ সেকেণ্ড থট্ সার্থকনামা নয় তোমার নাম। 'মিনি' মোটেই নয় তোমার ইয়ে। উচিত ছিল তোমার নাম হওয়া 'পোদম্যাক্সি'। কি বল ? ঠিক না ?

ইউ ব্রুট্, আই অ্যাম নট্ এ হিপোপটোমাস, আই অ্যাম নট্ বট্‌ম্ হেভী। ইউ বেঙ্গলী রাসকেল্। গো এণ্ড গেট্ লস্ট্,—বলে পদ্মিনী মেহরা ঘরে ঢুকে গেল। বলা বাহুল্য তার ম্যাক্সি বটম্ সহ।

'দিক্ষিত' আর 'পদ্মিনী'র নামের জন্য বিড়ম্বনা কেমন দেখলেন তো ?

সত্যি ঘটনা ছেড়ে আসুন আবার রটনার আলোচনায় ফিরে যাই। ফিরে যাই গুল—গুঞ্জন—গুজবের রাজত্বে।

দেখুন মহাকবি ইকবাল কি এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে গিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত গানে। উনি বলেছিলেন—

সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা।

হাম বুলবুল হ্যায় ইসকা, এ গুলিস্তাঁ হামারা।

উনি এদেশকে গুলিস্তান বলেছেন। বাংলা অর্থেই বলেছেন। গুলের দেশ বলে উনি গুলিস্তান বলেছেন এদেশকে। ঠিকই বলেছেন। ছোটবেলা থেকে আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরেছি। দেখেছি, কিছু কিছু গুল সর্বভারতীয়। সর্বজনীন ব্যাপার আর কি ! দু'টো উদাহরণ দিই।

প্রথম উদাহরণ।

আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তার থাকতেন। শীতের রাত। বাইরে ঘন কুয়াশা। মাঘ মাস। হঠাৎ ঝনঝন করে ডাক্তারের ফোনটা বেজে উঠল। ওধারে কাতর কণ্ঠ,—ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির আসুন। বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। বুকে বড্ড যন্ত্রণা। বাঁচবো না বোধ হয়।

ডাক্তার : আপনার ঠিকানা বলুন।

রোগী : রতন কুঠি, ১০ সরোজিনী রোড।

ডাক্তার : ঠিক আছে। এক্ষুনি আসছি।

তৈরী হয়ে ডাক্তার তাঁর গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন সরোজিনী রোড। খুঁজে বার করলেন ১০ নম্বর 'রতন কুঠি'। মান্ধাতার আমলের জরাজীর্ণ প্রাসাদ। এককালে ঐশ্বর্যময় ছিল বোঝা যায়। এখন দুর্দশাগ্রস্ত।

কড়া নাড়তেই দেখলেন দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। ভেতরে ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন। উপরে তাকালেন। দেখলেন সিঁড়ির ওপর দোতলায় একটা ঘর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কাতর গোঙানির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রোগী ওই ঘরে কষ্ট পাচ্ছে। বাড়িতে বোধ হয় অন্য কোন প্রাণী নেই। ডাক্তার পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালালেন। এক একটা কাঠি জ্বালিয়ে তিন চারটে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠে এলেন।

তারপর রোগীর ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে কোন ইলেকট্রিক আলো নেই। টিমটিম করে শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে।

গুমোট একটা দুর্গন্ধ রয়েছে ঘরে। বিছানায় কম্বল চাপা একটি মানুষের অবয়ব। সেখান থেকেই গোঙানির শব্দ আসছে।

বিছানার কাছে গিয়ে ডাক্তার বললেন,—আমি ডাক্তার। মাথা-টাথা ঢেকে শুয়েছেন কেন? নিন হাতটা দিন।

কম্বলের তলায় নড়াচড়া দেখা গেল, তারপরই একটা হাত বেরিয়ে এল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তারের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। ভয়ে সারা মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠল। হাতটা মানুষের মাংসল হাত নয়। একটা কংকালের হাত। ধীরে মাথা থেকে কম্বল সরে গেল। কংকালের মাথা। শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে নীল নীল আলো। ঠোঁটহীন মাড়িহীন-সাদা দাঁতগুলো নৃশংসভাবে হাঁ করে হঠাৎ নারকীয় উল্লাসে হা-হা-হা অদ্ভুত শব্দে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটা নিভে গেল দপ্ করে।

প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠে ডাক্তার প্রাণভয়ে দৌড় লাগালেন। কি করে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এসেছেন ডাক্তারবাবুর কিছু মনে নেই। বাড়ি এসে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেল ডাক্তারের।

পরদিন সুস্থ হয়ে ডাক্তার প্রথমেই পুলিশ_স্টেশনে খবর দিয়ে জানালেন তাঁর এই ভুতুড়ে অভিজ্ঞতার কথা।

পুলিশ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছুলেন রতন কুঠিতে।

দেখলেন দরজার বাইরে মরচে ধরা মস্ত তালা ঝুলছে।

প্রতিবেশীরা জানালেন এই বাড়িটা গত ত্রিশ বৎসর ধরে এভাবে খালি পড়ে রয়েছে। না, ওখানে কেউ থাকে না। কাউকে কেউ আসতে যেতেও দেখে নি। ডাক্তার হতভম্ব। তবে কি কালকের সব ঘটনাই দুঃস্বপ্ন মাত্র? ডাক্তারের অনুরোধে দরজার তালা ভাঙা হল। ওপরের ঘরে গিয়ে দেখা গেল, না, কোন কংকাল নেই। শুধু একটা পুরনো খাট রয়েছে আর ধুলোবালি মাকড়সার জাল ভরা অতীত দিনের কিছু অন্যান্য আসবাবপত্র। পুলিশ বললেন,—স্যরি ডাক্তারবাবু, ভূতটুত বাজে কথা। এ বাড়িতে কাল রাতে আপনি মোটেই আসেন নি। সবটাই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল।

ডাক্তারের কিছু জবাব দেবার নেই। মাথা নীচু করে মোহ-গ্রস্তের মতো উনি নেমে আসছিলেন পুলিশের পিছু পিছু।

তখনই চোখে পড়ল তাঁর।

হ্যাঁ, ঐ তো, সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে।

দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি। কালকে যেগুলো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে উনি সিঁড়ি চড়েছিলেন। সেগুলো।. সদ্য পোড়া দেখলেই বোঝা যায়। একটা একটা করে তুলে নিলেন ডাক্তার। ছ'টি পোড়া কাঠি। পুলিশকে দেখালেন। দেখুন স্যার, প্রমাণ। ছ'টি পোড়া কাঠি। সদ্য জ্বালানোর সব লক্ষণ পাবেন এগুলোতে। এগুলোই

প্রমাণ দিচ্ছে যে কাল রাতে আমি এসেছিলাম এখানে। এই বাড়িতে। সত্য কিনা বলুন?

পুলিশের মুখে এখন আর কোন শব্দ নেই। তারা স্থাণুর মতো তাকিয়ে রইল ওই পোড়া দেশলাই-কাঠিগুলোর দিকে।

উপরোক্ত এই ভূতের গল্পটা আমাকে বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় বাইশ জন শুনিয়েছে! প্রত্যেকেরই দাবি যে এ ঘটনাটা তার পাড়াতেই হয়েছে। ডাক্তার তাদের বিশেষ পরিচিত, ওই ভূতুড়ে বাড়িটা তারা ভালো করে চেনে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে এটা গল্পই, গুলই। প্রত্যেকে নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছে বলে এই ভূতুড়ে গুলটা চালিয়ে আসছে। এটা আমার ধারণা খুব পপুলার গুল।

দ্বিতীয় উদাহরণটা শুনুন।

কিশোর বয়েসে এই গুলটা সবাই শুনে থাকবেন। বা শুনিয়ে থাকবেন।

জানিস, আমাদের পাশের বাড়ি এই ঘটনাটা ঘটেছিল। ছেলেটা আর মেয়েটা দু'জনকেই আমি চিনতাম। ওরা ভাইবোন। দু'জনের যৌন সম্পর্ক ছিল। একবার লুকিয়ে এরকম পাপাচার করতে গিয়ে বিপদ হল ওদের। সংসর্গের পর কিছুতেই বিযুক্ত হতে পারছিল না ওরা। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আসে। এম্বুলেন্সে করে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হয়েছিল। সার্জন অপারেশন করে ওদের আলাদা করে।

মেয়েটি সুইসাইড করে। লজ্জায় ফ্যামিলিটা পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

উপরোক্ত এই সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসীটা খুবই বহু পরিচিত গুল কিশোর মনের ফ্রাস্ট্রেশন থেকে এর জন্ম। দৃশ্যমান সারমেয়-সংগমের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] ইনসেস্টুয়াস সম্পর্ক—সবটাই গুলবাজের যৌন-হীনমন্যতার ফসল। এ গল্প রেঙ্গুনে, কোলকাতায়, ঢাকায়

সর্বত্র আমি কিশোর বয়েসে শুনেছি। প্রতিটি বক্তাই বলেছেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সে। কেউ প্রতিবেশীর ঘটনা বলে চালান, কেউ আবার বলেন, যে সার্জন ওদের মুক্ত করেছে সে তার আপন কাকা-মামা বা জ্যাঠামশাই।

আসলে সব গল্পটাই তার মনের জ্যাঠামো মাত্র।

গুল থেকে গুঞ্জন যাকে ইংরেজীতে বলে গসিপ।

আর গুঞ্জন থেকেই গুজব, যাকে ইংরেজীতে বলে রিউমার।

রিউমারের একটা আদিরসাত্মক সংজ্ঞাও রয়েছে। এই সংজ্ঞাটা ইংরেজদের সৃষ্টি। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জোকটা চালানো হয়েছে।

প্রশ্ন : ফরাসী মেয়েদের যোনিকে কেন 'রিউমার' বলা হয় ?

জবাব : Because it travels from month to month। কৌতুকীস্রষ্টা বলতে চান ফরাসী মেয়েরা 'ফেল্যাশিও'র ভক্ত। ওঁরা নর্মাল সেক্স-এর চাইতে এব্‌নরমালের ভক্ত। গুজব মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় বলে তাকে "গুজব" বলা হয়, তাহলে ফরাসী মেয়েদের যৌনাঙ্গকে কেন গুজব আখ্যা দেওয়া হবে না যখন সেটা travels from month to month!

এখানে আমি অবশ্য উল্লেখ করে দিতে চাই যে ফরাসীরা সত্যি সত্যি যৌনবিকারগ্রস্ত এ ধারণা ভুল। অন্য যে কোন দেশের অধিবাসীদের মতোই ফরাসী জাতির যৌনজীবন। মানে সুস্থও রয়েছে, অসুস্থও রয়েছে। যা একান্ত স্বাভাবিক। ইংরেজরা ফরাসীদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে চিরকালই হীনমন্যতায় ভুগত। তাই ওদের সবরকমভাবে হেয় করে ওরা। কৌতুকগুলিতে বেশী করে হেয় করার প্রচেষ্টা হয়। এটা মানুষের অদ্ভুত এক দুর্বলতা। সেজন্য না বলে ছুটি নেওয়াকে ইংরেজরা খামোকাই বলে "ফ্রেঞ্চ লিভ্", মুখ দিয়ে যৌনাঙ্গ সম্ভোগ, যাকে বলে "ওরাল্ সেক্স" সেটার মিছিমিছি নামকরণ করা হয়েছে "ফ্রেঞ্চ লাভ্", প্রফেলেকটিক্-কে বলে "ফ্রেঞ্চ লেদার" ইত্যাদি। এসব আগেই বলেছি, হীনমন্যতার ফসল। এদেশেও সর্দারজীদের শক্তি সাহস সম্পর্কে অন্যান্য প্রদেশীদের

ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে বলেই কৌতুকাতে ওদের নির্বোধ বানানো হয়। এই কারণে আমেরিকার শ্বেতচর্মীরা নিগ্রোদের আদর কৌতুকীতে পশুবৎ বানিয়ে আনন্দ পাচ্ছে।

মাপ করবেন, লিখতে লিখতে প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি।

এখানে শুধু এটুকু বলে দিই। আদিরসাত্মক কৌতুকী কেন সৃষ্টি হয়েছে এ প্রসঙ্গে যদি গভীর গবেষণার ইচ্ছে হয় তাহলে আপনাদের সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন—Rationale of Dirty Jokes বইয়ের দুই খণ্ডে। লেখক G. Legman। মোটা মোটা দু'টি খণ্ডে লেখকমশাই প্রচুর রিসার্চের ফলশ্রুতি-সংকলিত ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ। বই দু'টির প্রকাশক লণ্ডনের Jonathan Cape Company, এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানি।

প্রচুর জ্ঞানদান করা গেল। এবার আবার গুলদান করা যাক। শচীন ভৌমিক এখন আর বচন ফকির নয়, গুলবচন ফকির। 'গুলমগীর' বলতে পারছি না, কেননা সেটা সৈয়দ মুজতবা আলী আগেই আত্মসাৎ করেছেন। গুলের যাবতীয়-পদবীই উনি নিয়ে নিয়েছেন। "চতুরঙ্গে"র তাঁর "গাঁজা" নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

…"অজন বুঝিয়ে বলে,—'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলমগীর।'

আমি বললুম,—হাসালিরে হাসালি। এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথমে আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলী, তারপর লণ্ডনে নেমে হলুম ডিউক অফ্ গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল। তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ।

তা ভালো, ভালো। গুলমগীর। বেশ বেশ।'……

দেখলেন তা গুলের কোন পদবী কি আর বেঁচে আছে আমার জন্য? সবই তো সৈয়দ সাহেব নিয়ে বসেছেন। ঠিক আছে, আমি তাহলে 'গুলবচন'ই হলাম। আদর করে 'গুলবচন' না ডেকে 'গুলবদন'ও ডাকতে পারেন, আপত্তি করব না। জানি প্রতিটি গুল্ শুরু হয় মিথ্যা থেকে। প্রতিটি না হোক, বেশীর ভাগই রং চড়িয়ে গুল থেকে গল্প হয়। উর্দুভাষীরা বলে যোখ চিল্লীর গল্প।

তা হোক, কিন্তু ভেবে দেখুন, গুলগাল যদি না থাকতো পৃথিবীটা তাহলে কি রকম বোরিং জায়গা হতো। তাই না?

Heywood Broun সেজন্য বলে গেছেন—"What a dull world this would be if every imaginative maker of legends was stigmatized as liar." হক্ কথা কিনা বলুন।

সেজন্য গুল-গুঞ্জন-গুজব আমাদের আবশ্যকীয় জাতীয় সম্পত্তি। অবহেলা করবেন না। এসব আমি পছন্দ করি না বলে সাধু সাজবার, উন্নাসিক সাজবার কোন প্রয়োজন নেই।

Joseph Corerad বলেছেন—

Gossip is what no one claims to like—but every body enjoys. সুতরাং নাক সিটকোবেন না। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট।

গুল ও গুঞ্জন সর্বদা মিথ্যে থেকে উৎপন্ন হয় এটা সঠিক নয়। কথায় বলে,—"যা রটে তার কিছু তো বটে।" এধরনের অতিরঞ্জিত গুঞ্জনের চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন খলিল জিব্রান। উনি বলেছেন—

An exaggeration is a truth that has lost its temper. চমৎকার সংজ্ঞা নয়?

আগেই উল্লেখ করেছি গুল-গুঞ্জন-গুজব আদিরসাত্মক হলেই বেশী মুখরোচক হয়। কেউ কেউ বলবেন শচীন ভৌমিকটা কি সব গুলতানী করছে। বলবেন,—শচীনের বড় বেশী ব্যাড্ টেস্ট্। বলতে চান বলুন তাতে দমবার পাত্র নই আমি। আর্নল্ড বেনেটের কোটেশনটা অনেক আগেই তাবিজে বেঁধে নিয়েছি। ভয়ের কি আছে? উনি বলেছেন—

Good taste *is* better than bad taste, but bad taste is better than no taste at all.

মানে—নাইরুচির চাইতে কানারুচি ভালো।

আমার এই নিবন্ধ কানা রুচিরই কানামাছি। কানারুচিরই কানন কুসুম। নন্দনকানন বলুন ভালো কথা, মুখ বাঁকিয়ে ক্রন্দন-কানন বললেও আমি রাগ করব না।

আপনারা অনেকেই খবর রাখেন না হয়তো যে বোম্বেতে বিরাট একটা গুজবের ফ্যাক্টরী আছে। জানেন? না তো। জানতাম। হ্যাঁ, মশাই, বিরাট সেই ফ্যাক্টরী। সম্প্রতি আমি সেই কারখানা প্রদর্শন করে এসেছি। এবার আপনাদের আমি সেই প্রদর্শনের ধারাবিবরণী না হোক, সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিচ্ছি।

ফ্যাক্টরীর নাম—হিন্দুস্থান-রিউমার ফ্যাক্টরী।

বোম্বে পুণা হাইওয়েতে আধ মাইল জায়গা জুড়ে ফ্যাক্টরী। ডে নাইট্ কাজ চলছে।

ম্যানেজার বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। বাঙালী। নাম অতিরঞ্জন ঘোষাল।

আমি প্রশ্ন করলাম,—মিঃ ঘোষাল, ফ্যাক্টরী কেমন চলছে?

আর বলবেন না,—অতিবাবু জবাব দিলেন,—দিন রাত কাজ হচ্ছে। এত ডিমাণ্ড যে অর্ডার অনুযায়ী মাল সাপ্লাই দিতে পারছি না।

: মাপ করবেন আমার আনাড়ীর মতো প্রশ্ন শুনে। আমি জানতে চাই আপনারা গুজব কি করে তৈরি করেন?

ম্যানেজার জবাব দিলেন,—দেখুন গুলবচনবাবু, ফরমুলা জানা থাকলে গুজব তৈরি করা কিছু শক্ত নয়। প্রথম র মেটেরিয়েল মানে কাঁচা মাল সংগ্রহ করা হয়। কাঁচা মাল হল 'ফ্যাক্টস্' মানে 'সত্যি ঘটনা'। এবার তার সঙ্গে মেশানো হয় জনতার গুঞ্জন আর 'ফ্যানটাসি' মানে কাল্পনিক অবাস্তব গাঁজা—এইবার মেশিনে সেগুলোর রাসায়নিক মিশ্রণের পর বেরিয়ে আসে সলিড্ গুজব।

প্রস্তুত করতে সময় বেশী লাগে না। তবে কোন 'সত্যটা' গুজবায়িত করা সম্ভব সেই বিচারটা খুব শক্ত কাজ। সেজন্য আমাদের স্পেশালিস্ট রয়েছেন।

আমি প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা ওই যে চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওগুলো কেন?

মিঃ ঘোষাল বললেন,—আমাদের হট্ প্লেট রুমের জন্য ওই চিমনিগুলো রাখা হয়েছে। গুজবের সবচেয়ে বড় কথা সেগুলো প্রপারলি গরম হওয়া চাই। ইংরেজীতে শুনেছেন নিশ্চয়ই—হট্ রিউমার। গুজব গরম হতে হয়, কেকের মতোই। তাতেই তার কাট্‌তি বেশী হয়। শোনেন নি, সেলিং লাইক হট কেক্ বলে একটা কথা আছে? তেম্‌নি কথা আছে—স্প্রেডিং লাইক এ হট্ রিউমার। বুঝেছেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—র মেটেরিয়েল আপনারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন?

—শহরের বার্ বা মদের দোকান থেকে, সেলুন থেকে, মেয়েদের বাথরুম বিশেষত মেয়ে কলেজের বাথরুম, লেডিস ক্লাব ও লেডিস হোস্টেলের বাথরুম, হেয়ার ড্রেসিং করার দোকান, ডাক্তারদের ওয়েটিং রুম। এছাড়া মেয়েদের টেলিফোনের কথাবার্তা ট্যাপ্ করে। শহরের বিভিন্ন পার্টি থেকে, স্টেশনের ওয়েটিং রুম থেকে। এসব জায়গায় আমাদের স্পাই রয়েছে। এছাড়া ঝি-চাকররা অনেক র মেটেরিয়েল দিয়ে থাকে। পার্কে বাচ্চা নিয়ে যে সব আয়ারা বিকেলে হাওয়া খাওয়াতে বেরোয় তারা আমাদের বিরাট সোর্স। গ্রাম্যগুজবের কাঁচা মাল আমরা সাধারণত পুকুর ঘাটেই পেয়ে যাই।

আই সি,—আমি অবাক হয়ে বললাম,—গুজব তৈরি হয়ে গেলে সেগুলোর প্রচার কি করে হয়?

খুব সোজা,—বললেন ঘোষাল মশাই,—ট্যাক্সি ড্রাইভার, ক্লাব ও পার্টি মারফত। বিশেষ করে টেলিফোন মারফত খুব তাড়াতাড়ি

আমরা সেগুলো ছড়িয়ে দিই। গুজবের কাঁচা মাল সংগ্রহে ও প্রচারে দু' ক্ষেত্রেই মহিলারা সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী।

প্রশ্ন করলাম,—কোন জাতীয় গুজবের কাট্‌তি বেশী?

অতিবাবু বললেন,—নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও চলচ্চিত্র জগৎ সংক্রান্ত রিউমারই বেশী চলে।

আমি বললাম,—রাজনীতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান কম। সিনেমা সংক্রান্ত এই কারখানার তৈরি কয়েকটি গুজব শোনান না।

মিঃ ঘোষাল বললেন,—কিছুদিন আগে আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরি দু'টো গুজব খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। একটা হল—ডিম্পল কাপাডিয়া আসলে রাজ কাপুর ও নার্গিসের কন্যা। এটা পিওর গাঁজা। কিন্তু গুজবটার খুব কাট্‌তি হয়েছিল। দ্বিতীয় গুজবটা হল জয়া ভাদুড়ী অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে বিয়ে করবার আগে বিবাহিতা ছিলেন। এটাও ডাহা মিথ্যে। কিন্তু মার্কেটে এ গুজবটাও খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। বললাম,—হ্যাঁ, এ দুটো গুজবের জনপ্রিয়তার কথা জানি।

অতিবাবু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। তারপর গর্বিত কণ্ঠে বললেন,—সাত দিন হল আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট হট্ ফেভরিট্ হয়ে উঠছে। সেটা হল ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। শুনেছেন নাকি?

বললাম,—একবার কানে এসেছিল।

মিঃ ঘোষাল বললেন,—টপ্ সেল চলছে এটার।

আমি প্রশ্ন করলাম,—আপনাদের কোন গুজব ফ্লপ করেছে কি?

দেখুন,—মিঃ ঘোষাল বললেন,—বিজনেসে আপ্ এণ্ড ডাউন্ তো থাকেই। তবে আমাদের রেকর্ড খুব ভালো। আপনাকে লুকোব না সম্প্রতি আমাদের একটা গুজব ফ্লপ করেছে। আমরা ফ্যাক্টরী থেকে একটা গুজব তৈরি করেছিলাম যে সত্যজিৎ রায় অবিলম্বে তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি করছেন। গুজবটা দশ বৎসর ধরে বেশ কাটছিল। কিন্তু গুজবটা সত্যে পরিণত হচ্ছে জানতে

পারলাম। ফলে বাজার থেকে গুজবটা আমাদের তুলে নিতে হল। এতে কিছু লস্ তো হল। তা আর কি করা যাবে বলুন।

বললাম,—শুনেছি সত্যজিৎবাবু সঞ্জীব কুমারকে নিয়ে প্রথম হিন্দী ছবি শুরু করবেন। এটা ঘটনা বলেই তো জানি।

সেজন্যই তো ওঁর সম্পর্কে চালু গুজবটাকে উইথড্র করতে হচ্ছে,—অতি বিরস কণ্ঠে বললেন অতিবাবু। শ্রীঅতিরঞ্জন ঘোষাল।

কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখে শেষ পর্যন্ত আমি বেরিয়ে এলাম। পেছনে পড়ে রইল মিঃ ঘোষাল আর কারখানা বিশাল। ভদ্রলোককে দেখে বুঝলাম 'সেন্স অফ হিউমার' থাকলে যেমন বড় হওয়া যায়, তেম্‌নি সেন্স্ অফ রিউমার থাকলেও বড় হওয়া যায়। কপাল থাকলে রিউমার ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার পর্যন্ত হতে পারেন আপনি।

সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে কোন গুজব এই কারখানায় তৈরি হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করায় উনি বলেছিলেন,—না, মশাই, ঐ বিভাগটা এখনো চালু করা হয় নি। ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এ রয়েছে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—তাহলে বলতে চান রবীন্দ্রনাথের পায়ে গোদ ছিল এটা আপনাদের কারখানার তৈরি নয়?

মোটেই না,—বললেন ঘোষাল।

বলতে চান,—আমি বললাম,—বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যখন দেখা হয়েছিল তখন বঙ্কিমবাবু বিদ্যাসাগরের পুরনো দোমড়ানো হোঁচট-খাওয়া চটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—

বিদ্যার সাগর কেন ঊর্ধ্ব পানে ধায়?

উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,—

চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ হলে বঙ্কিম হয়ে যায়।

এই গুজবটাও আপনাদের কারখানার নয়?

নো, নেভার, নকো,—ইংরেজী থেকে শেষ পর্যন্ত মারাঠী 'নকো' দিয়ে অতিবাবু তার প্রতিবাদ, তার নেতিবাদ জানালেন।

আবার বিষণ্ণ মুখ দেখে দয়া হল অতিরঞ্জন ঘোষালের।

বললেন,—সাহিত্য বিভাগের প্রোডাকশন চালু হলেই আপনার নামে সলিড্ একটা গুজব চালু করব। গুজবটা আমার মাথায় এসে গেছে। শুনুন।

বার্নার্ড শ' বলেছিলেন—There great Indians impressed me the most—Thay are Gandhi, Tagore and Bhaumick.

ভয়ে আনন্দে বললাম,—গ্র্যাণ্ড হবে। দারুণ হবে।

আপনাদের আগে থেকেই অনুরোধ জানাই—বাজারে গুজবটা চালু হলে প্লিজ বিশ্বাস করবেন।

গুজব—কারখানার সমাচারের এইখানেই ইতি।

এ ছাড়া গুলবচনের গাঁজার কলকের আগুনও নিভে আসছে। সুতরাং আমার এই নিবন্ধকে কবন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে।

শেষ করার আগে গুজব সম্পর্কে একটা কৌতুকী শোনাবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। রিউমার সম্পর্কে এর থেকে মজার হিউমার আমি অন্তত শুনি নি। আপনারা শুনে থাকলে দয়া করে জানাবেন।

কৌতুকীটা হল এই।

স্বামী ঘুমিয়ে পড়তেই কালু সিং-এর বৌ ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে এল অভিসারে। তার প্রেমিক মাখন সিং সেখানে অপেক্ষা করছিল। ছাদের দরজা বন্ধ করে কালু সিং-এর বৌ সালোয়ার খুলতে খুলতে লজ্জানম্র কণ্ঠে বলল,—সারা গ্রামের লোকে বলাবলি করছিল।

বেল্ট খুলতে খুলতে মাখন সিং বলল,—কি বলছিল ওরা?

বলছিল,—কাঁচুলী খুলে ছুড়ে ফেলে বলল কালুর বৌ,—বলছিল তোর সঙ্গে নাকি আমার গোপন সম্পর্ক আছে!

সালোয়ারের পাশে প্যাণ্টটা লাথি মেরে রেখে পরম আবেশে মাখন সিং জড়িয়ে ধরল কামজর্জর কালুর বৌকে। তারপর বলল,—গাঁয়ের লোকদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই। শুধু মিথ্যে

যতসব গুজব ছড়ানো। লোকগুলোর সত্যি কোন [illegible] নেই। ঈশ্বর জানেন এদেশের ভবিষ্যৎ কি!

আপনারাই বলুন এর চাইতে কৌতুককর কৌতুকী শুনেছেন গুজব সম্পর্কে?

গুলবচনের গুলতানির এখানেই শেষ। বচন ফকিরের বচনের ভাণ্ডার বাড়ন্ত হয়েছে। সত্যি সত্যি ফকির এখন আমি। এটা কোন ফাঁকির কথা নয়, সত্যি কথা। মূলবচন এটা। গুলবচন নয়!!

উর্দু শের

এক

হর তরফ হা গয়ে পরগামে-মুহব্বৎ বনকর্
মুঝসে আচ্ছি রহি কিসমৎ মেরে অফসানোঁ কি।

—জিগর মুরাদাবাদী

—আমার প্রণয়-কাহিনীর চতুর্দিকে চর্চা হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার নিজের ভাগ্যের চেয়ে আমার প্রেমকাহিনীর ভাগ্য অনেক বেশী ভালো। আমার প্রেমের ব্যর্থতায় কারুর সমবেদনা নেই কিন্তু আমার কাহিনীর ট্র্যাজেডীতে সবাই বেদনামুক্ত!

দুই

হম ইস্ক্ কে মারোঁ কা ইৎনা হী ফসানা হ্যায়
রোনেকি নেহি কোঁই, হঁসনে কো জমানা হ্যায়।

—জিগর মুরাদাবাদী

—প্রত্যেক প্রেমিকের জীবনে একটাই সত্য রয়েছে—প্রেমিকের দুঃখে কাঁদবার কেউ নেই; কিন্তু প্রেমিকের কীর্তিকথায় বিদ্রূপের হাসি হাসতে সারা জগৎ প্রস্তুত হয়ে আছে!

তিন

ইস্‌ক্‌ জিস্‌ কস্‌তীকা হো তু নাখুদা
ওহ্‌ না আয়ে কিস্‌ তরাহ্‌ তুফান মেঁ।

—দাগ

—হে প্রেম, তুমি যে নৌকোর মাঝি সে নৌকো তুফান বাঁচিয়ে কি করে আসতে পারে বলো? প্রেম মানেই তো ঘূর্ণির আবর্ত, ঝড়ের ঠিকানা। প্রেম মানেই তো যন্ত্রণার নিমন্ত্রণ, দুঃখের মোহনা। নয়?

চার

কেয়া বুরী শয় হায় মুহব্বৎ ভি ইলাহী, তওবা
জুর্ম না কর ওহ্‌ খতাবার বনে বৈঠে হায়।

—জহীর

—ভালোবাসা কি অভিশপ্ত বস্তু হে ঈশ্বর তুমি সৃষ্টি করেছো। অন্যায় না করেও সর্বদা অপরাধী সেজে বসে থাকতে হয়। সত্যি ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

পাঁচ

ম্যায় উফ্‌ভি কর্‌তা হুঁ তো হো যাতা হুঁ বদনাম
ওহ্‌ কত্‌ল্‌ ভি করতেঁ হ্যায় তো চর্চা নেহি হোতে ॥০

—অজ্ঞাত

—আমি যদি বেদনার্ত্ত কণ্ঠে উফ্‌ করে উঠি তাহলেই বদনাম হয়ে যাই, আর প্রেয়সী আমার নির্মম নিষ্ঠুরতায় খুন পর্যন্ত করে ফেললেও তার বিন্দুমাত্র চর্চা হয় না! সমাজের কি অভিনব বিচার পদ্ধতি। সব দোষ যেন পতঙ্গের, শিখার কোন দোষই নেই।

ছয়

তকিয়ে পে তেরে জুড়ে কা ভঁমর ঘুম রাহা হ্যায়
চাদরমেঁ তেরে জিস্‌ম্‌ কী ওহ্‌ সোন্ধী সী খুশবু
হাতোঁমেঁ মহকৃতা হ্যায় তেরে চেহেরে কা এহসাস্‌
মাথেপে তেরে হোঠোঁ কে বিশ্বাস্‌ কা তারা
তু ইৎনি করিব হ্যায় তুঝে দেখুঁ তো ক্যায়সে
থোরি সি অলগ্‌ হো তো তেরে চেহেরো কো দেখুঁ।

—গুলজার

—বালিশে তোমার চুলের ঘূর্ণিজাল, চাদরে তোমার শরীরের মদির সুগন্ধ, হাতে আমার তোমার মাদক চেহারার উত্তাপ, কপালে তোমার বিশ্বাসের চুম্বনের শুকতারা। প্রিয়া আমার, তুমি আমার এত কাছে রয়েছো, তোমার সান্নিধ্য এত নিকটে যে তোমার মুখটা প্রাণভরে একবার দেখবো তারও উপায় নেই। সোনা আমার, একটু যদি সরে বসো, তাহলে তোমার মুখটা দেখতে পাই। একটু সরে বসবে? তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখতাম।

সাত

মুঝকো তো হোশ নেহি তুমকো খবর হো শায়দ
লোগ কহতে হ্যায় কি তুমনে মুঝে বরবাদ কিয়া।

—জোশ মলীহাবাদী

—আমার তো কোন হুঁশ নেই, হয়তো তুমি খবরটা শুনে থাকবে—লোকে বলাবলি করছে তুমিই আমার সর্বনাশ করেছো, সর্বস্বান্ত করেছো।

আট

প্যায়ার করনে কা যে খুবাঁ রখতে হ্যায় হাঁম পর গুনাহ্
উনসে ভি তো পুছিয়ে, তুম ইৎনে পেয়ারে কিঁউ হুয়ে।

—মীর

—আমি যে এত বেশী ভালোবেসে ফেলেছি বলে আমাকে তোমরা পাপী, অপরাধী ভাবছো, একবার ওকে তো জিজ্ঞেস করে দেখো, হে নারী, তুমি এত রূপসী, এত সুন্দরী, এত লাবণ্যময়ী কেন হয়েছো? এক অঙ্গে এত রূপ এটা কি অপরাধ নয়? অপরাধ শুধু সে রূপের পূজারীর? রূপের নয়?

নয়

নজর সে উনকি পহলী হী নজর ইউঁ মিল গই অপ্‌নি
কি যৈসে মুদ্দতোঁ সে থি কিসি সে দোস্তি অপ্‌নি।

—জিগর মুরাদাবাদী

—প্রেয়সীর সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েই মনে হল যেন বহুদিনের পুরনো বন্ধু দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার মিলিত হল। এ যেন নতুন পরিচয় নয়, পুনর্মিলন মাত্র।

দশ

ম্যায় যাতা হুঁ দিল কো তেরে পাস ছোড়ে
মেরী ইয়াদ তুমকো দিলাতা রহেগা।

—দর্দ

—এবার তাহলে যাই। যাবার আগে তোমার কাছে আমার হৃদয়টাকে রেখে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে সে তোমাকে আমার কথা মনে করিয়া দেবে।

এগারো

আও তুমকো উঠালুঁ কন্ধে পর
তুম উচক কর শরীর হোঁঠোঁ সে
চুম লেনা এ চাঁদ কা মাথা
আজ কি রাত দেখা না তুমনে
কৈসে ঝুক ঝুক কে কোহনিয়োঁ কা বল্‌
চাঁদ ইৎনে করীব আয়া হ্যায়।

—গুলজার

—এসো প্রিয়া, আজ তোমাকে কাঁধে তুলে নিই, তুমি মুখটা তুলে তোমার দুষ্টু ঠোঁট দিয়ে চাঁদের মাথায় চমু খেয়ে নাও। আজ রাত্তিরে চাঁদটাকে দেখো, কনুইর ওপর ভর দিয়ে চাঁদটা আমাদের কত কাছে চলে এসেছে। এত কাছে যে তুমি উঁচু হয়ে মুখ বাড়ালেই তার ঠাণ্ডা কপালে ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দিতে পারো। এসো প্রিয়া, এসো তোমাকে তুলে ধরি।

কন্ধে ঝুক যাতে হ্যায় সব বোঝসে ইস লম্বে সফরকে
হাঁপ যাতা হুঁ ম্যায় যব চড়তে হুয়ে তেজ চট্টানে
সাঁসে রহ্‌ যাতী হ্যায় যব সিনেমে ইক্‌ গুচ্ছা-সা হোকর
ঔর লাগ্‌তা হ্যায় কি দম টুট হী যায়েগা এঁহি পর

এক নন্হী সী মেরি নজ্‌ম্‌ মেরে সামনে আকর
মুঝসে কহ্‌তী হ্যায় মেরা হাত পাকড়কর, মেরে শায়র
লা, মেরে কন্ধে পে রখ দে, ম্যায় তেরা বোঝ উঠালুঁ।"

—গুলজার

—দীর্ঘ পথ চলতে চলতে যখন আমার কাঁধ ঝুঁকে আসে, চড়াই-র উচ্চতায় যখন হাঁপিয়ে উঠি, যখন নিঃশ্বাস বুকের একপাশে জড়ো হয়ে ফুলে ওঠে আর মনে হয়, আমার চলবার শক্তি নেই, এখানেই থেমে যেতে হবে আমার,—তখন আমারই লেখা ছোট্ট একটা কবিতা আমার সামনে এসে বলে,—হে কবি, হে আমার স্রষ্টা, এসো, আমার কাঁধে হাত রাখো, এসো, আমি তোমার সমস্ত বোঝা তুলে নিই।

তেরো

দিল হী কি বদৌলত রঞ্জ ভী হ্যায়, দিল হী কি বদৌলত
রাহত ভী
এহ্ দুনিয়া যিস্‌কো কহতে হ্যায়, দোজখ্ ভী হ্যায় ঔর
জন্নৎ ভী।

—চকবস্ত্ লক্ষ্ণৌবী

—হৃদয়ের জন্য বেদনা রয়েছে, হৃদয়ের জন্য আনন্দও। এই যে পৃথিবী, এখানেই নরক রয়েছে, এখানেই স্বর্গ। সফল প্রেমই স্বর্গ, বিফল প্রেমই নরক।

চৌদ্দ

দিলমে অব্ ইউঁ তেরে ভুলে হুয়ে গম ইয়াদ আতে হ্যাঁয়
য্যয়সে বিছুড়ে হুয়ে কাবেমে সনম ইয়াদ আতে হ্যাঁয়।

—ফৈজ আহম্মদ ফৈজ

—হৃদয়ে তোমার বেদনাময় স্মৃতি মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়। যেন ভুলে যাওয়া কোন মন্দিরে পুরনো প্রেমের, অতীতের কোন আপনজনের কথা মনে পড়ে যায়। হৃদয় তো মন্দিরের মতোই, প্রেম তো পূজা, স্মৃতি তো পুণ্যময়তা।

পনেরো

আদম কা জিস্‌ম্‌ যব্‌ কি অনাসর সে মিল বনা
কুছ আগ্‌ বাচ্‌ রহী থী সো আশিককা দিল বনা।

—সৌদা

—মানুষের শরীর ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন পঞ্চভূত দিয়ে। কিন্তু খানিকটা আগুন তার থেকে বেঁচে গিয়েছিল। সে আগুনটা কোথায় গেল? সেই আগুনটা দিয়েই তৈরি হয়েছে প্রেমিকের হৃদয়। সেজন্যেই প্রেমিকের হৃদয়ে সর্বদা ধিকিধিকি আগুন জ্বলে।

ষোল

দিলে বরবাদ কী ভী কহনেওয়ালে দিল হী কহতে হ্যায়
খিজাঁ-দীদা চমন কী ভী চমন কহনা হী পড়তা হ্যায়।

—নজম নদভী

—যে হৃদয় থেকে প্রেম বিদায় নিয়েছে, যে হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে, সে হৃদয়কেও হৃদয়ই বলতে হয়! যেন যে বাগান শুকিয়ে গেছে, তৃণপত্রপুষ্পহীন হয়ে পড়ে রয়েছে তাকেও 'বাগান'ই বলতে হবে। প্রেমহীন হৃদয় কি হৃদয় পদবাচ্য? মরুভূমিকে কি নন্দনকানন বলা উচিত?

সতেরো

দেখো আহিস্তা চলো, ঔর ভী আহিস্তা জরা
দেখ্‌না সোচ্‌ সমঝকর্‌ জরা পাঁও রাখ্‌না
জোর সে বজ্‌ না উঠে পয়রোঁ কি আওয়াজ কঁহী
কাঁচ কে খাব হ্যায় বিখরে হুয়ে তনহাই মেঁ
খাব টুটে না কোই, জাগ না যায়ে দেখো
জাগ জায়েগা কোই খাব তো মর যায়েগা।

—গুলজার

—দেখো, ধীরে চলো, আরও আস্তে। দেখো, ভেবে চিন্তে পা ফেলবে। লক্ষ্য রেখো, কোথাও জোরে যেন পায়ের শব্দ বেজে না ওঠে। এ নির্জনতায় কাঁচের তৈরি সব স্বপ্নরা ঘুমিয়ে আছে। দেখো, তোমার পায়ের শব্দে না ভেঙে যায় কোন স্বপ্ন, যেন জেগে না ওঠে। মনে রেখো, যে স্বপ্ন জেগে উঠবে সে তক্ষুনি মরে যাবে। ঘুমুতে দাও ওদের, জাগিও না। নিদ্রার জগতেই ওদের বিচরণ, নিদ্রাই ওদের জীবন আর জাগরণই ওদের মৃত্যু। তাই বলছি, ধীরে চলো, খুব ধীরে।

আঠারো

দেখো জওয়ানীকা উভার।
য্যায়সা নদীকা মৌজ, য্যায়সা তুর্কী কা ফৌজ,
য্যায়সা শুলগ্‌তে বম্‌, য্যায়সা বালক উধম্‌।
য্যায়সা স্বপ্নোকা গাগর, য্যায়সা রূপকা সাগর।
য্যায়সা চন্দনকা মুরথ্‌, য্যায়সা যৌবনকা তীরথ্‌।
দেখো জওয়ানীকা উভার।

—নেপালী

—নারী দেহবল্লরীতে উরজের উল্লাস দেখো। দেখো স্তনের অপরূপ শোভা। নারীর স্তন যেন নদীর ঢেউ, যেন তুর্কীর গর্বিত সৈন্যবাহিনী, যেন বিস্ফোরণপূর্বের বোমা, যেন একটি উল্লসিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বালক, যেন স্বপ্নসলিলে ভরা একটি কলস, যেন রূপলাবণ্যের এক সমুদ্র, যেন চন্দননির্মিত এক মূর্তি, যেন যৌবনের এক তীর্থক্ষেত্র।

উনিশ

কিসিনে মোল না পুছা দিলে সিকস্তা কা
কোই খরিদ কে টুটা পেয়ালা ক্যা করতা।

—আতিশ

—আমার ভাঙা হৃদয়ের কত দাম কেউই জিজ্ঞেস করল না। কেন করবে? ভাঙা পেয়ালা কে কিনতে যাবে? কি কাজে আসবে?

[illegible]

সকুনে-দিল জহানে বেশী-কম্ মগর ঢুঁড়কে দেখা
ইহাঁ হর চীজ মিল্ সক্তি হ্যায়, সকুনে দিল নহী মিলতা।

—জগন্নাথ আজাদ

—বেশী হোক কম হোক, হৃদয়ের শান্তি আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাই নি। সবাইকে তাই জানিয়ে দিতে চাই,—পৃথিবীতে সব পাওয়া যায় কিন্তু হৃদয়ের শান্তি কোথাও পাওয়া যায় না। সারা জীবন খুঁজে যাবেন কিন্তু কোনদিন তার নাগাল পাবেন না।

[illegible]

দুশমনি জমকর্ করো, এ গুঞ্জাইশ রহে
যব্ কভি হাম্ দোস্ত হো যায়েঁ তো শরমিন্দা না হো।

—অজ্ঞাত

—শত্রুতা করবার সময় হে বন্ধু একটু ভেবেচিন্তে করো। দেখো, এত নিষ্ঠুর ভয়ংকর শত্রুতা করো না যে পরে যদি আমরা আবার বন্ধু হয়ে যাই তখন লজ্জিত হতে হয়। তোমার শত্রুতার মধ্যে একটু ফাঁক রেখো, সুযোগ রেখো বন্ধু। যতির পর পুরনোবন্ধুত্ব ফিরে পেলে লজ্জা নেই, কিন্তু শত্রুতার চরমে যদি আজ বন্ধুত্ব ছিন্ন করে ফেল, পুনর্মিলনের সময় লজ্জায় মুখ তোলা যাবে কি করে? সুতরাং হে বন্ধু, শত্রুতা করবার সময় সম্পর্কে ফাঁক রেখো, ছিন্ন করে ফেলো না।

বাইশ

ম্যায় আপনে ঘর মেঁ হী আজনবী হো গয়া হুঁ আকর
মুঝে য়ুঁহী দেখকর ; মেরি রূহ ডর গয়ি হ্যায়
সহম্‌কে সব আরজুঁও কোণে মেঁ যা ছুপী হ্যায়
লবেঁ বুঝা দি আপনে চেহেরেঁ। কী হসরতোঁনে
কি সৌক পহচানতা নহী হ্যায়
মুরাদেঁ দহলীজ হী পে সর্ রখ কে মর্ গঈ হ্যায়

ম্যায় কিস্ বর্তন্ কী তলাশ মে ইউ চলা থা ঘর সে
কি আপ্‌নে ঘর মেঁ ভী আজনবী হো গয়া হুঁ আকর্।

—গুলজার

—নিজের ঘরে এসে দেখছি আমি নিজের ঘরেই পর হয়ে গেছি। অপরিচিত হয়ে গেছি। আমাকে দেখে আমার আত্মা ভয় পেয়ে গেছে, আমার ইচ্ছাগুলো ভয়ে কোণে গিয়ে লুকিয়েছে, আমার আশা মুখ বন্ধ করে মৌন হয়ে রয়েছে, আমার সখগুলো আমাকে চিনতেই পারছে না আর আমার আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নেরা ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে মরে পড়ে রয়েছে।

এ আমি কোন দেশের তালাশে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম যে নিজের ঘরে ফিরে এসে আমি এখন অপরিচিত, এমন পর হয়ে গেলাম ?

তেইশ

আচ্ছা হ্যায় দিলকে পাস রহে পাসবানে-অক্ল্
লেকিন কভি কভি ইসে তনহা ভী ছোড়িয়ে।

—ইকবাল

—হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির বাস সেটা ভালো কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে হৃদয়ের ওপর থেকে বুদ্ধির শাসন তুলে দিতে হয়, হৃদয়কে স্বাধীন করে দিতে হয়, মুক্ত করে দিতে হয়। স্বাধীন মুক্ত হৃদয়ের ধর্মকে সবসময়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে নেই।

চব্বিশ

জিনে না দেঙ্গী আর্থ তেরী দিলরুবা মুঝে
ইন খিড়কিয়োঁ সে ঝাঁক রহী কজা মুঝে।

—শম্স লক্ষ্ণৌবা

—তোমার এই দু'নয়ন আমাকে বাঁচতে দেবে না। তুমি যখন তাকাও তখন তোমার ঐ দু'চোখের জানালার ভেতর থেকে আমি মৃত্যুকে উঁকি মারতে দেখেছি।

হে প্রেয়সী, তোমার চোখেই আমি দেখেছি আমার সর্বনাশ।

পঁচিশ

টুটতে হ্যায় রাত ভর তারে, এ রুআবে-হুস্ন হ্যায়
বেখবর ইউ আপ কোঠে পর না সোয়া কিজিয়ে।

—নাসরী

—হে অনন্যা রূপকন্যা তিলোত্তমা প্রেয়সী আমার, তুমি খোলা ছাদে এভাবে আর শুতে যেও না। তুমি টের পাও নি, তুমি তো নিদ্রার কোলে সুপ্ত ছিলে কিন্তু তোমার রূপের আগুনে পাগল হয়ে সারা রাত কত তারা যে তোমার কাছে আসতে গিয়ে কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে ছুটে আকাশ থেকে খসে গিয়ে ভস্ম হয়ে গেছে। সে খবর তুমি জানো কি? না, তুমি জানো না।

ছাব্বিশ

রেঁায়ে না অভী অহলে-নজর্ হাল পে মেরে
হোনা আভি মুঝকো খারাব্ ঔর জিয়াদা।

—মজাজ

—আমার বিফল প্রেমের দুর্দশা দেখে এখনই কাঁদবেন না। বন্ধুগণ, আমার সর্বনাশ হবার আরও অনেক বাকি। দুঃখের এই তো শুরু। আমার অধঃপতনের সীমা আরওঅনেক নিচে। আরও খারাপ হবার বাকি আছে, আরও তলিয়ে যেতে হবে আমাকে অনেক গভীরে।

সাতাশ

আবকে বিছড়ে তো হাম খোয়াবোঁমে মিলে
জিসতরা শুখি হুই ফুল কিতাবোঁমে মিলে।

—ফৈজ

—বিচ্ছেদের পর আমাদের দু'জনের মিলন কোথায় হবে? কোথায় তোমায় পাবো? জানি, পাবো শুধু স্মৃতিবনের আকাশে। যেমন পুজোর পবিত্র শুকনো ফুল অনেকদিন পর মানুষ হঠাৎ খুঁজে পায় বইয়ের পাতার ভাঁজে। তোমার পবিত্র সুখস্মৃতির ফুল তেমনি হঠাৎ খুঁজে পাবো আমার মনোময়ের পাতার ভাঁজে। কালগ্রাসে বিবর্ণ, শুষ্ক। কিন্তু পবিত্র, সংরক্ষিত।

আটাশ

হর মুসিবৎকো দিয়া এক তবস্সুমসে জবাব
ইস্তরাহ গর্দিশে দৌড়োঁকো রুলায়া হামনে।

—অজ্ঞাত

—দুর্দিন-কে আমি খুব কাঁদিয়েছি। দুঃসময় ভেবেছিলো সে আমাকে কাঁদাবে। ভেঙে ফেলবে। কিন্তু পারে নি। বিপদের প্রতিটি আঘাতের জবাব আমি দিয়েছি হাসিমুখে। আমার সে স্মিতহাস্যের ফুলের কাছে হেরে গেছে দুঃসময়ে ভ্রূকুটি।

উনত্রিশ

টুক্‌রে টুক্‌রে দিন বিতা, ধজ্জি ধজ্জি রাত মিলি
যিস্‌কা যিৎনা আঁচল থা, উৎনি হি সওগাৎ মিলি।
যব্‌ চাহা দিল্‌কো সমঝে হাস্‌নেকা আওয়াজ শুনি
যয়সে কোই কহতা ওহ্‌ লে ফির তুঝকো মওৎ মিলি।
মওৎ কেয়সি, ঘাতে কেয়া, চলতে রহনা আট পহর—
দিল্‌সা সাথী যব্‌ পায়া বেচৈনি ভি সাথ মিলি।

—মীনাকুমারী

—কঠিন যাতনাময় ছিন্নভিন্ন দিন, বিনিদ্র ভগ্নাংশ রাত, এই আমি পেয়েছি। জীবন এই রকমই। যার আঁচল যতটুকুই ততটুকুই ভাগ্যদেবী তাকে দিয়ে থাকেন। হৃদয়কে যতবার বোঝবার চেষ্টা করেছি ততবারই শুনেছি কেউ যেন হেসে উঠেছে আর বলছে,—হৃদয় বুঝে তুই কি করবি? নে, তোকে মৃত্যু দিলাম, এটা বুঝে নাও। মৃত্যু? মৃত্যু কি সেটাও কি ছাই আমি বুঝতে পেরেছি? না। মৃত্যু কি তাও বুঝলাম না। শুধু জানি আট প্রহর ধিকি ধিকি জ্বলে যেতে হবে। হৃদয়ের মতো সঙ্গী যখন জুটে গেছে জানি হৃদয়যন্ত্রণার হাত থেকেও নিষ্কৃতি নেই আমার। হৃদয় মানেই হৃদয়যন্ত্রণা, এটুকু জানি। এর চেয়ে বেশী আর আমি জীবন, হৃদয়, মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই না। কিছুই না।

ত্রিশ

শমা হুঁ, ফুল হুঁ ইয়া কদ্‌মো কা নিশা হুঁ
আপ্‌কো হক্‌ হ্যায় মুঝে যো ভী চাহে কহ্‌নে।

—মীনাকুমারী

—আপনার প্রেমে আমি আত্মদান করেছি, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি। এখন আপনি আমাকে প্রেমের প্রদীপ, পুজোর ফুল বা পায়ের দাগ যা ইচ্ছে বলতে চান বলতে পারেন। আপনার সে অধিকার রয়েছে। আপনার শ্রদ্ধা, আপনার প্রেম, আপনার ধিক্কার সব কিছুই শিরোধার্য। সব কিছুই আমার গ্রহণীয়, সব কিছুই আমার পরম প্রাপ্য।

একত্রিশ

ফকির হো কে ভী শাহী কা খু নহীঁ যাতি
জমিপে গিরনেসে ফুলোঁকা বু নহীঁ যাতি।

—অজ্ঞাত

—সর্বহারা, দরিদ্র হয়েও আমি আমার আভিজাত্যের অভ্যেস পরিত্যাগ করতে পারছি না। পারা যায় না। কিছুতেই না।

গাছ থেকে মাটিতে ঝরে পড়লেও ফুল কি তার সুগন্ধ হারিয়ে ফেলে? বৃন্তচ্যুত হলেই কি গন্ধরাজ কোন ফুল সৌরভহীন হয়ে যায়?

না, যায় না। যেতে পারে না।

ট্রামটা নিশ্চিন্ত ছিল সিগন্যালের রক্তচক্ষু জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠার আগেই ক্রসিংটা পেরিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ সবুজ আলো জ্বালে রুদ্ধশ্বাস। রক্তিম সংকেত। আর তক্ষুণি জোর ব্রেক কষতে হল ড্রাইভারকে। বিপত্তি ঘটল তাতেই। বনশ্রীর দোষ কি, ও তো সিটে বসতেই পেরেছে, ও শুধু ঝাঁকুনিটা সামলে নিল সামনের বেঞ্চিটা ধরে। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাশের দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি। ছেলেটিকে অবিশ্যি এতক্ষণ খেয়াল করে নি ও, অন্যমনস্ক চোখে নারীসুলভ নিস্পৃহতার নির্মোকে ও যথারীতি চোখ ডুবিয়ে রেখেছিল ট্রামের বাইরে, চৌরঙ্গীর ঘাসে। সম্মিলিত আর্ত, আর বাল্‌ব ফাটার আওয়াজে এবার ওকে চোখ ফেরাতে হল। কয়েকটি ফ্লাশ বাল্‌ব ভেঙে চূর্ণ, অন্য হাতের একটা ফাইল খুলে গিয়ে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রখান। এরপর আর চুপ করে থাকা চলে না। কাগজপত্রের টুকিটাকি কিছু পড়েছে ওর কোলে, শাড়ির ভাঁজে পায়ের কাছে মেঝেতে, পাশের বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলাটির গায়ে। অগত্যা সহানুভূতির রোদ্দুরে মুখ ঢেকে কাগজপত্রগুলো কুড়িয়ে তুলতে থাকে বনশ্রী। নানারকম চিঠি, ছাপা ফর্ম, গুটিকয় ফটো, রং-বেরং-এর চালান, রসিদ, আরো কতো কি। হঠাৎ চমকে উঠল বনশ্রী। পায়ের কাছে পড়েছিল ওটা, একখানা ফটো। ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বনশ্রীর, হাত নড়তে চায় না, একটা দুর্বোধ্য হিমশীতল স্রোত বয়ে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে। পুরনো দিনের ইতিহাস বুঝি আতঙ্কের কুমীরের মতো পিঠ ভাসালো আচমকা। সেই ফটো। ছবিটা হাতে নিয়ে চোখ

তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। পুরু লেন্সের ওপাশে এক জোড়া প্রশ্নিল চোখে বিদ্যুৎ। নিজেকে জোর করে সংযত করে রাখলো বনশ্রী। তবু কি হাত কাঁপে নি? তবু কি ঠোঁটের বিশুষ্কতায় শীত নামে নি? কাঁপা হাতেই ফটোটা এগিয়ে দিল বনশ্রী। আর মল্লার মুখার্জি হাত না বাড়িয়ে শুধু চাপা কণ্ঠে বলল,—কে জাপানী না?

ট্রামের কৌতূহলী চোখগুলোতে উৎসাহের আলো। যেন দর্শনীয় নাটকের সর্বশেষ অঙ্ক দেখছে তারা। ডাকনামটার অভিনবত্বে ওদের রোমাঞ্চিত করে।

মুহূর্তে বুঝতে পারে মল্লার। পরিবেশটা অপ্রীতিকর। তবু চোখ রাখে ও বনশ্রীর ঠোঁটে। যে ঠোঁটে এইমাত্র খানিকটা হাসির কঙ্কাল আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি জানাল। শুধু নিভু নিভু কণ্ঠে বলল ও,—চিনতে পেরেছো মল্লিদা।

ছবিটা এবার হাতে তুলে নেয় মল্লার। তারপর কিছু বলবার আগেই উঠে দাঁড়ায় বনশ্রী,—আমার স্টপেজ এসে গেছে, এসো না মল্লিদা, নামবে এসো।

—চলো,—একরাশ ঈর্ষাকাতর চোখের বল্লম পেরিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল ওরা। তন্বী, সহ্যাতিরিক্ত রূপসী বনশ্রীর পেছু পেছু হতদরিদ্র মলিনবেশ মল্লার। একজোড়া অসঙ্গতি যেন নেমে গেল ট্রাম থেকে। পাশাপাশি একজোড়া প্রলাপ।

মফঃস্বল শহর থেকে কোলকাতা কলেজে পড়বার জন্যে রওনা হবার সময় মা চিঠিটা লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিদিবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্লিডার, আঠারো'র এক মতিমহল রোড, কলিকাতা। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে যেদিন জবুথবু সতেরো বছরের লাজুক ছেলে মল্লার এসে মা'র চিঠি ত্রিদিববাবুর হাতে দিলে তিনি বললেন,—আরে আরে তুমি শশাঙ্কর ছেলে, তাই বলো। উঃ, বুঝলে বাপু, আমি আর শশাঙ্ক শুধু সামান্য দুটি কাপড়-জামা ভরতি টিনের ভাঙা স্যুটকেস নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম সেই বর্মা। অর্থ নেই, ভবিষ্যের

লোকলস্কর কিছু নেই, শুধু যা থাকে কপালে বলে হাজির হয়েছিলাম বিভুঁইয়ে। তা দেখলে তো, ঠকতে হলো না আমাদের। আরে আসল জিনিস হচ্ছে উদ্ভম, বুঝলে, উদ্ভমের,—আঃ, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন, বসো না বাপু। তুমি শশাঙ্কর ছেলে, তা তোমাকেও আবার ভদ্রতা করতে হবে নাকি। হ্যারে নেলো, যা যা তোর গিন্নিমাকে খবর দে, গিয়ে বল, গ্রামের শশাঙ্ক চাটুয্যের ছেলে এসেছে, আমাদের মল্লি। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আঃ বড় ভালো লোক ছিলেন তোমার বাবা। কিন্তু ভালো লোকদের ওপর ভগবানের যতো নেকনজর। অকালে মারা গেল শশাঙ্ক।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে ত্রিদিববাবুর,—আর তোমার মার চিঠিতে জানলাম কাকা তোমাকে ভিন্ন করে দিয়ে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছে। এই হয়, বুঝলে, এই কাকাকেই টাকা পাঠাতে একদিনও দেরি করত না শশাঙ্ক, একবার তো, জানলে—

—কি .একটানা বকবক করে চলেছো। ছেলেটাকে একটু সুস্থির হয়ে বসতে দিলে না তুমি,—গাঙ্গুলী-গিন্নি ঘরে ঢুকলেন পর্দা ঠেলে। মার তালিম দেয়া ছিল, তাই দেরি করলে না। উঠে টিপ করে একটা প্রণাম করলে ও।

—থাক বাবা, সুখে থাকো, বাপের নাম রাখো,—আশীর্বাদে গদ্‌গদ হয়ে ওঠেন তিনি।

—কিন্তু,—ত্রিদিববাবু জানতে চান,—তা তোমার জিনিসপত্র সব কই, সঙ্গে আনে নি?

—জিনিসপত্র তুলেছি গ্রামের এক চেনা লোকের মেসে। শেয়ালদার কাছে। জবাব দেয় মল্লার।

—মেসে? হতভাগা ছেলে—সেগুলো সঙ্গে করে সরাসরি এখানে এলে হোত না, না?

—এখানে? এখানে কি হবে?—গদ্‌গদ গিন্নি-কণ্ঠ এবারে সন্দেহসঙ্কুল।

—কি আর হবে। থাকবে। শশাঙ্কর ছেলে আমরা থাকতে

থাকবে কি মেসে-বোর্ডিং-এ? বলি এখনো ত্রিদিব গাঙ্গুলী তো মরে যায় নি।—যাও ছেলে, এক্ষুণি, সব নিয়ে চলে এসো তুমি, এখানে থেকেই কলেজ করবে। হ্যাঁ, গিন্নি, মান্তি পানুদের পড়ার ঘরটা খালি করে দাও গে এখুনি, ও ঘরেই থাকবে মল্লি। আর মান্তি-পানু এখন পড়বে আমার এই বৈঠকখানায় বসে। ও মল্লি, গেলে না এখনো, ভ্যাবো হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে তো দাঁড়িয়েই—

এরপর আর দাঁড়ায় নি মল্লার। সেই ও বহাল হয়ে গেল এই বাড়িতে।

বনশ্রীকে ও দেখলো আরো অনেক পরে। সন্ধ্যারও পর। বিরসমুখ গিন্নির তদারকির পর তখন ও মোটামুটি নিজের ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছে। তারপর গামছা কাঁধে নিয়ে হাত মুখ ধুতে ও এসে দাঁড়ালো বাথরুমের দরজায়। দরজা বন্ধ। খুট করে দরজা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মেয়েলি কণ্ঠে বেজে উঠল,—জানো মা, আজ বাসন্তী বলছিল—বলতে গিয়েই সামনে অপরিচিত মানুষ দেখে চমকে থেমে গেল বনশ্রী। সোপকেসসুদ্ধ হাতটা কেঁপে গেল, আর সাবানটা নড়ে উঠল কেসের ভেতর। চুড়ি বেজে উঠল ঠুনঠুন, আর সম্ভস্নাত ভেজা আঁখিপল্লব চড়ুই ছানার ডানা ঝাপটানোর মতো থরথরিয়ে উঠল কয়েকবার।

কয়েকটি নিশ্চল মুহূর্ত। তারপর দ্রুত চলে গেল ও। অনেক পরে সচেতন হয়ে উঠল মল্লার। চোখের সামনে দিয়ে যেন ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি বসে-থাকা একটা সূর্যমুখী হেঁটে চলে গেল। ফুল-ফুল শাড়িটা যতো সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর ঘাস রঙের টাইট-হাতা ব্লাউজটা, ব্লাউজটা যতো সুন্দর, তার চেয়েও আরো সুন্দর আলতা দুধ-রঙা কমনীয় মুখটা। আর মনে হল, মেয়েটি যত সুন্দর তার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দর ওর হাওয়ায় ফেলে-যাওয়া রোমাঞ্চ-মদির গন্ধ। সুগন্ধি তেল, সুবাসিত সাবান, আর আনকোরা নতুন একটি মেয়েলি দেহ—না-পারা ভালো লাগার সৌগন্ধে যেন নেশা লাগল মল্লারের।

যখন খেয়াল হল তখন ও নিজের ঘরে আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারে বসে। কাঁধের শুকনো গামছাটা শুকনোই।

বনশ্রীকে সেই ওর প্রথম দেখা।

দেখা তো এরপর অনেক হল। কিন্তু—

ভাব হল না বনশ্রীর সঙ্গে। আলাপ হল, অন্তরঙ্গতা হল না। ভালো লাগলো, কিন্তু সমান্তরাল স্বীকৃতি জুটল না বনশ্রীর তরফ থেকে।

—আরে, এই মল্লি, তুই জাপানীকে দেখলে অমন কাঁচুমাচু হয়ে যাস কেন। আরে তুই তো ওর ছোটবেলার বন্ধু ছিলি। আর জাপানী, তুমি ওকে দাদা ডাকবে, বুঝলে। ও হয়েছিল পোষে, আর তুমি, বোশেখ না জষ্টি—যেন, বোশেখ, না না, হ্যাঁগা, আমাদের জাপানী কি মাসে হয়েছিল? বোশেখ না? হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক ধরেছি। যাক তুই ওকে দাদা ডাকবি, তিন মাসের বড়ো কম নয় বাপু। মনে থাকে যেন। যাও মল্লি, তোমার ক্লাসের আবার দেরি হয়ে না যায়। হ্যাঁগা, আমার ইয়ে, কি বলে, চশমার খাপটা গেল কোথায়?—

—ওই যে বাবা,—বনশ্রী এগিয়ে আসে,—তোমার বাঁ হাতেই তো ধরা রয়েছে খাপটা। হেসে ফেলে ও,—বাবার যা কাণ্ড।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না, ভাখো কি ভুলো মন, মাঃ, বকে বকে স্মৃতিশক্তিটা একেবারে গেছে। অথচ জানিস, একবার, তখন আমরা কলেজের ছাত্র, আমাদের প্রিন্সিপাল ছিল মেজারেও কার্ডসন। উনি একদিন টপ করে আমাকে প্রশ্ন করলেন—

কি প্রশ্ন করলেন এবং আশ্চর্য স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ত্রিদিববাবু তা কি জবাব দিয়েছিলেন শুনতে গেলে পার্সেন্টেজ থাকে না, তাই আর দেরি করে নি মল্লার। বেরিয়ে পড়ল কলেজের পথে।

সেই থেকে দাদা ডাকার স্বত্ব পেল। কিন্তু ও যেন লোকাচারের 'দাদা' উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও [illegible]। অর্থাৎ বনশ্রী

তাকে কখনোই দাদা ডাকত না, দাদা কেন, আদপেই সে ডাকত না মল্লারকে।

কিন্তু চাঁদ না ভালোবাসুক, চাঁদকে ভালোবাসতে মানা নেই। বনশ্রীর আশ্চর্য রূপে যেন নেশা ধরে যায় মল্লারের। ওর উপেক্ষা, ত্রিদিববাবুর স্ত্রীর নিদারুণ অবজ্ঞা কোন কিছুতেই মল্লারের বাধে না। ও যেন অভিমন্যু, সপ্তরথীর ভয়ে যাঁর ব্যূহ প্রবেশে এতটুকু ভয় নেই।

বনশ্রীর প্রতিটি গতি, প্রতিটি ভঙ্গী দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে। ও ঠিক বলে দিতে পারে বনশ্রী সোমবার কোন্ শাড়ি পরে কলেজে যাবে, কোন্ চটি পায়ে দেবে শনিবার। এমন কি, রোববার দিন ওর গালে কবার পাউডার পাফ বোলাবে তাও মল্লারের নখাগ্রে।

একবার কলেজ থেকে ফিরে এসে বনশ্রী সবে ঘরে ঢুকেছে, সেই সময় ডিকসেনারিটা চাইতেই আসছিল মল্লার। কিন্তু কে জানে কেন হঠাৎ সে সময় ঘরে ঢুকতেই পারল না মল্লার, চলে যেতেও পারল না। লোভী চোখের বল্লম ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো। কিন্তু পায়ে কিসের সুড়সুড়ি লাগতেই চটিটা জোর ঘষে গেল মেঝেতে, আব কে?—বলে তক্ষুণি দরজায় এসে দাঁড়ালো বনশ্রী। ধনুকের মতো ভ্রূ দুটো ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল একবার, আর চাপা কণ্ঠে শুধু দুটো কথা উচ্চারণ করল ও, যা তরল আগুনের মতো মল্লারের কানকে জ্বালিয়ে দিল।

—আপনি? ছিঃ,—বলেই ঘরে ঢুকে নাকের ওপর দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল বনশ্রী। আর বন্ধ দরজার ওপাশে আঠারো বছরের একটা ব্যর্থ প্রেম অসহায় লজ্জায় স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চিরদিনের ভালো ছেলে মল্লার মুখার্জি ইন্টারমিডিয়েট পাস করলে সেকেণ্ড ডিভিসনে। তাতে আরো ক্ষেপে গেল সে। ভালো রেজাল্ট আর বনশ্রী একটা তার চাইই। যেদিন রেজাল্ট বেরুল সেদিন রাত্রেই ফুলস্কেপ কাগজের চার পাতা ভর্তি এক চিঠি লিখল

বনশ্রীকে। যার আরম্ভ—"প্রিয় জাপানী, তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব। তোমাকে আমার সমস্ত মন সঁপে দিয়েছি অনেক দিন। আমার দিনরাতের একমাত্র চিন্তা তুমি। আমার হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বরী লক্ষ্মী জাপানী, আমাকে তুমি দয়া করো, তুমি সাড়া দাও, তুমি আমাকে গ্রহণ করো।"

সাড়া দিয়েছিল বনশ্রী। শুধু সাড়া? নাড়াই দিয়েছিল ও। দু'চোখে তীব্র আগুন জ্বালিয়ে বলেছিল,—শুনুন, আপনি এত নীচ, এত ইতর জানতাম না। আপনি আজই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। নইলে আমি এই চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ে চাকর দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেবো আপনাকে।

বহুদিন পর প্রেম ভালোবাসা সব ছাড়িয়ে মা'র বিষণ্ণ মুখটা মনে পড়েছিল ওর। মা'র একমাত্র সন্তান, মা'র আশা, আর ভবিষ্যৎ! না না অসম্ভব, এ মোহ থেকে তার অব্যাহতি চাই, তার ভবিষ্যৎ চাই, সম্ভাবনা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মুহূর্তে বনশ্রীর দুটি পা জড়িয়ে ধরেছিল মল্লার,—মাপ চাইছি তোমার কাছে, আর করব না ওসব। কক্ষনো না। আমি মানুষ নই, আমি,—শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মল্লার। আঠারো বছরের জোয়ান ছেলের চোখে পরাজয়ের অশ্রু।—ছিঃ ছিঃ কাঁদছ কেন, ওঠো মল্লিদা, ওঠো। আর এরকম ছেলেমানুষী করো না তুমি, কেমন? ভয় নেই এ চিঠি কাউকে দেখাবো না, নষ্ট করে ফেলব—

বনশ্রী চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর খেয়াল হল মল্লারের, সন্ধ্যা আর নেই। রাতের অন্ধকার ওর নির্বাতি কুঠরীতে বনশ্রীর চুলের মতোই ঘন হয়ে নেমেছে। ক্লান্ত পায়ে উঠে সুইচ টিপে দিলে ও। আঃ কি আশ্চর্য আলো, কি নরম আর কি নিষ্ঠুর!

হঠাৎ মনের ভেতর কেমন একটা আনন্দদায়ক বেদনা ভেসে উঠল। আজ এতদিন বাদে মল্লিদা বলে ডেকেছে ও, 'তুমি' বলে কথা বলেছে। আশ্চর্য!

তারপর ক্রমে ক্রমে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা ঘটে গেল বনশ্রীর

সঙ্গে। আজকাল মল্লিদা ব'লে এটা সেটা দু'চার কথা বলে বনশ্রী, আর মল্লারও জাপানী তুমি টুমি বলে সাত-সতেরো। যে মল্লারকে দেখে ঘৃণা করতো বনশ্রী, সে মল্লার বুঝি এ নয়। যে কয়লা দেখে কালির ভয় করত ও, সে বুঝি তার তীব্র বিস্ফোরণে হীরে হয়ে গেছে আচমকা। এক ধমকেই বদলে গেছে মল্লার।

তবে কি ওর মনের ময়ুর পেখম গোটাল সেখানেই? বাঁক নিল ওর দুর্জয় কামনা? কই আর বাঁক নিল! কাণ্ডটা তো ঘটল এর পরেই। বিষম কাণ্ড।

বিয়ের প্রস্তাব চলছিল বনশ্রীর।

কথাটা হৈচৈ করে জানালো বাক্যবাগীশ কৃতকর্মা ত্রিদিববাবু।

—ও হে মল্লার, জানো তো পরশু জাপানীকে দেখতে আসছে? ছেলেটি চমৎকার কিন্তু। মাঞ্চেস্টার থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে এসেই ঢুকেছে পুণার এক মিলে। সাড়ে সাতশো পায়। একবারে জুয়েল। পরশু ছেলের মা আর ছেলের পিসিমা দেখতে আসবে। তা তুমি পরশু দিন সন্ধ্যার দিকে বাড়িতেই থেকো। ওরা আসবে এ সময়, ঘরোয়া ব্যাপার, থাকবে, দেখাশোনার একটু কাজটাজ করবে, বোনকে দেখতে আসবে তোমারও তো বেশ ইণ্টাররেস্ট থাকা উচিত। আর জানো তো তোমার বাবার জন্যে তোমার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম আমি। ওঃ, সে এক ব্যাপার। স্টেশনে নেমে দেখি তোমার মামাবাড়ির কারুরই কোন পাত্তা নেই। এদিকে বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। আমি আর তোমার কাকা গৌরাঙ্গ তো ওয়েটিং রুমে বসে বসেই রাত কাবার করলাম। ভোর হতেই দেখি,—

—আমার ক্লাসের দেরি হয়ে যাবে মেসোমশাই, আমি চলি—।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই,—শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন ত্রিদিববাবু।

পথে নেমে হাঁফ ছাড়ে মল্লার। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেছে, যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা ফুটে গেছে মল্লারের বুকে। এই

মুহূর্তে গেটের ওপর লতানো মালতী গাছে এতগুলো ফুল ফুটে থাকার কোন মানেই যেন নেই মল্লারের কাছে। অদূরে রেডিওর গিটারের আওয়াজে যেন শ্লেষের টংকার, বিদ্রূপের ঝংকার। দ্রুত পা চালায় মল্লার। কিন্তু মতিমহল রোডের আঠারো'র এফ নম্বরের বাড়ি ছেড়ে পালালেও মন থেকে বনশ্রীর মুখকে সরানো গেল না, ইকনমিক্সের খাতায় মুখ ঢেকেও ভোলা গেল না পরশু বনশ্রীকে দেখতে আসবে।

নির্ভুল অঙ্কের মতো সব গড়িয়ে গেল। তিনি চার দফায় তিন চার দল দেখতে এলো বনশ্রীকে এবং মল্লারের সমস্ত প্রার্থনা ব্যর্থ করে সবারই খুব পছন্দ হয়ে গেল। ছেলে নাকি বেজায় মাতৃভক্ত। যে পাত্রীই ঠিক করুন, সে রাণী থেকে চাকরাণী যাই হোক, তাকেই সে বিয়ে করতে রাজী। তবু হেসেই ত্রিদিববাবু বললেন ছেলের মাকে, যে ছেলের ব্যক্তিগত পছন্দের জন্যে তিনি ছেলেকে মেয়ের ছবি পাঠাতে চান।

—বেশ তো,—মিষ্টি হেসে বলেছেন মাঞ্চেস্টার-ফেরত ছেলের রত্নগর্ভা মা,---আপনারাই পাঠান খোকাকে। ঠিকানা দিচ্ছি আমরা, ছেলের চাকরি সম্পর্কেও আপনারা যাচাই করতে পারেন এক-আধটু। আর ছবি পাঠিয়ে ওর মত চাইবেন। জবাব পড়ে আপনার পক্ষে খোকনের চরিত্র বলটাও দেখতে পাবেন। কি বলব ত্রিদিববাবু, জানেন, ওর ক্ষিদে পেয়েছে কি না তাও আমাকেই বলে দিতে হয়। আমি যদি বলি এক মাস তুই উপোস দে খোকন, ব্যাস, প্রাণ বেরিয়ে যাক খোকন আমার আদেশের এতটুকু নড়চড় করবে না। একেবারে মা-অন্ত ছেলে।

মাতৃভক্তির বহর শুনে বহুদিন বাদে বাক্যবীর ত্রিদিববাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল, একটা কথাও ফুটল না তাঁর মুখ দিয়ে। অনেকক্ষণ বাদে তিনি হেঁ হেঁ করে কৃতার্থ হাসি হাসলেন একগাল। পার্ক স্ট্রীটের কোন এক মস্ত সাহেব ফটোগ্রাফারের দোকান থেকে একটা ছবি তোলা ছিল বনশ্রীর। চমৎকার ছবি, বনশ্রী যত সুন্দর তার

চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর সে ছবি। একখানা প্রিণ্টই ছিল বাড়িতে সে ছবিখানাই পুণা পাঠানো ঠিক হল।

সে ছবি ও একখানা চিঠি লিখে ত্রিদিববাবু মল্লারের হাতে দিলেন,—বাবা মল্লি, আজই এ দুটো জিনিস এ ঠিকানায় রেজেস্ট্রী খামে ভরে পোস্ট করে দেবে। বিয়েটা আমার ইচ্ছে ফাল্গুনেই সেরে ফেলব।

সেদিন কিছুই পোস্ট হল না। সে বিনিদ্র রাতে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে সারা রাত মল্লার কি লিখল কে জানে। পরদিন ও দুটো খাম পোস্ট করলে দু' ডাকঘর থেকে। একটা ছেলের মাকে আরেকটা পুণা, ছেলের কাছে।

সাত দিন পর একটি চিঠি এলো ছেলের মা'র কাছে থেকে। বিয়ের সম্বন্ধ তিনি ভেঙে দিলেন। এ বিয়ে হবে না। অধিক লেখা বাহুল্য।

চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ত্রিদিববাবু। স্তব্ধ হয়ে থাকলেন দু'দিন। তারপর ফেটে পড়লেন,—বেশ হয়েছে ভালো হয়েছে। বেটির রকম-সকম দেখেই আমার ভালো লাগে নি। ও বেটির অমন মা-ন্যাওটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো আমার মেয়ের? আরে, যে ছেলে এখনও অমন মা'র আঁচল ধরে থাকে সে কি পুরুষ, তুমিই বলো মল্লি, সে কি ছেলে? সে তো মেয়েছেলে। মাঞ্চেস্টারের ইঞ্জিনীয়ার না কাঁচকলা, আসলে মিস্তিরী, স্রেফ মিস্ত্রী, বুঝলে মল্লি—

সুতরাং দক্ষিণ দিকের হাওয়া আবার সেই দক্ষিণ দিকেই বইতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন এ'ও মনে হল মল্লারের, গেটের ওপর মালতী ঝাড়টারও একটা মস্ত বড় মন আছে। রেডিওর এই মুহূর্তের সেতার আলাপেও যেন একটা আশ্চর্য মাধুর্য আছে!

বিপদ ঘটল কয়েক দিনের মধ্যেই।

প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল তখন। কোন এক সাহেব কোম্পানীর এলুমেনিয়মের কারখানায় শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে কয়েক জন সাহেবকে জ্যান্ত ফার্নেসে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। তা

নিয়ে সারা শহরময় উত্তেজনা, ধরপাকড়। হঠাৎ একদিন মল্লারের সঙ্গে দেখা করতে এল তার সেই গ্রাম সম্পর্কে শেয়ালদা মেসবাসী বলাইদা। কলেজে। এক ধারে ডেকে নিয়ে বলল তার একটা উপকার করতে হবে। কি উপকার? না, সে ওই কারখানা আন্দোলনে জড়িত, কতকগুলো বে-আইনী কাগজপত্র রয়েছে তার কাছে সেগুলো সে গচ্ছিত রাখতে চায় মল্লারের হেফাজতে। নিরাপদ আশ্রয়ে। আর মল্লারের ভয় কি, ওকে আর সন্দেহ করবে কে?

—বেশ, রাখব,—রাজী হল মল্লার। সে সন্ধ্যায়ই এক বোঝা কাগজপত্র নিয়ে সে লুকিয়ে রাখল তার স্যুটকেসের তলায়। সারা পথ সে খুব সতর্ক হয়েই এসেছে? তবু—

সে রাতেই আচমকা রাত একটায় পুলিশ হানা দিল আঠারোর এফ মতিমহল রোডে। সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে। কি অদৃষ্ট, পুলিশের ঠক্‌ঠকে সদর খুলে দিয়েছিল মল্লারই। নাইট শো ছবি দেখে সবে সে ফিরছে তখন। দরজা খুলেই পুলিশ দেখে মুখ বরফের মতো সাদা হয়ে গেল ওর। পৌষালী শীত লাগল হাঁটুতে। সারা শরীরে কাঁপুনি।

কলরব করে জেগে উঠল সারা বাড়ি। ত্রিদিববাবুর বাড়িতে পুলিশ? সমস্ত বাড়ি আতঙ্কিত হয়ে জড়ো হল এসে মল্লারের ঘরে। আশ্চর্য, এ কালসাপ ছিল এ বাড়িতে।

—দারোগাবাবু আমি খুলে দিচ্ছি, আমি সব দেখাচ্ছি,—আর্তনাদ করে উঠল মল্লার।

কিন্তু না, চাবিটা টেনে নিয়ে অভ্যস্ত গাম্ভীর্যের কঠিন হাসি হেসে স্যুটকেসটা খুলে ফেলল এস বি'র লোকটা। হাতের মুরগী তারা ধীরে-সুস্থে ভোঁতা ছুরিতে ঘষে ঘষে কাটতে চিরদিনেরই ওস্তাদ।

—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মল্লারবাবু। আপনি স্থির হয়ে বসে থাকুন না। বলল স্যুটকেস তল্লাসদার লোকটি। বিদ্রূপ।

বেরিয়ে পড়ল। শুধু বে-আইনী কাগজপত্র নয়, তার চেয়ে মারাত্মক বে-আইনী জিনিস। বনশ্রীর সেই ফোটো।

সমস্তগুলো চোখ কেন্দ্রীভূত হল সেই ফোটোর ওপর। মাস্তি পাস্থুকে নিয়ে পাঁচ জোড়া পলকহীন চোখ। তারপর আচমকা চীৎকারে ফেটে পড়লেন ত্রিদিববাবু,—এ ছবি, এ ছবি এখানে এলো কি করে, মল্লি? জানোয়ার, তবে তোমার এ কাজ,—বলে আর এক মুহূর্তও দেরি করেন নি ত্রিদিববাবু। এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক চড় কশালেন ওর গালে,—কেন তুমি এ কাজ করেছিলে? খপ্ করে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিলেন তিনি। ছিটকে ঘুরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মল্লার। আর পেছনের দিকে একবারও না তাকিয়ে ত্রিদিববাবু ভারি ভারি পা ফেলে চলে গেলেন সে ঘর ছেড়ে।

গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে গেল মল্লারকে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে।

জেলে মাস ছুই পরে চিঠি পেয়েছিল মল্লার। বনশ্রীর চিঠি। সঙ্গে ফোটো।

"আসছে বুধবার আমার বিয়ে, সেই ছেলেরই সঙ্গে। তুমি আমার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ মল্লিদা, সে সব পুরনো স্মৃতি ভুলে যেও। আর আমার কোন অপরাধ নেই, তাই আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমার ছবি এবার আমি নিজেই পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। কিছু আমি দিতে পারি নি তোমাকে, এ ফোটোটা শুধু দিলাম। তোমাকে, আমি কোনদিন ভালোবাসতে পারি নি, এখনও বাসি না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার সমবেদনা আছে, সহানুভূতি আছে। জেনে রেখো, এ মনোভাব আমার থাকবে চিরদিন। ইতি—জাপানি।"

—এই যে আমার বাসা মল্লিদা, এসো, বলে বনশ্রী কলিং-পুশে আঙুল ছোঁয়াল। দরজা খুলে গেল একটু বাদেই। ছোট্ট একটা বসবার ঘর। বাংলা ভাষায় বৈঠকখানা, আর ইংরেজী কেতায় ড্রইংরুম।

—একটু বোস মল্লিদা, আমি এই একটু হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।

হাত মুখ ধোওয়া ?

আশ্চর্য একদিন এই হাত-মুখ ধোয়ার পরই তো ও দেখেছিল বনশ্রীকে। নাঃ, সে সব পুরনো ইতিহাস, জীবন থেকে মতিমহল রোড বিদায় নিয়েছে অনেকদিন। গুড্ ওলড্ ডেজ ! গুড ? কে জানে।

—তারপর বলো এখন কি করছ, কোথায় আছ ?

স্নাতশুভ্র বনশ্রী এসে ঘরে ঢুকল। মেরুন রঙের শাড়িতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বনশ্রীকে।

—আমি ? থাকি কসবার এক বস্তিতে, আর করি ফোটোগ্রাফী। ছোট্ট একটা দোকান দিয়েছি কিছুদিন হল, দিন দশেক, গড়িয়াহাটার বাজারের কাছে। এই কোনমতে চলছে। কিন্তু তোমার খবর বলো শুনি, পুণা থেকে কবে এলে, তোমার সব ছেলেপুলেরা গেল কই ?

—হয় নি তো। ছেলেপুলে তো আমার নেই। পুণা থেকে এসেছি মাস চারেক হয়ে গেছে। চারমাস কেন পাঁচ মাসই হবে। থাকি এবাড়ির একতলায়, একা।—হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল বনশ্রী, জ্বলন্ত একটা মোমবাতিকে কেউ যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। যন্ত্রণা-চাপা মুখ। শ্রবণ গম্ভীর চোখ।

এ আকস্মিক ভাবান্তরে বিস্মিত হয় মল্লার। একটু ঝুঁকে ও প্রশ্ন করে,—কি ব্যাপার জাপানী, হঠাৎ, হঠাৎ অমন—

কই কিছু না তো—মরা-মাছের মতো মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে খানিকটা হাসির বিদ্রূপ ফুলল। তারপর মল্লারকে বিমূঢ় করে দিয়ে আচমকা দুহাতে ওর একটা হাত মুঠোয় তুলে নিয়ে বনশ্রী অনুনয়ের কান্নায় ভেঙে পড়ল,—মল্লিদা বড় ভুল করেছি আমি, বড় ভুল করেছি। আমি হেরে গেছি, আমি সুখী হতে পারি নি। তুমি জানো না আমার স্বামী, আমার স্বামী আসলে—দাঁত দিয়ে একবার ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বনশ্রী,—পুরুষই নয়। ও মেয়ের মতোই, না, মেয়েরও অধম। অথচ আমার শাশুড়ী বলেন, ছেলেকে তাঁরা আবার বিয়ে

দেবে। যেন—যেন আমিই দায়ী। উঃ অসহ্য, বিলেত-ফেরত মাতৃভক্ত স্বামী আর সহ্য করতে পারছি না। ওকে ছেড়েই আমি চলে এসেছি এখানে, একটা চাকরি নিয়েছি, তাই দিয়ে চালাই, একা থাকি। ওরা আর খোঁজ করে না একবারও। বাবা মা এখন তো গাঁয়ে রয়েছেন, আর কোলকাতা থাকলেও তাঁদের কাছে আমি যেতে পারতাম না। মল্লিদা,—হঠাৎ গলার স্বর ষড়যন্ত্র-চাপা ফিসফিসে নেমে এল বনশ্রীর,—তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো? পারো আমাকে আবার তোমার পাশে তুলে নিতে?—সমস্ত চোখ মুখে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধার মতো বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ওর,—'পারো না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি পারবে মল্লিদা, পারবে। আমি জানি তুমি আজো আমাকে ভালোবাসো, আজো তুমি ভুলতে পারোনি। বলো মল্লিদা, কথা বলো।' বনশ্রীর দু'হাতের আগ্রহ নিষ্পেষণে মল্লারের হাতটা ঘেমে উঠল।

—'সে আর হয় না জাপানী। তুমি ওসব কথা আর আমাকে বলো না। তুমি সুখী হও নি দেখে আমি সত্যই আজ তোমাকে শুধু সমবেদনা আর সহানুভূতি ছাড়া কিছুই দিতে পারি না। আমার স্ত্রী আছেন, আমার ছেলেমেয়েও আছে জাপানী। তুমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি'—।

—'কি?' আহত নাগিনীর মতো ফুঁসে ওঠে বনশ্রী। নোংরা কোন স্পর্শ থেকে তড়িৎ ঘৃণায় নিজেকে সরিয়ে নিলো যেন। মল্লারের হাতটা ছুড়ে দিয়ে সোফা থেকে বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়ালো ও। —'মিথ্যে বলো না মল্লিদা, তুমি যদি আজো আমাকে ভালো না বাসতে, তবে এতদিন বাদে স্ত্রী ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার ছবি বুকে করে নিয়ে ঘুরতে না। স্ত্রী! হাসালে তুমি! তোমার স্ত্রী আছে, আমার স্বামী নেই? বিয়ে করলেই পুরনো ভালোবাসা মরে যায় না, মল্লিদা। আর, আর পরস্ত্রীর ছবি যে এমনি বুকে করে বেড়াও, তা সাধ্বী স্ত্রী কিছু বলেন না? নিজেকে মিথ্যে ফাঁকি দিতে চেও না মল্লিদা।'

—'তুমি ভুল করছো জাপানী। তোমার ছবি আমি বুকে নিয়ে বেড়াই না। ওটা আমার স্যুটকেশ ট্রাঙ্কেও থাকে না। এইমাত্র ওটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, একটা পার্টিকে আমার পোর্ট্রেট ছবির স্যাম্পল দেখাতে। অন্য সময় ওটা থাকে আমার স্টুডিও শো-কেসে। আর শো-কেসে যে ক'টি মেয়ের ছবি রয়েছে সব ক'টিই তাঁরা পরস্ত্রী। সুতরাং বুঝতে পারছো আমার স্ত্রীর চটবার কথাও নয়। অন্য দোকানের তোলা ছবি আমার শো-কেসে, ফাঁকি শুধু এইটুকুই। আর জানো তো, ব্যবসায় এক-আধটু ফাঁকি থাকেই।'—গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মল্লার।—'আচ্ছা জাপানী, এবার আমি চলি।'

এতটুকু আওয়াজ ফুটল না বনশ্রীর বেদনাদগ্ধ মুখে। ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটো শুধু থরথরিয়ে উঠল একবার। আর, তার পরমুহূর্তেই দু'হাতে মুখ ঢেকে অজস্র কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল ও। এ কান্না কি ফুরোবে ?.........

বন্ধুর বিয়েতে দিনকয়েক আগে জব্বলপুরে গিয়েছিলাম। বন্ধুটি সেখানে এক কারখানার একজন জঁাদরেল চাকুরে। ঝকঝকে কোয়ার্টার নিয়ে থাকেন। কলোনীর গতানুগতিক একঘেয়ে অসার জীবনের মধ্যেও বন্ধুটি কিন্তু কাব্যের সন্ধান ঠিক পেয়ে গিয়েছিলেন। ফ্যাক্টরীরই চাকুরে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও শেষ পর্যন্ত বিবাহ। কিন্তু আমার গল্প এদের নিয়ে নয়।

তবে এরাই আমার সেতু। নইলে সে বিয়ের পার্টিতে সন্দীপ ভাদুড়ীর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার সুযোগ ঘটত না। বিয়ের পার্টিতে একা সমস্ত আসর সরগরম করে রেখেছিলেন। এই ভাদুড়ী। কলোনীর কেন্দ্রমণি তিনি। দু'মিনিটে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে প্রচুর ভাব জমিয়ে ফেললেন। প্রচুর খেলেন,, হোহো করে প্রচণ্ড হাসলেন, আর লম্বা টানে এক একবারে আধ ইঞ্চিটাক পুড়িয়ে বর্মা চুরুটের ধেঁায়া ওড়ালেন আকাশে। তারপর হঠাৎ এক সময়,—আমার কাজ আছে, চলি,—বলে মাথায় টুপী চড়িয়ে ওভার-কোটের কলার দুটো উঁচু করে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন রাস্তা ধরে। হঠাৎ ওরকম আকস্মিক চলে যাওয়ায় সমস্ত আসরটাই কেমন মিইয়ে গেল। তিন হাজারী অফিসারের স্ত্রীর শাড়িতে বেশী লোকের চোখ আর স্বাদ খুঁজে পেল না, দু'হাজারী দুটি পাঞ্জাবী মেয়ের চেষ্টাকৃত কলহাস্যেও নয়, এমন কি কলোনীর সুন্দরী শ্রেষ্ঠা ঊষা ডেকার হাত, সুধাংশু চৌধুরীর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে থাকা প্রকাশ্য নাটকীয় দৃশ্যটাতেও কারুর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না।

বুঝলাম, সন্দীপ ভাদুড়ীই কলোনীর আসল লোক। উনিই এই তারার রাজ্যে শুকতারা।

পরদিন সন্দীপবাবু দুপুরে আমাকে তাঁর বাসায় খাবার জন্য একটা চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন। আমার বন্ধুটি হেসে বললেন,—নাও ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ করে এসো ভালো করে। তোমরা লেখক মানুষ, এরকম টাইপ চরিত্র তোমাদের স্বভাবতঃই টানবে। প্রচুর দেশ ঘুরেছে, প্রচুর অভিজ্ঞতা লোকটার। লোকটা সত্যি আমাদের কাছে একটা মিস্ট্রি।

দরজা খুলেই ইংরেজী কেতায় সাদর অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠলেন ভাদুড়ী। চেয়ার টেনে বসতেই বললেন,—কিছু মনে করবেন না, নেমন্তন্ন করেছি বটে, তবে মেয়েদের হাতের রান্না খাওয়াতে পারলাম না। স্ত্রী বাপের বাড়ি, তাই খাবার আসবে ক্যান্টিন থেকে। আমি এখন একা।

—তাতে কি,—আমি প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলাম,—খাওয়াটা তো আসল নয়, আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হচ্ছে, এটাও কি আমার কম লাভ!

সিগ্রারেট ধরিয়ে একবার ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। একদিকে দেয়াল-জোড়া একটা মস্ত পোর্ট্রেট স্টাডি, অন্যদিকের দেয়ালে গুটিকয় ওয়াটার কালার ল্যাণ্ডস্কেপ্। একটা ক্রেয়নের কাজও রয়েছে।

—বাড়িতে বুঝি কেউ ছবি আঁকেন? প্রশ্নটা না করে থাকতে পারলাম না।

—হ্যাঁ, এ অধমই আঁকে।

—আপনার আঁকা? আপনার দেখছি অনেক গুণ।

—দোষের খবর তো রাখেন না, দোষ তার চেয়েও বেশী।

মাঝের পোর্ট্রেটটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম,—কিছু যদি মনে না করেন, প্রশ্ন করতে পারি কি এটা কার ছবি? সম্ভবত আপনার স্ত্রীর?

—যদি বলি, না, এ আমার কেউ নয়, অথচ কারুর চেয়ে কমও নয়? মিটমিট করে একটু হেসে নিয়ে বললেন ভাদুড়ী,—সাহিত্যিক মানুষ গল্পের গন্ধ পেয়ে খুব উৎসাহিত বোধ করছেন নিশ্চয়ই?

হেসে বললাম,—স্বাভাবিক। তবে সব কৌতূহলের কি নিবৃত্তি করা চলে।

—না, তা চলে না, তবে এ কৌতূহল আমি আপনার মেটাবো। আসুন তার আগে খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলি।

ভাদুড়ী চাকরকে ডেকে টেবিল সাজাতে বললেন।

খাওয়ার পর আমার সিগারেট আর ভাদুড়ীর চুরুটের ধোঁয়া যখন ঘরের মাঘ-ম্লান রৌদ্রের লালচে আলোর বল্লনগুলোকে নীলচে করে তুলেছে, তখন ভরাট গলায় বলতে শুরু করলেন ভাদুড়ী।

—তখন আমি আবাদানে। সেখানকার এক কারখানায় কাজ করি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বসরা, বাগদাদ ঘুরে বেড়াই। ভালো পয়সা আয় করি, সুখেই আছি। আবাদানে বাঙালী যে খুব বেশী ছিল তা নয়, তবে ইণ্ডিয়ান ছিল প্রচুর। বিকেলে আমাদের মেসে আড্ডা হ'ত জোর, পলিটিক্স থেকে হলিউড সবই ছিল আলোচনার বিষয়। ওখানে মাঝে মাঝে এক্সকারসনের প্রোগ্রাম ঠিক হত।

একবার আমরা ঠিক করলাম বাহেরিন যাবো। সবসুদ্ধ আমরা চারজন। আমি, রঙ্গস্বামী বলে এক মাদ্রাজী, কার্লেকর নামে এক বম্বেওয়ালা আর শান্তারাম নামে এক মারাঠি। আমরা ভারতবর্ষের চারজন চার প্রদেশের স্পেসিমেন রওনা হলাম বাহেরিন। স্টিমার ঘাটের কাছে ভেড়ার আগেই দেখি বেশ কয়েকজন ভারতীয় দাঁড়িয়ে আছেন ঘাটে। আমরা নামতে না নামতেই এসে আমাদের ছেঁকে ধরলেন। সবারই এক প্রশ্ন,—হোয়াটস ইওর নেম? ইউ আর ফ্রম—

—ম্যাড্রাস। বলতে না বলতেই দুইজন মাদ্রাজী টেনে নিয়ে গেল রঙ্গস্বামীকে।

—বোম্বে। কথাটা না বেরুতেই প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল কার্লেকরকে।

মারাঠীরা তো শান্তারামকে পেয়ে কোরাস গাইতে শুরু করে দিল। আর আমি বাঙালী বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন মেছোহাট বসে গেল সেখানে।

এ বলে না আমার বাসায় চলুন আর ও বলে, না আমার ওখানে। চার মাস পরে নাকি এখানে এই প্রথম আরেকজন বাঙালী নামল। সুতরাং এ বাঙালীকে কেউ ছাড়তে রাজি নয়। টানা-হ্যাঁচড়ায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। শেষ পর্যন্ত জিতে গেল একজন মাছ দিয়ে। অর্থাৎ তার বাসায় আজ মাছ আনা হয়েছে, সুতরাং তারই জিৎ। ওসব জায়গায় সবচেয়ে আক্রা হচ্ছে মাছ। মাছের বাজীতে হেরে গিয়ে আর সবার মুখ চুন। তবে প্রত্যেকের অনুরোধ রইল অন্তত একদিন, নিদেনপক্ষে একবেলা যেন আমি তাদের ওখানে খাই।

ভদ্রলোকের নাম ভগীরথ চক্রবর্তী। আমি বাঙালী, তায় আবার বামুন দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। হৈহৈ করে আমাকে নিয়ে তার বাড়িতে হাজির। দরজা ধরে সে কি ধাক্কা আর চীৎকার, —কই গো এদিকে এসো। দেখো আজ কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

দরজা খুলে একটি অল্পবয়সী সুশ্রী বৌ আমাকে দেখে মাথায় ঘোমটা তোলার একটা ব্যর্থ প্রয়াস করলে।

তাই দেখে চক্রবর্তী মহা খাপ্পা,—ও, আবার কোন্ ঢং। ঘোমটা দিয়েই যদি থাকবে, তবে আর ভদ্রলোককে আনা কেন? এতদিন বাদে একজন বাঙালী এনেছি আর উনি ঘোমটা দিয়ে লজ্জাবতী হলেন!

—না না সে কি,—খুশী ঝলমলে মুখে বলে বৌটি,—আসুন আসুন, এ ঘরে অসুন। ইস, কতদিন বাদে যে বাঙালীর মুখ দেখছি। বৌটি এমনভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে যে, আমার রীতিমতো অস্বস্তি লাগতে লাগল।

চক্রবর্তীর চেয়ে অনেক ছোট তার বৌ। দেখে মনে হয়

দ্বিতীয় পক্ষ। পরে অবিশ্যি জানলাম আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি। প্রথম পক্ষ মারা যাওয়ার পর এক মাস কাটিয়েই চক্রবর্তী দেশে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এসেছেন প্রায় আট মাস। বৌটির বয়েস অল্প, মিষ্টি চেহারা, সুন্দর স্বভাব। মনে হয় চক্রবর্তীর মতো ঐরকম মাঝবয়সী টেকো-মাথা ভদ্রলোক একে বিয়ে করে অন্যায় করেছেন।

আরো লক্ষ্য করে দেখলাম, যতক্ষণ চক্রবর্তীর কাছে কাছে থাকে, মেয়েটি খুব ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করে। হাসিটাও কেমন জোর করা, কথাগুলো জড়ানো। যেই চক্রবর্তী অফিসে চলে গেলেন, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন তার বৌ। ঘোমটা নয়, মুখের অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাবটা যেন খসে গেল এইবার। সারা মুখে আলো ঝলসে উঠল।

চেয়ার টেনে দুজনে মুখোমুখী বসে যতোরাজ্যের গল্প। বাপের বাড়ির কথা, দেশ-গাঁয়ের কথা, কবে কোথায় ভূত দেখে ভয় পেয়েছিল তার গল্প—পিসিমাকে একবার কি করে ওরা ভাইবোনে মিলে ভূত সেজে ভয় দেখিয়েছিল, জামাইবাবুকে কেমন এপ্রিল ফুল করে জব্দ করেছিল ইত্যাদি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে বলত, উঁহু ঘুমুলে চলবে না। যান, চোখে জল দিয়ে আসুন। এতদিন বাদে একজন কথা কওয়ার লোক পেয়েছি, ঘুমটুম এসব ফাঁকি শুনব কেন। প্রাণের সুখে কথা বলি নি'। তারপর আপনি চলে গেলে আবার তো সেই বোবা হয়ে থাকা। উঃ, অসহ্য। প্রাণ বেরিয়ে যায় এরকম মরুভূমিতে পড়ে থাকতে। ভাইবোনদের মধ্যে জানেন আমি ছিলাম সবচেয়ে বেশী কথা বলিয়ে। সারাদিন বকবক করতাম, আর তার ভাগ্যেই কিনা এই শাস্তি!

হেসে বললাম,—কেন চক্রবর্তী? আর এ ছাড়াও এখানে আরো কয়েকঘর বাঙালী রয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেটলেও তো সময় কাটাতে পারেন?

হঠাৎ মেয়েটির সমস্ত মুখ ম্লান হয়ে গেল। বলল,—না, চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে

চায় না। কেন জানেন? আমার আগের দিদি নাকি খুব ভালো লোক ছিলেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসত খুব। আমি গেলে তাই ওদের সবার আগে মনে পড়ে যায় আগের দিদির গল্প। ইনিয়েবিনিয়ে আমাকে ওরা সে সব গল্প শোনাবে। আর গল্প বলার সময় এমন-ভাবে তাকায় যেন আগের দিদিকে আমিই মেরে ফেলে তার জায়গা জুড়ে বসেছি। আচ্ছা বলতে পারেন আগের দিদি ভালো ছিল সেটা কি আমার দোষ? কান্নায় ভেঙে আসে বৌটির গলা। তারপর যেন সাপের মতো ফণা তুলে ওঠে সে। জলভেজা চোখ দুটোতে আগুন ঠিকরে পড়ে,—কেন, কেন এই বুড়ো আমায় বিয়ে করে আনল? কেন এই বুড়ো প্রথম বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে চিতেয় উঠলো না? আর বিয়ে যদি করবেই তবে রাজ্যের মেয়ে থাকতে আমাকে বিয়ে করতে গেল কেন? কেন? কি অপরাধ করেছি আমি যে আমার এই শাস্তি? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়ল বৌটি। তারপর দৌড়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল। তার অভিশপ্ত জীবনের কান্নার লজ্জা আজ সে কোথায় লুকোবে?

তারপর দু'দিন এবেলা এ-বাড়িতে ওবেলা ও-বাড়িতে করে কাটালাম আমি। আর লক্ষ্য করলাম কথায় কথায় চক্রবর্তীর কথা উঠলেই সবাই তার প্রথমপক্ষের বৌয়ের গুণগানেই মুখর, একবারও কেউ এ বৌয়ের কথা তুললে না। এই দু'দিন বৌটি বেশ হাসিখুশি-ভাবে থাকল। ইচ্ছে করে আমি আর ও প্রসঙ্গে কথা তুলি না। যেন সে সব হঠাৎ ভূতে পাওয়া গল্প, দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু না, আমি বুঝি। আমি বুঝি ওর হাসির তলায় কোন বেদনা লুকিয়ে আছে, চোখের জলের নিচে কোন বিদ্যুৎ। মাঝে মাঝে মনে হত আমার, আজ যদি জীবন্ত হয়ে চক্রবর্তীর প্রথম পক্ষ সামনে এসে দাঁড়ায়, ও বুঝি বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তার জন্যেই স্বামীকে তার অপরিমেয় ঘৃণা, প্রতিবেশীদের সাহচর্য দুঃসহ।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ফেরবার কথা, সেদিনই এক কাণ্ড করে

বসল বৌটি। দুপুরে হঠাৎ দু'হাতে আমার একটা হাত চেপে ধরে আকুলকণ্ঠে বলল,—আপনি আমার ধর্মভাই, আপনি আমাকে বাঁচান।

মুহূর্তে সমস্ত শরীর আমার আড়ষ্ট হয়ে উঠল। বললাম,—আমি আর আপনার কি করতে পারি বলুন ?

ষড়যন্ত্র-চাপা গলায় বলল বৌটি,—আপনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন। আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। এখানে থাকলে আর বাঁচব না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। এখানে কেউ আমার আপন নয়, কেউ নয়! সেকি ভয়ের আকুল কণ্ঠ। সে মুখ যদি দেখতেন, সে গলা যদি আপনি শুনতেন। কিছুতেই তা সহ্য করা যায় না!

ছাইয়ের মতো সাদা সে মুখ। কান্নায় ভেজা গলা। এখানে থাকতে আমার ভয় করে, ভয়ানক ভয় করে। আমার স্বামীকে আমি একটুও ভালবাসি না। তার জন্যেই আমার এই দুঃখ, এই অদৃষ্ট। আমার এ দুর্ভাগ্যের জন্যে ওই দায়ী। প্রথম বৌকে খেয়েছে, আমাকেও খাবে।

—ছিঃ ছিঃ এসব কি বলছেন আপনি।—আমি বাধা দেবার চেষ্টা করি।

—ঠিক বলছি।—রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে চলে বৌটি,—জানেন, যখন একা থাকি তখন মনে হয় একদিন ঐ প্রথম পক্ষের দিদি এসে আমায় গলা টিপে মেরে ফেলবে। ঘুমুতে পর্যন্ত পারি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিতে। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় আমার। অসহ্য এভাবে বেঁচে থাকা। এ ভার আমি আর বইতে পারছি না।

—না না, ওকি সব যা-তা ভাবছেন। ওসব ভাবাও পাপ।

—তবে আমাকে নিয়ে চলুন। নিয়ে চলুন এই মরুভূমির বাইরে। আপনি আমার ভাই, বোনের জন্যে এটুকু আপনি করুন। আমার হাতে জমানো কিছু টাকা আছে। এ'ছাড়া গয়না আছে

অনেক। কোলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেই হয়ে যাবে। সেখানে আমার বড়দির বাসা আছে। তারপর আর আপনার দায়িত্ব নেই।

—সে হয় না দিদি—কাঁপা কান্নাভরা গলায় বললাম আমি,—মন শক্ত করে এখানেই থাকুন। স্বামীর সঙ্গে মনের মিল করে—

—থাক।—মুহূর্তে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো বৌটি,—কোন উপদেশ আমি শুনতে চাই না।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল।

বিকেলে বেরিয়ে যাবার সময় একবার শুধু দেখা দিয়েছিল ও। স্বামীর পেছনে আধো-ঘোমটায় ঢেকে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। নিস্পন্দ প্রতিমার মতো। একেবারের বেশী দু'বার আর চোখ তুলে তাকাতে পারি নি ওর দিকে।

চক্রবর্তীর অজস্র লৌকিকতা শুনতে শুনতে কখন যে স্টিমারে উঠে বসেছিলাম খেয়াল নেই। স্টিমারের ভোঁ যখন বাজলো তখন বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। স্টিমারের ভোঁ ত নয়, এ যেন একটি করুণ অভিশপ্ত বধূর বুক ফাটা চিৎকার।—

সিগারটা নিভে গিয়েছিল ভাদুড়ী দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে তাতে ফের অগ্নিসংযোগ করলেন। মাঘ মাসের শীতকাতুরে দিন ফুরিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। ঘরে ধূপছায়া অন্ধকার। শুধু সিগারেটের টিনটা ভাদুড়ী নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি কলের পুতুলের মতো একটা তুলে ঠোঁটে গুঁজলাম।

তারপর আর কি। তারপর আবাদানে চলে এলাম আমি। হাজারো কাজের ঝামেলায় ডুবে গেলাম। সেই করুণ বধূটির ম্লান মুখ ক্রমে হারিয়ে গেল স্মৃতির কোঠা থেকে। প্রায় ভুলেই গেলাম বাহেরিনে কাটানো তুচ্ছ কয়টি দিনের কথা।

প্রায় দু'বছর বাদে হঠাৎ অফিসের কাজে আমার বাহেরিন যাওয়ার কথা উঠল। নামটা মনে পড়তেই পুরনো কয়েকটা ছেঁড়া

দিন কুয়াশা কেটে যাওয়া দিগন্তের মতো জেগে উঠল মনের আকাশে। দু'বছর বাদে গিয়ে ফের হাজির হলাম সেখানে।

—গিয়েছিলেন? তারপর?—আমার উৎকণ্ঠা গলার আওয়াজে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

—তারপর আর কি—গিয়ে পৌঁছতেই বাঙালীদের মুখে খবরটা পেলাম। আমি চলে আসবার ছ'মাস পরেই আত্মহত্যা করে মরেছে চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পক্ষ। সারা শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আর একটা চিঠিতে চক্রবর্তীকে লিখে গিয়েছিল তার মৃত্যুর পর আর কোন মেয়েকে বিয়ে করে মেয়েটির জীবনকে এভাবে যেন ব্যর্থ করে না দেয়। এই তার শেষ অনুরোধ।

শুনে সমস্ত শরীর আমার হিম হয়ে এলো। আরো শুনলাম, চক্রবর্তী ফের বিয়ে করবার জন্য দু'মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে মাস খানেক হলো।

চুপ করলেন ভাদুড়ী। শুধু দানা বাঁধা অন্ধকারে তাঁর সিগারের লাল আলোটা জ্বলে উঠল একবার। বাইরে রাস্তা দিয়ে জোর আওয়াজ তুলে একটা মোটর বাইক চলে গেল। তারপর সব চুপচাপ।

—কিন্তু ছবি? আরম্ভের অধ্যায়ে ফিরে এলাম আমি।

—ওঃ, ওটার জন্যে আমাকে খাটতে হয়েছে একটু। ভগীরথ চক্রবর্তীর স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্থানীয় বাঙালীরা মিলে একটা শোকসভার আয়োজন করেছিলেন। সে উপলক্ষে শোকজ্ঞাপক একটি পুস্তিকা ওরা ছেপেছিলেন। তার মলাটে বৌটির বিয়ের পোশাকে তোলা তার একমাত্র ছবিটি ছাপা হয়ে ছিল। প্রত্যেক বাঙালী-বাড়ি ঘুরে ঘুরে আমি শেষ পর্যন্ত এক বাসায় ঐ বইটা পেয়েছিলাম। তারপর সেটা থেকেই অনেক দিন ধরে আমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে এই ছবিটি আমি এঁকেছি। ক্রিটিকদের কাছে এ ছবির মূল্য যাই হোক, আমার কাছে এর মূল্য অসীম। আপনি তো শিল্পী মানুষ,

কথা-শিল্পী। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পয়সা দিয়ে এর দাম হয় না। আর্টের বিজ্ঞান দিয়েও নয়। দাম হয় শুধু মানুষের হাস্যকর অক্ষমতা দিয়ে।—উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠার মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভাদুড়ী।

বুকের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে উঠেছিল আমার। গলা যেন কাঠ। ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম,—আমি এখন উঠি সন্দীপবাবু।

চমকে মুখ তুললেন ভাদুড়ী,—সে কি মশাই, এখন যাবেন কি, বসুন। চা খেয়ে তবে যাবেন। দাঁড়ান চা আনতে বলি। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন ভাদুড়ী।

হঠাৎ দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই দেখি সামনে কর্নেল ব্রাগাঞ্জা দাঁড়িয়ে। চুল উষ্কখুষ্ক চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, হাতে একটা কাগজে মোড়া বোতল।

আপনি ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন উনি। তারপর কাগজের মোড়ক খুলে ঠক করে বোতলটা রাখলেন টেবিলের ওপর।

বোম্বেতে টেবিলের ওপর বোতল দেখলে কেমন ভয়ে গা শিরশির করে। বোতল তো নয় যেন টেবিলের ওপর কেউ একটা লোডেড পিস্তল ফেলে রেখেছে।

—তোমার চাকরটাকে পাঠাও কয়েকটা সোডা নিয়ে আসতে, —ব্রাগাঞ্জা পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন একথা।

চাকরটাকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বসলাম। তারপর প্রশ্নিল চোখে তাকালাম কর্নেল সাহেবের দিকে।

কর্নেল সাহেব পকেট থেকে চাবির স্ক্রু বার করে দুম করে বোতলের ছিপিটা খুলে ফেললেন। তারপর আমার গোল গোল চোখের সামনে ঢক্‌ঢক্ করে বেশ খানিকটা নির্জলা গলায় ঢাললেন।

—সোডা তো আসছে,—আমি আঁতকে উঠে বললাম।

জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বললেন উনি,—আসুক। গলাটা সামান্য না ভেজালে চলছিল না।

—কিন্তু,—এইবার প্রশ্নটা করেই ফেললাম,—কি হয়েছে কর্নেল, এমন করছেন কেন ? আপনাকে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। কোন দুর্ঘটনা—

কর্নেল ব্রাগাঞ্জা হাসলেন। মড়ার মতো ফ্যাকাসে বিবর্ণ হাসি। তারপর বললেন,—সোডাটা আসুক, বলছি। আপনারা সিনেমার লোক, কিন্তু এমন টেরিফিক ড্রামা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না।

—ড্রামা?—

চাকরটা সোডা নামিয়ে দিয়ে গ্লাস আনতে গেল। কর্নেল নিজেই একটা সোডা ভাঙলেন, তারপর গ্লাস আনতেই হুইস্কি ঢেলে মেশাতে লাগলেন। একমনে। ধীরে সুস্থে তারপর চুমুক দিয়ে দেখলেন স্বাদ। কি ভেবে আরো খানিকটা হুইস্কি মেশালেন তার সঙ্গে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উপন্যাসের শেষ লাইনের সুরে বললেন,—এইমাত্র আমার ছ'বছরের মেয়ে নরীন মারা গেল। মোটর এক্সিডেন্টে।

—আপনার ছ'বছরের মেয়ে?—আমার কৌতূহল আকাশ উঁচু। ব্রাগাঞ্জা সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স এখন সতেরো-আঠারো, আর সে ছেলে, আর তার নাম রবার্টস। ছ'বছরের মেয়ে নরীন—না, নিশ্চয়ই নেশার ঘোরে বাজে বকছেন কর্নেল।

—ভাবছো নেশার ঘোরে আবোল-তাবোল বক্‌ছি। না?—ব্রাগাঞ্জা হাসলেন,– না হে, কাল টাইমস্-এ দেখতে পাবে ছাপার অক্ষরে। 'কর্নেল ব্রাগাঞ্জার ছ'বছরের মেয়ের শোচনীয় মৃত্যু'। সঙ্গে সঙ্গে তোমার মতোই বিষম খাবে সারা ভারতবর্ষে আমার পরিচিত লোকেরা। তারপর জানতে পারবে সব। সবাই জানতে পারবে এতবড় পজিশন, প্রতিপত্তি সম্মান যে লোকের তার সম্পর্কে কি মর্মান্তিক স্ক্যাণ্ডাল রয়েছে! এমন মুখরোচক স্ক্যাণ্ডাল চায়ের পেয়ালার সাথে স্ন্যাক্স্-এর কাজ করবে সোসাইটির। কাল লোকে চিনতে পারবে আরেক কর্নেল ব্রাগাঞ্জাকে। যে, যে—ঢক্‌ঢক্ করে বাকি গ্লাসটা খালি করে ফেললেন উনি।

আমি দু'টো কাঠি নষ্ট করে একটা গোল্ড ফ্লেক ধরলাম।

—"আট বছর আগের কথা।

—তখন আমি সন্থ সন্থ কর্নেল হয়েছি। থাকতাম পুণায়।

—আফ্রিকার যুদ্ধে আমার বীরত্বের জন্য দেশময় নামডাক। স্বভাবতই পুণার মতো ছোট জায়গায় আমার পদবীর দাপট প্রচুর।

—সবচেয়ে নাম বেশী আমার সুষ্ঠু পরিবারের। এমন ডিভোশনাল হাজব্যাণ্ড হয় না, সোসাইটির মেয়েদের বক্তব্য এই। এমন রেশপন্‌সিব্‌ল্‌ ফাদার হয় না, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের এই ধারণা। এমন যে চরিত্রবান বীরপুরুষ তাকেও টনক নড়িয়ে দিলে একজন। তার নাম কুমকুম।—"

বলেই কর্নেল সাহেব আবার গ্লাস ফেনায় ভর্তি করেলেন।

—কুমকুম?—আমি কৌতূহলের রাশ ছেড়ে দিলাম,—কোন্‌ কুমকুম? আমাদের ফিল্ম আর্টিস্ট বিখ্যাত নর্তকী গায়িকা কুমকুম ওরফে মালিকা বেগম?

—"ঠিক ধরেছেন।—ব্রাগাঞ্জা সাহেব টাই-এর ফাঁস আলগা করতে করতে বললেন,—সেই কুমকুম। যে এক একটা রাতে রাজামহারাজাদের কাছ থেকে আদায় করত বিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। কত উদ্ভট সব গল্প শুনেছি। কোন এক মহারাজা নাকি ওকে একশ'টাকার নোট জোড়া লাগিয়ে এগারো হাত শাড়ি করে দিয়েছিল। মহারাজা কতগুলো নোট দিয়ে ছিল সে খবর আমি জানি না। হয়তো মহারাজা নিজেই গুণতে পারে নি, গোনে নি। ভাবুন এগারো হাত শাড়ি, যার প্রস্থ আটচল্লিশ ইঞ্চি, পুরোটা শুধু একশ' টাকার নোট!

—এই কুমকুমের সঙ্গে দেখা হল আমার এইটা ছবির মহরৎ করতে গিয়ে। মনে আছে ডেকান স্টুডিওয় মহরৎ হয়েছিল। আমি, কর্নেল ফিলিপ ব্রাগাঞ্জা হয়েছিলাম সে মহরৎ অনুষ্ঠানের সভাপতি।

—সেখানে আলাপ হল কুমকুমের সঙ্গে। মহরৎ ওর ওপর ছিল। কি কুক্ষণেই না আমি গিয়েছিলাম সভাপতি হয়ে। নইলে, হয়তো—"

গ্লাসটা খালি করে ফেললেন এবার।

—এখন হুইস্কি থাক, আপনি আর খাবেন না প্লিজ,—আমি অনুনয় জানালাম।

—বেশ খাব না আর,—বোতলটা দূরে সরিয়ে রাখলেন কর্নেল।

“সত্যি রূপ বটে কুমকুমের। গায়ের রঙ যেন রেশম। তেমনি সোনালী, তেমনি নরম, তেমনি মসৃণ। হাতের তেলো যেন এক একটি পদ্মফুল। সামান্য হ্যাণ্ডসেকের চাপে রক্তজমাট টকটকে হয়ে উঠেছিল। আর গলা কি স্বচ্ছ, দুধ খেলে স্পষ্ট দেখা যেতো দুধের সাদা সাদা রেখা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে স্বর্ণকোমল কণ্ঠের নিচে। হাসছেন হয়তো মনে মনে, ভাবছেন, কুমকুম আপনার দেখা মেয়ে তার সম্পর্কে অরসিক এক কর্নেলের কাব্য করা শোভা পায় না। কিন্তু বিশ্বাস করুন রূপের আবেদনে স্টাচুও কুমারসম্ভব লিখতে পারে। আমি তো সামান্য একটু বিশেষণদের লজ্জা দিলাম।

—কুমকুম আমাকে প্রথম তীরেই ঘায়েল করেছিল।

ও বলেছিল,—মিলিটারীর লোকদের সম্পর্কে আমার বড্ড কৌতূহল। ইংরাজী যুদ্ধের ছবি দেখতে আমার কি যে থ্রিল হয় কি বলব।

—আপনার সঙ্গে আলাপে ভারি খুশি হলাম। যুদ্ধের গল্প শোনাবেন আমায়? বড্ড শুনতে ইচ্ছা করে।

—যুদ্ধের গল্প?

—বারে, যুদ্ধ করেন নি আপনি?

—করি নি মানে? আফ্রিকায় আমার যুদ্ধের সাহসিকতার জন্যেই তো কর্নেল হয়েছি।

—আ-ফ্রি-কা-য়? সিংহ দেখেছেন? উঃ আফ্রিকায় খুব গরম না? ভারী মজা লাগছিল কুমকুমের ছেলেমানুষী কৌতূহল দেখে। ও বললে,—আসুন না একদিন চায়ে আমার বাসায়। গল্প শোনাবেন আফ্রিকার। দেবেন পদধূলি? দেবেন?

—হয়তো রূপের জন্যে, হয়তো বিনয়ের জন্যে, হয়তো নিজের

প্রচারের উৎসাহে, জানি না কেন রাজী হয়ে গেলাম। বললাম,—যাবো একদিন।

—একদিন নয়, রোববারেই আসুন।—কুমকুম সেই চোখে তাকালো যে চোখের চাউনি নেপোলীয়নেরও ওয়াটালু´।—বেশ, রোববারেই যাবো।—বললাম।

কর্নেল ব্রাগাঞ্জার কর্মজীবনে সেই প্রথম রোববার এল এক বোতল হুইস্কির মতো। উজ্জ্বল, রক্তিম, নেশালু।

—কি সাজই সেজেছিল সেদিন কুমকুম। সারা শরীরে অজস্র যৌবনের কি সমারোহ। তখন কি ছাই বুঝতে পারছিলাম নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে আমি এগিয়ে চলেছি একটি আণবিক বোমার দিকে। প্রতিটি রোমকূপের রোশনাই নয়, ক্যামোফ্লেজ বেয়নেট লুকনো, নিঃশ্বাসে বিষবাষ্প।

—অনেক গল্প করলাম। সিংহের গল্প, যুদ্ধের গল্প। আফ্রিকার বিচিত্র মানুষদের কাহিনী শুনল কুমকুম। পরম আগ্রহে জানতে চাইল যুদ্ধবিজ্ঞান।

—গুছিয়ে যুদ্ধপ্রক্রিয়া যখন শোনাচ্ছিলাম বুঝতেই পারি নি সে প্রক্রিয়া কুমকুম আমার ওপরই প্রয়োগ করে চলেছে।

—ইচ্ছা করে পিছু হটে তারপর কি করে সাঁড়াশী অভিযান করতে হয় যখন বললাম তখন কুমকুমের দুখানা হাত সাঁড়াশীর মতোই গলা জড়িয়ে ধরেছে আমার।

—এইবার সামনের ব্রিগেড নিশ্চিন্ত আক্রমণ করলেই শত্রুপক্ষ পরাজিত হবে।

—আমি শেষ করলাম। ততক্ষণে আমার ঠোঁটের ওপর কুমকুম নিশ্চিন্ত আক্রমণ করলে। কানের কাছে ওর আবেশ জড়ানো কণ্ঠস্বর বাজছিল নিশুতিরাতের হিংস্রপক্ষ বোম্বারের মতো। এতবড় নামজাদা যোদ্ধা আমি, আফ্রিকার যুদ্ধে কর্নেল হয়েছি, কিন্তু হেরে গেলাম ওর কাছে। কুমকুমের কাছে পরাজিত হলাম আমি। আমি কর্নেল ব্রাগাঞ্জা।

—সে পরাজয়ের খেসারৎ দেওয়া হল আমার বাকী কাহিনীর পটভূমি। তাই দিয়ে এলাম এখন এইমাত্র।—”

ব্রাগাঞ্জা তাকালেন আমার দিকে,—আরেক সিপ নিই?

আপত্তি করলাম না। ব্রাগাঞ্জা গ্লাস ভরলেন।

“এর অল্প কদিন বাদে আমি বদলি হলাম কোলকাতায়। সেখানে গিয়ে ভুলতে চেষ্টা করলাম কুমকুমের কথা।

—একটি রোববারের বিকেলকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই একটি ভুলকে স্মৃতির আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার।

—ভুলেই যেতাম হয়তো, কিন্তু ভুলতে পারলাম না। সেদিনের তারিখটা আজও মনে আছে, ১৮ই জুন। সেদিন, যেদিন চিঠি পেলাম কুমকুমের। চিঠি তো নয়, তরল এসিড নিয়েছি হাতে।

—‘তোমার ওপর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। তুমি আমার জীবনে প্রথমে এসেছিলে সত্যিকারের পুরুষের মতো। তোমার মতো বীর তোমার মত রূপবান পিতার সন্তান আমার গর্ভে, এরচেয়ে গর্ব আর কিসে হতে পারে বলো। এখন চার মাস চল্‌ছে। তোমার প্রেমের জীবন্ত রূপ দেখতে আরো দীর্ঘ ছ’মাস অপেক্ষা করতে হবে আমার। ডাক্তার দেখাচ্ছি। শরীরের বিশেষ যত্ন নিতে বলেছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, কিছু টাকা পাঠাবে? ভুল বুঝো না। ইতি—তোমার কুমকুম।’

—সত্যি বলছি, একবার মনে হয়েছিল আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই আমার। কিন্তু পারলাম না। পাগলের মতো কয়েকদিন কাটালাম। মেজাজ দেখে অধস্তন উর্ধ্বতন কর্মীরা, ছেলেমেয়ে বৌ সবাই ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। পাঁচদিনের দিনে টেলিগ্রাম মনি-অর্ডার করে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

—একবার ইচ্ছে হয়েছিল লিখি অপারেশান করে এই কুৎসিত সম্ভাবনার শেকড়ই উপড়ে ফেলতে। কিন্তু তাও পারলাম না।

—তারপর? তারপর দীর্ঘ আর আতঙ্কিত ছ’বছরের আলাদা কাহিনী।

—প্রায়ই লজ্জার মাথা খেয়ে টাকা চেয়ে পাঠাতো কুমকুম। আমিও পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম।

—বলা বাহুল্য এই সমস্ত চিঠিপত্র আমার অফিসের ঠিকানায় আসত। টাকা পাঠাতাম আমি নিজে পোস্ট অফিসে গিয়ে।

একেই বলে বোধ হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

একদিন চিঠি পেলাম আমার মেয়ে হয়েছে। কুমকুমের ফিল্মে কাজ ততদিনে বন্ধ। বয়েসও হয়েছে ওর। সুতরাং বলতে গেলে মা মেয়ের পুরো দায়িত্বই আমার ঘাড়ে এসে গেল।

—মেয়ে সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করে চিঠি দিতে শুরু করল ও। হুবহু আমার মুখ বসানো নাকি। হাসিটা বাপের মতো। চুল পেয়েছে মায়ের। নাম রেখেছি নবীন। জান কাল বলছিল পাপ্.পা। তোমার মেয়ে তো! মা'র আগে বাপের নামই মনে পড়ে। সেদিন উপুড় হয়ে শুয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে একদিন তো পড়েই যাচ্ছিল। কি দস্যি হয়েছে।

বড় হয়ে তোমার চেয়ে বড় জেনারেল হবে ও। ভারতবর্ষের প্রথম মেয়ে জেনারেল।—ইত্যাদি ইত্যাদি।

—প্রথম হিংস্র একটা রাগ হতো, ঘৃণা হতো। কিন্তু কুমকুমের চিঠির ভাষায় মেয়েটার ওপর কেমন করুণা জন্মাল আমার। যাই হোক আমারই মেয়ে ও। আমার রক্তের সম্পর্ক ওর সঙ্গে।

—তখনও বুঝতে পারি নি কুমকুম আমার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যায় কত বেশী পারদর্শিনী।

—সেটা বুঝেছি আজ। এই খানিক আগে।

—কুমকুম মেয়ে নিয়ে মহাবালেশ্বরে থাকে। বোম্বে বা পুণায় ওর কাজ নেই আর সন্তান সম্পর্কে নূতন স্ক্যাণ্ডাল এড়ানোও দরকার তাই নবীন জন্মাবার আগে থেকেই ও মহাবালেশ্বর চলে গেল। বাচ্চা হয়েছে খবরটা জানতে সবাই ঠিকই পেরেছিল। কিন্তু বাপের নাম জানবার কৌতূহল হয় নি কারুর। কুমকুমের মতো মেয়ের পক্ষে এই ধরনের পিতৃহীন সন্তান জন্ম দেওয়া অস্বাভাবিক নয় কিছু। বরঞ্চ

এ সত্যে সন্দেহ করাটাই অস্বাভাবিক। যাক এসব। গত বছর আমি বোম্বে এলাম ফের।

—কুমকুম দেখা করল বাচ্চা নিয়ে হোটেলে। মেয়েটি ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে সত্যি। মায়া না হয়ে যায় না। কিন্তু দেখতেই বুকটা ধক্ করে উঠল। ফুলের মতো এই শিশুটা জানে না ও আমার কতবড় পাপের চিহ্ন।

—তারপর আপনি জানেন গত সপ্তাহে আমার একটা হার্ট এটাক হয়েছে। ব্লাড প্রেসারে ভুগছি অনেক কাল, হার্টও দুর্বল হয়ে গেছে।

—সে হার্ট এটাকের খবর কাগজে বেরিয়েছে। শুনে কাল মহাবালেশ্বর থেকে মেয়ে নিয়ে ছুটে এসেছে কুমকুম।

—অ্যাম্বাসেডার হোটেলে মীট করেছি ওকে। কুমকুম আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেই চলে এল মূল বক্তব্যে। বলল,—ভগবান না করুন কিছু হয়, কিন্তু তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে বলছি, তুমি লেখাপড়া করে দাও।

—লেখাপড়া করে দেব? কি লেখাপড়া করে দেবো?

—তোমার পুণার নতুন বাড়ি। পুণার নতুন বাড়িটা আর অন্তত: পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি নবীনের নামে লিখে দাও। মা হয়ে আমি ওর ভবিষ্যৎ না ভেবে পারি না। বাপের দায়িত্বও আছে। তোমার মেয়ের সিকিউরিটি—

—কিন্তু কুমকুম, কি বলছ পাগলের মতো। আমার ছেলেমেয়ে স্ত্রী তাঁদের জন্যে বাড়ি করেছি আমি, তাদের প্রতি কর্তব্য নেই আমার? জমানো টাকা তাদের সিকিউরিটির জন্য—

বাধা দিল কুমকুম,—তুমি রাজী কি রাজী নও সোজা ভাষায় বলো।—ওর গলার স্বর কঠিন।

—এ কিছুতেই হতে পারে না।—আমি দৃঢ় কণ্ঠে জানালাম,—কিছুতেই না।

—সেটা তোমার পক্ষে কি ভালো হবে? তোমার স্ত্রী শুনেছি ভালো মানুষ। তার কাছে যদি যাই আমার আবেদন নিয়ে।

—কুমকুম।—স্থানকাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি,—একি বলছ তুমি ?

—উত্তেজিত হয়ো না, ঠিকই বলছি। প্রয়োজন হলে মেয়ের স্বার্থে আমাকে যেতেই হবে তাঁর কাছে। স্বামীর এ পরিচয়ে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

—সব পরিষ্কার হয়ে গেল জলের মতো। সন্তানের টোপ ফেলে আমার সবস্ব গ্রাস করতে চাইছে কুমকুম। আমার এতদিনের উপার্জিত অর্থ চরিত্র দুয়েরই মারণাস্ত্র ওর কাছে। দু'চোখে অন্ধকার নেমে এল আমার। দু'হাতে মুখ ঢেকে বললাম,—তুমি এত নীচ কুমকুম, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ।

—জবাব দিল না ও। হাসল। জয়ের হাসি আর ঠিক সেই সময়ে বাইরে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষার আওয়াজ এলো আর সঙ্গে সঙ্গে শিশুকণ্ঠের মর্মান্তিক আর্তনাদ। লাফিয়ে উঠলাম দুজনই, .বান, নবীন কোথায় ? এই খানিক আগে এখানে বসে ছিল। ঝড়ের মতো ছুটে গেলাম। নবীনের রক্তাক্ত দেহ ঘিরে ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে।

—কে, ই, এম হাসপাতালে পৌঁছুতে লাগল পনেরো মিনিট। পনেরো মিনিট তো নয়, পনেরো যুগ। ডাক্তার নিয়ে গেল এমার্জেন্সী বেড-এ।

—বাইরে চুপচাপ বসে রইলাম আমরা দু'জন। আমি আর কুমকুম। নিঃশব্দে। খানিকবাদে ডাক্তার এসে বললেন,—এখনো কিছু বলা মুশকিল। তবে রক্ত চাই। আপনারা নিজেদের ব্লাড টাইপ জানেন ?

আমি বললাম জানি,—এ' পজিটিভ।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন,—মেয়েটির ব্লাড ও, আর, এইচ, নেগেটিভ, মায়ের রক্তই ট্রাই করতে হবে, আপনার চলবে না।

—ডাক্তার আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন কুমকুমকে নিয়ে।

—এ দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝলাম। মেঘের আড়াল কেটে গেল, সূর্য দেখতে পেলাম। এ যে কতবড় আবিষ্কার আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

—বুঝলাম, নবীন আমার মেয়েই নয়। আমার রক্তের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

—সমস্ত শরীর রাগে জ্বলতে লাগল বারুদের মতো। কি কুৎসিত কি জঘন্য মেয়েমানুষ কুমকুম। অসহ্য। বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে চলে এলাম।

অ্যাম্বেসেডার হোটেলের কামরায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। কুমকুম এলো। চোরের মতো। এসেই তাড়াতাড়ি সুটকেশ গুছোতে শুরু করলো ও। বুঝলাম পালাতে চায়। পিঠের ওপর রিভালবার রেখে বললাম,—তুমি জানতে এ আমার মেয়ে নয়?

—একটু হকচকিয়েই স্থির হয়ে গেল ও। বরফকণ্ঠে জবাব দিল,—জানতাম। তুমি আসবার আগেই আমি গর্ভবতী ছিলাম। মার হীরের নেকলেস চুরি করে আমার কাছে রাত কাটাতে এসেছিল একটা আঠারো বছরের কলেজের ছোকরা। নবীনের বাপ সে। তার নাম আমি জানিনে।

—তবে কেন, কেন জেনেশুনে তুমি আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে চলেছিলে, কেন?

—টাকার জন্য। কিন্তু এতবড় আয়োজন সব ভেঙে গেল। জিতে গেলে শেষ পর্যন্ত। দেরি করছ কেন, মারো মারো গুলি। তুমি না মস্ত কর্নেল, শত্রুকে হাতে পেয়ে দেরি করছ কেন?

—আমি অসহায় জীবকে গুলি করব না। আমার হাতে মরবার মতো পুণ্যবতী নও তুমি। এক সেকেণ্ড দাঁড়াল ও, তারপর দৌড়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

—বসে বসে এক বোতল জিন খেলাম। তারপর কে, ই, এম, এ ফোন করলাম। ওরা ডেকে পাঠালো,—এক্ষুনি আসুন।

—ডেড। নবীনের মৃতদেহ। ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা

চোখ বুজে শুয়ে আছে। মায়ের রক্ত বাঁচাতে পারে নি ওকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ জলে ভরে এল। কেন এত জল, কে বলবে।

—মনস্থির করে ফেললাম। কিছুতেই না।

—এরকম অপূর্ব সুন্দর, নিষ্পাপ শিশু মৃত্যুর পরও কোন পরিচয় নিয়ে যাবে না, এ অসম্ভব। এ অবিচার। জীবনে যে স্বীকৃতি পেল না, মরণের পরও পাবে না? পিতৃহীন জারজ সন্তানের কলঙ্ক থাকবে ওর মৃত্যুকে জড়িয়ে। কিছুতেই না।

—যা এড়াবার জন্য দীর্ঘ ছ'বছর আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, আমি নিজের হাতে তাই লিখে দিয়ে এলাম। লিখে দিলাম মৃতা শিশুটির নাম—নরীন ব্রাগাঞ্জা, বাবার নাম—ফিলিপ ব্রাগাঞ্জা।"

কর্নেল এবার গ্লাসে ঢাললেন না। বোতলটি তুলেই উপুড় করে ধরলেন মুখের ওপর। কষ বেয়ে হুইস্কির ফেনা গড়াতে লাগল। মনে হচ্ছিল হুইস্কি নয়, কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে যে রক্তের সঙ্গে নরীনের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই।

চিঠিটা অনেক পোস্টঅফিসের ছাপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ডেড্ লেটার অফিসে চলে এলো। না, চেষ্টা সত্বেও উদ্দিষ্ট লোককে খুঁজে পাওয়া গেল না, চিঠিটার মধ্যে প্রেরকের ঠিকানাও ছিল না যে ফেরত যাবে। শেষ পর্যন্ত ওরা নষ্ট করেই ফেলল। বক্তব্যের করুণ আবেদনে ওদের বেদনাবোধ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

বক্তব্যটা এই :

'ভাই অলক, এই চিঠি পাওয়ামাত্র তুমি চলে এসো। তোমাকে ডাকবার মুখ আমার নেই, সে অধিকার আমি নিজেই হারিয়েছি। কিন্তু তোমার সুধাদির মুখ চেয়ে তুমি এসো। তুমি না এলে ও বাঁচবে না। সব অপরাধ মার্জনা করে তুমি চলে এসো ভাই। মনে রেখো, সুধাদি তোমাকে যে আঘাত দিয়েছে, সেটা আমার ওপর অভিমান করেই। যত আঘাত ও তোমাকে দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে নিজে। তোমার বোঝবার ক্ষমতা আছে তাই বিশ্বাস করি সব বুঝে তুমি আসবে। তোমার সুধাদি শয্যাশায়ী, ওষুধপথ্য কিছু খাচ্ছে না। খালি তোমার নাম করছে, তুমি না এলে কিছু মুখে তুলবে না। 'অলককে ডেকে পাঠাও, ও ভুল বুঝেছে আমাকে। ওকে সব না বলে মরে আমি শান্তি পাব না। ওকে জানাতেই হবে কোনদিনওকে ভুল বুঝি নি, ওকে জানাতেই হবে।'— সব সময় ওর মুখে শুধু এই। পত্রপাঠ চলে এসো ভাই তোমার সুধাদিকে বাঁচাও।

ইতি গৌতম মিত্র।'

চিঠিটার ওপর পুণা পোস্টঅফিসের ছাপ দেখে শুধু এইটুকু

অনুমান করা চলে পুণাতে পোস্ট হয়েছে এটা। পুণা হচ্ছে প্রেরকের আবাসস্থল। কি ওই পর্যন্তই।

চিঠিটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। ডেড্ লেটারের শেষ স্বর্গ। ব্যর্থ প্রচেষ্টার অন্তিম সমাধি।

এই ডেড্ লেটারের ইতিহাস আমি লিখতে বসেছি। কি করে জানলাম? সদ্য আলাপ হয়েছে ডেড্ লেটার অফিসের ক্লার্ক সুধীন দত্তের সঙ্গে। গল্পচ্ছলে ওঁকে বলেছিলাম,—'কত বিচিত্র চিঠি পান, কত হাসিকান্না অশ্রু হয়তো এই সব গরঠিকানার চিঠিতে কবরিত হয়ে যায়। বলুন না দু'তিনটে চিঠির বক্তব্য, আমার গল্পের খোরাক হয়ে যাবে।'

সুধীনবাবু তিন চারটে চিঠির রহস্য বলেছিলেন আমাকে। এমনি বলতে বলতে তিন বছর আগে পাওয়া এই চিঠিটার কথা উল্লেখ করেন উনি। শুনে আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম। কেননা, অলকের পুরো কাহিনী আমি জানি। আমি জানি এ চিঠি যথা সময়ে পেলে অলক হয়তো হয়তো—

কিন্তু এখন আর ওকে জানিয়ে লাভ নেই, বড় দেরি হয়ে গেছে। অলক যে এখন,—

আচ্ছা, গোড়া থেকেই শুনুন—

পুণা স্টেশনে নেমে কেমন অসহায় মনে হল নিজেকে। হবে না? কোলকাতার বাইরে কি অলক পা দিয়েছে এর আগে? বাসে উঠে যাওয়া অসুবিধে। বাঃ, এগুলো তো বেশ। মোটর-সাইকেল রিক্শা। এতে চেপেই যাওয়া যাক, অলক ভাবল। তারপর ভাঙা হিন্দীতে কোনমতে বোঝালো ওকে ঠিকানা। লক্ষ্মী রোড দিয়ে গেলে কলেজ কি পড়ে একটা, তার পাশের গলি দিয়ে গিয়ে পৌঁছবে পার্বতী মন্দিরের নিচে। মাসিমা ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিলেন সুধাদির, মেসোমশাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রাস্তাঘাট। নিজে যা বুঝেছে তাই

যথাসাধ্য স্কুটার চালককে বুঝিয়ে দিল অলক। তারপর ছোট্ট সুটকেসটা নিয়ে গিয়ে দুরুদুরু বুকে বসল ভেতরে। সুধাদি চিনতে পারবেন তো? আর সুধাদির বর গৌতমদা? নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। পাড়ার সম্পর্কে দিদি হলে কি হবে, সুধাদির বিয়েতে কে এমন খেটে ছিল অলকের মতো? সুধাদির জামাইবাবু যে অত কর্মী লোক, তিনিও তারিফ করেছিলেন অলককে। বলেছিলেন,—কে বলেছে সুধার ভাই নেই, এই শালা রয়েছে জবরদস্ত। কি হে অলক, শালা বনতে এসেছো অ্যাঁ, হাঃ হাঃ। কিন্তু না, সুধাদির ঘাড়ে বেশীদিন থাকবে না অলক। পরিতোষ যে কাজ দেবে বলেছে, সে কাজ শুরু করেই পরিতোষ মারফত নিজে কোন মেস বোর্ডিংএ উঠে যাবে। শুধু দশ পনেরো দিন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক দরজায়ই টোকা মারল অলক। দরজা খুলে দিলেন সুধাদি স্বয়ং। এক মুহূর্ত, তারপর হাসিমুখে চেঁচিয়ে উঠলেন সুধাদি,—আরে অলক না?

টিপ করে প্রণাম করলে অলক,—হ্যাঁ সুধাদি, আমি।

—ভেতরে এসো,—সুধাদি ঘরে ডাকলেন অলককে। একটা ফুটফুটে ফ্রক পরা মেয়ে এসে সুধাদির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

—আরে রুমি, অত লজ্জা কিসের, অলক মামা তোর।

গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করল অলক,—গৌতমদা কোথায়?

—ও বাজারে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে। তুমি ততক্ষণে কাপড়জামা ছেড়ে নেয়ে নাও তো।

—আরে,—হঠাৎ অলকের মাথার দিকে নজর পড়ল সুধাদির,—মাথাটা ওরকম কাকের বাসা করে রেখেছো কেন? সময় মতো চুলও ছাঁটতে পারো না? ছেলেদের মাথায় চুলের ঝোপ আমি দু চোখ দেখতে পারি না। যাক, আজ অনেক ট্রেন জার্নি করে এসেছো আজ থাক। কাল সকালে উঠেই প্রথম কাজ চুল ছাঁটবে, বুঝেছো?

অলক দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো। তারপর মুখ তুলে কান্না

ভেজা কণ্ঠে বলল,—সুধাদি। দু' চোখ বেয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ল সুধাদি অবাক। ওকি, ওকি অলক, কাঁদছ কেন অলক,—অপ্রস্তুত আর কাকে বলে।

—জানো সুধাদি, আমার দিদি, আমার দিদি ঠিক এমনি করেই বলত আমাকে। চুল বড় হলেই আমার জ্বর হয় তাই দিদি চুল বড় হতে না হতেই ধমকাতো। বলত চুল ছেঁটে না এলে খেতে পাবে না। দিদি মারা যাওয়ার পর একথা আর কেউ বলে নি কোনদিন। আর আজ তুমি—বলতে বলতে আবার টলটল করে উঠল অলকের চোখ।

সুধাদি সামনে এসে দু'হাতে হাত চেপে ধরল ওর,—তাতে কাঁদবার কি হয়েছে অলক। আমিও তো তোমার দিদি। তোমার হারানো দিদি মনে করো অলক। কেঁদো না, লক্ষ্মী ভাই আমার, যাও শীগগির আগে চান করে এসো। যাও—

ফিক করে হেসে ফেলল অলক,—যাই, যাই সুধাদি—বলল ও।

—বেচারা,—বলল সুধাদি, পাগল ছেলে। সুধাদির দু চোখে অজস্র স্নেহের জোনাকি।

সময়মতো অলক অবিশ্যি বলবার চেষ্টা করেছিল।

—সুধাদি, পরিতোষ বলেছে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে মেসে। এখন তো—কিন্তু আর এগোতে পারে নি ও।

—এরপর আর কোনদিন যদি তোমার মুখে যাবার কথা শুনি তবে জেনো আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকব,—বলেছিল সুধাদি,—কি নিষ্ঠুর ছেলে বাবা, আমাকে ছেড়ে অমনি চলে যাবে তুমি? এই তোমার দিদি হয়েছি আমি! বলতে বলতে মুহূর্তে সুধাদির চোখও ছলছল করে উঠল।—সত্যিকারের দিদি নই বলেই আজ তুমি অমন কথা মুখে আনতে পারছ অলক।

—সুধাদি, সুধাদি,—আর বলব না আমি, তোমাকে ছেড়ে যাবো না সুধাদি।

—দিব্যি করে বলো।

—দিব্যি করছি।

—আমি যতদিন বেঁচে থাকবো তুমি আমার কাছে থাকবে।

—থাকব।

হাসলেন সুধাদি—লক্ষ্মী ছেলে। বোস, তরকারি চাপিয়ে এসেছি, ধরে গেল বোধ হয়।

আনন্দে অলকের কান্না পায়। অলকের কাছে এ যে কত বড় পাওয়া সে কথা তো কেউ বুঝবে না। মা মারা গেছেন অলক তখন শিশু, মায়ের স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছে দিদি যে অলকের চেয়ে ছ' বছরের বড়। সে দিদি যখন বিয়ের পর দু'বছরের মধ্যে মারা যায় অলকের সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল তখন। অলক হচ্ছে সে জগতের ছেলে যারা স্নেহের কোন ছায়া না পেলে যেমন বাঁচতে পারে না। স্নেহের কাঙাল হৃদয় তারপর থেকেই নিষ্ঠুর পৃথিবীর পদে পদে হোঁচট খেয়েছে। জীবনযুদ্ধে নেমে ও দেখল পৃথিবীটা কি নিদারুণ মরুভূমি। বাড়ি ফিরতে দেরি করলে উদ্বিগ্ন হয় না কেউ। অসুস্থ হলে তপ্ত কপাল পিপাসী হয়ে থাকে, তাতে নামে না শুশ্রূষার কোন নারীর কোমল হাতের স্পর্শসলিল, ভালোমন্দ খাবার জন্য কারুর মাথার দিব্যি নেই, শোকে দুঃখে হাসিতে খুশিতে অংশীদার নেই কেউ, বড় হয়ে উঠুক এই শুভাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেউ প্রণাম জানায় না তুলসীমূলে, যাত্রা শুভ হোক কামনা করে ধানদূর্বা মাথায় ছোঁয়াবে এমন একটি কল্যাণীমূর্তি নেই ওর আশেপাশে।

এমনি একক তৃষ্ণার্ত জীবনে সুধাদি এসেছেন। রুক্ষ মরুভূমির বুকে যেন নেমে এসেছে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী। উঃ, অলকের মনে হচ্ছে আজ সে একা নয়। তার আকাশে আজ স্নেহের শুকতারা জ্বলে উঠেছে। সে সুধাদি। মনে হচ্ছে তার জীবনের মূল্য আছে, মানে আছে। মনে হচ্ছে তার ভালোমন্দ আজ তার একার নয়, সুধাদিও তার শরিক। আর সুধাদির জন্য জীবনে দাঁড়াতে হবে তাকে, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। সবল সুস্থ মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অলক।

দু'দিন পর ওকে আর চেনবার জো থাকে না। এ অন্য অলক। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, চান খাওয়ার সময় অসময় নেই, পোশাক-আশাকের ধোয়া কাচা নেই, সেই ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে অলক মরে গেছে। সারাদিন একমাথা চুল আর একমুখ দাড়ি নিয়ে যে ছেলে বিমর্ষ হয়ে থাকত সে ছেলের এ এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

ঘষামাজা ঝকেঝকে চেহারা হয়েছে অলকের। আর সবসময়ই অনর্গল বকে বকে হেসে ছুটোপুটি খাচ্ছে আজকাল। এত হাসতে পারে অলক, আর হাসাতে!

সুধাদিও শেষ পর্যন্ত বললেন,—ব্যাস, এইবার যাও অলক, নইলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাব আমি।

কোথাও থেকে ঘুরে এসে, অলক সোজা রান্নাঘরে বসে। সুধাদি হয়তো তরকারি কুটছেন বা ফ্যান গালছেন ভাতের। তারপর শুরু হয় কথা।

কোনদিন অলক ছোটবেলার গল্প শোনায় সুধাদিকে।—জানো সুধাদি, একদিন চড়কের মেলায় গেছি কাঞ্চনপুরে। হঠাৎ সার্কাসের বাঘটা খাঁচা থেকে এক লাফে বাইরে—

—বাইরে? সুধাদির সুরে ভয়ের কাঁটা। জমে বসে, কোন সময় মাছের তরকারিতে নুন হয়েছে কিনা চাখতে চাখতে বা গরম গরম ডিমভাজা খেতে খেতে গল্প বলে যায় অলক, মনোযোগী ছাত্রীর মতো কৌতূহলী হয়ে শুনে যান সুধাদি। কোনদিন আবার উল্টোটা হয়। গল্প বলেন সুধাদি আর শ্রোতা হয় অলক। নিজের শ্বশুরবাড়ির গল্প বলেন সুধাদি, বা ননদের শ্বশুরবাড়ির সেই ভূত দেখার গল্প।

—নন্দাকে তো তুমি একবার দেখেছিলে, আমার ননদ নন্দা। একবার আমার সঙ্গে কোলকাতায় গিয়েছিল ও। সেই নন্দার শ্বশুরবাড়ি খুলনায়। ওদের গ্রামের নাম ভূষণা। ওদের বাড়িটা খুব পুরনো আর বাড়ির পেছনেই মস্ত এক বাঁশঝাড়। সেদিন রাত্তিরবেলা নন্দা পুকুর ঘাটে গেছে বাসন ধুতে। একাই গেছে ও।

হঠাৎ এলোমেলো বাতাসে দপ করে কুপীটা নিভে গেল। আর চোখ তুলে তাকাতেই দেখল নন্দা, বাঁশঝাড়ের নিচে সাদা কাপড় পরা কি একটা দাঁড়িয়ে। আব যেই নন্দা উঠতে যাবে অমনি করল কি—

গা ছমছম করে অলকের। সুধাদি এমন বর্ণনা করেন যে মনে হয় এতটুকু মিথ্যে নেই। গল্প করতে করতে কোনদিন তরকারি পুড়ে যায়, কোনদিন রুমি খিদের জন্য কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। সুধাদির হুঁশ নেই।

এমনি চলল। অলক সুধাদি বলতে অজ্ঞান আর সুধাদি অলকের জন্য পাগল। একদিন যদি অলক দেরি করে ফেরে তো সুধাদি চিন্তায় অস্থির হয়ে যান, আর একদিন যদি সামান্য মাথা ধরায় সুধাদি বিছানা নেন, অলকের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সিনেমা থিয়েটার দেখা, কাপড়-জামা কেনাকাটার জন্য সুধাদি একা বা সুধাদি আর গৌতমদা বেরোন না, সঙ্গে অলক থাকবেই।

সুধাদি যখন বলেন,—দেখো তো অলক এই শাড়িটা কেমন ? বা রুমির ফ্রকের জন্যে এই ছিটটা পছন্দ হয় কিনা ?

তখন আনন্দে কান্না পায় অলকের। তার কথারও কেউ মূল্য দেবে, তার পছন্দ অপছন্দ শুধোবে এমন কথা ছ'মাস আগে ভাবতেও পারত না। কিন্তু আজ সে পূর্ণ, সে সুখী।

নিজেকে সুখীই ভেবেছিল অলক। জানতেও পারে নি ইতিমধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে আকাশ কখন ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবকাশ পায়নি ও, তাই টের পেল তখন যখন বিদ্যুৎ চমকালো। কিন্তু তখন আর বজ্রকে এড়াবার উপায় ছিল না।

গৌতমদা—

ইংরেজীর অধ্যাপক গৌতম মিত্র ইংরেজী যত পড়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী পড়েছেন সাইকোলজী আর সাইকোলজী যত পড়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী পড়েছেন সেক্সোলজী।

তাই যত পাণ্ডিত্য ছিল তার চেয়ে বেশী পাণ্ডিত্যের মুখোশ পরে থাকতেন, যত গাম্ভীর্য ছিল চারিত্রিক, তার চেয়ে বেশী গম্ভীর হয়ে থাকতেন। রাসভারী মানুষকে বড় ভয় অলকের। গৌতমদা যখন বাড়িতে থাকতেন কোন মোটাসোটা বইয়ে মুখ ঢেকে, অলক সে সময়টুকু নিঃশব্দে কাটাতো, ভয় পাছে বিরক্ত হন গৌতমদা, গম্ভীর মুখে আর এক পোঁচ গাম্ভীর্যের রঙ চড়ান।

সেটা ছিল রোববারের দুপুর।

অলক পরিতোষের সঙ্গে সিংহগড়ে শিবাজীর কেল্লা দেখতে যাবে বলে বেরিয়েছিল কিন্তু ফিরে আসতে হল। কি এক জরুরী কাজে পরিতোষ খাণ্ডালা গেছে। লিখে গেছে সিংহগড় যাওয়ার প্ল্যান আগামী রোববারের জন্য মুলতুবী রইল। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেল গৌতমদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। গৌতমদাকে কোনদিন উত্তেজিত হতে দেখে নি অলক। আর সুধাদির গলাটা কেমন কান্না-কান্না। কি হল? স্বামী স্ত্রীর কোন ভুল বোঝাবুঝি? দাম্পত্য কলহ? কিন্তু আজ দু'বছরের মধ্যে একদিনও তো তা দেখে নি অলক। দুরুদুরু করে উঠল বুক। কান পাতে ও। কিন্তু না, বিশেষ কিছু শুনতে পেল না ও। শুধু প্রচণ্ড এক চপেটাঘাতের আওয়াজ শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সুধাদির আর্তনাদ, তুমি আমাকে মারলে?

সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেল অলকের। ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে গৌতমদার, প্রফেসর গৌতম মিত্রের, যে ইংরেজীর অধ্যাপক, আর ইংরেজীর চেয়ে বেশী পড়েছে সাইকোলজী আর সাইকোলজীর চেয়ে সেক্সোলজী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করল না অলক। চোরের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

পেশোয়া পার্কের একটা নির্জন বেঞ্চে সারাক্ষণ বসে রইল অলক। ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরল সন্ধ্যাবেলা।

পার্বতী মন্দিরের সিঁড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। ঘষা পয়সার মতো তামাটে আকাশ স্লেট-কালো ওড়নায় ঢাকা পড়েছে। কয়েকটা

তারা ইতিমধ্যে চোখ পিটপিট করছে। অলকের মনে হল যেন রুমির কয়েকটা চোখ চুরি করে কে আকাশের গায়ে বসিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আকাশের তারায় মন নেই অলকের। বিষণ্ণ মনে জেগে উঠল সুধাদির করুণ কণ্ঠস্বর,—তুমি আমাকে মারলে? কেন, কেন গৌতমদা গায়ে হাত তুললেন সুধাদির।

ভাবতে ভাবতে অবাক লাগে। গৌতমদার মতো শিক্ষিত লোক শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর গায়ে হাত তুললেন।

গেট খুলেই চোখ পড়ল সুধাদির ওপর। বারান্দার সিঁড়িতে মাথা নীচু করে পাষাণ প্রতিমার মতো বসে আছেন সুধাদি। নিঃশব্দে পাশে গিয়ে বসল অলক।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মুখ তুললেন সুধাদি, আর মুখ তুলতেই চোখ পড়ল অলকের দিকে।

—আরে, কতক্ষণ এসেছো অলক?

—অনেকক্ষণ। কিন্তু তুমি এমন কি ভাবছিলে সুধাদি?

এক মুহূর্তের জন্য মুখটা বুঝি সাদা হয়ে গেল। কিন্তু সে শুধু এক মহূর্তের জন্যেই। তারপরই করুণ মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বললেন,—কি আবার ভাবব। ভাবছিলাম তোমার কথাই। সেই কখন বেরিয়েছ, ফেরার নাম নেই!

—মিথ্যে কথা। কি হয়েছে বল-না সুধাদি।

সুধাদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন,—তোমার সুধাদি যদি মারাযায় তবে তোমার খুব কষ্ট হবে, না অলক?

—সুধাদি,—আর্দ্র কণ্ঠে নামটা একবার উচ্চারণ করল অলক।

—ঐ দেখো, বলতে না বলতে চোখ কেমন ছলছল করে উঠল। ঠাট্টা বোঝ না। চলো—হাত ধরে টানলেন সুধাদি,—এসো ঘরে, মুখ শুকিয়ে তো আমসী হয়ে গেছে, কিছু খাবে চলো।

অলকের অবিশ্যি চোখ এড়াল না।

আজকাল গৌতমদা কেমন বদলে যাচ্ছেন। আগে যাও বা

দু' চারটে কথা বলতেন অলকের সঙ্গে, এখন তাও বন্ধ। শুধু মাঝে মাঝে কেমন মর্মভেদী চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন অলককে। বিকেলে লাইব্রেরী যাওয়া বন্ধ। সময়ে অসময়ে বাড়িতে ফেরেন নিঃশব্দে। হয়তো রান্নাঘরে বসে গল্প করছে অলক আর সুধাদি, অনেকক্ষণ বাদে সুধাদি ঘরে ঢুকে দেখলেন খাটে চুপ করে শুয়ে আছেন গৌতমদা। সুধাদি অবাক,—একি, কখন এলে?

গৌতমদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেন,—অনেকক্ষণ।

—তা আমাকে ডাকোনি কেন, মুখ শুকনো করে শুয়ে পড়লে যে?

—দেখলাম তুমি ব্যস্ত আছো।—সাপ যদি কথা বলতে পারতো তবে বোধ হয় এই সুরেই বলতো।

—মানে?—সুধাদি পাথর।

—মানেটাই তো আমি খোঁজবার চেষ্টা করছি।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন সুধাদি।

অলক শোনে আর বিমূঢ় হয়ে যায়। ও বুঝতেই পারে না কি ব্যাপার। কেন বাড়ির আবহাওয়া এমন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

দিন দিন গৌতমদার চেহারা পাল্টাতে লাগল।

যখন বাড়ি ফিরবার কথা ফেরেন না, যখন ফেরবার কথা নয় ফিরে আসেন। রুমিকে অনাবশ্যক মারেন, সুধাদিকে চোখ রাঙান, আর অলকের সঙ্গে নিজে তো কথা বলেনই না, অলক কিছু জিজ্ঞেস করলেও জবাব দেন না।

তারপর চূড়ান্ত হল একদিন।

অলকের হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। সামান্য জ্বর। এনাসিন খেয়ে শুয়েছিল ও। যদিও সুধাদির ব্যস্ততার সীমা নেই।

বিকেলবেলা হঠাৎ দেখল অলক, গৌতমদা ছোট একটা সুটকেস নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। খানিকবাদে সুধাদি এক গ্লাস হরলিক্স নিয়ে আসতেই প্রশ্ন করল অলক,—গৌতমদা কোথায় গেলেন সুধাদি?

—ওর এক বন্ধুর বিয়েতে গেল বোম্বে। কাল সকালে আসবে। নাও ঢক ঢক করে হরলিকৃসটা খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী ছেলের মতো।

—অতোখানি,—মিনমিনে আপত্তি জানায় অলক।

—কোন কথা নয়। দশ গুনতে গুনতে ঢকঢক শেষ হওয়া চাই। নইলে কচি খোকার মতো ঝিনুক দিয়ে জিভ চেপে খাইয়ে দেবো বলছি।

একান্ত বাধ্য ছেলের মতো খেয়ে নিল অলক।

রাত্তির তখন অনেক হবে।

আধঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখছিল অলক। ও দেখছিল ও আর সুধাদি গাড়ি করে বোম্বে যাচ্ছে। গাড়ি ড্রাইভ করছে গৌতমদা। গাড়ি তখন ঘাটস্-এর ওপরে। যেখানে অল্পদূর গিয়ে হেয়ার পিন টার্নিং হয়েছে সেই বিপদসঙ্কুল পথে হঠাৎ গৌতমদা গাড়ির স্পীড বাড়াতে শুরু করলে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—

—ওকি করছ, ওকি করছ—চেঁচাচ্ছেন সুধাদি। কিন্তু গৌতমদার হুঁশ নেই। একবার স্কিড করলেই পনেরো শ' ফুট নিচে।

হঠাৎ গাড়িটা ছিটকে বেরিয়ে গেল রাস্তা থেকে শূন্যে। নিচে সুগভীর খাদ। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল অলক,—সুধাদি।

পাশের ঘরে মেয়ে নিয়ে শুয়েছিলেন সুধাদি। অলকের আর্তকণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে দৌড়ে চলে এলেন এ ঘরে,—কি হয়েছে অলক, চেঁচিয়ে উঠলে যে?

—তুমি কোথায় সুধাদি?—হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে অলক। সুধাদি দৌড়ে যেতেই দু' হাতে জড়িয়ে ধরে অলক।

—উঃ, আমি যেন দেখলাম তুমি মরে যাচ্ছো।

—পাগল ছেলে, স্বপ্ন দেখে কেমন করছে দেখো। এই তো আমি। তোমার মতো ভাইকে ফেলে আমি মরতে পারি কখনো?

আলগোছে পিঠে হাত বোলাতে থাকেন সুধাদি—ইস, এখনো ছেলেটা কেমন কাঁপছে দেখো।—আর ঠিক তক্ষুনি দরজায় ক্রুদ্ধ ঠকঠক শোনা গেল।

—কে ?—উঠে দরজার কাছে এগিয়ে যান সুধাদি।

—দরজা খোল।—গৌতমদার বিষাক্ত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিয়ে সুধাদি অবাক কণ্ঠে শুধোলেন, তুমি ?

—কেন,—চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন গৌতমদা,—খুব অসময়ে এসে পড়েছি বুঝি। sorry।

—ইতরের মতো কথা বলো না। হঠাৎ ক্ষিপ্তকণ্ঠে গর্জে উঠলেন সুধাদি।

—তবে কিসের মতো কথা বলব, ইয়ারের মতো ?

—জানোয়ার—বলে থপথপ পা ফেলে ঘরে চলে গেলেন সুধাদি।

—জানালা দিয়ে অন্ধকারে এমন জমাট লাগছিল সিনটা, আঃ, সো ড্রামাটিক। কয়েক পা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন গৌতমদা, তারপর ফিরে এলেন অলকের সামনে। এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন কি যেন, শুনতে পেল না অলক। ধীরে পায়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠে অলক দেখলে জ্বর সেরে গেছে। মনে মনে একটু ভেবে নিল অলক। তারপর উঠে একটা ব্যাগে কয়েকটা জামাকাপড় ভরতে লাগল নিঃশব্দে।

জুতোটা পরতে গিয়ে নজরে পড়ল মাঝের পর্দাটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন সুধাদি।

—কোথায় চললে ? সুধাদির কণ্ঠস্বরে কাল রাতের মেঘের এতটুকু বাষ্পও নেই।

—সুধাদি, পাঁচদিনের মতো আমাদের ল্যাবরেটরী বন্ধ থাকবে। ভাবছি পাঁচদিন বোম্বে বেড়িয়ে আসি। মাথা নীচু করে বলল অলক। মাথা তুলে তাকাতে পারছিল না ও।

—কোথায় উঠবে ?—শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সুধাদি।

—পরিতোষের দাদা থাকে সান্টাক্রুজে, এরোড্রামে কাজ করে। ওর বাসায় উঠব।

খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন সুধাদি। তারপর বললেন,—

সেই ভালো। ঘুরে এসো। মন ভালো হবে। কিন্তু পাঁচ দিনের জায়গায় ছ'দিন করে বোস না যেন।

—না সুধাদি।—একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করে অলক। সুধাদি তো বেশ স্বাভাবিক কথাই বলছেন। আশ্চর্য!

—আরেকটা কথা।

—বলো।

—বোম্বে গিয়েই প্রথম কাজ কি করছ?

—প্রথম, প্রথম একটা বই কিনব, "মুলারুজ"।

—না, প্রথমে একটা সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটবে। মাথাটার অবস্থা একবার দেখেছো? এবার চুল তোমার বড় হয়েছে বলেই জ্বর হয়েছিল। মনে করে চুল ছাঁটবে।

—ছাঁটব।

—প্রথমেই।

হেসে বলল অলক,—প্রথমেই। মনে হল, কালকের সমস্ত ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্ন। এই পাঁচদিন ঘুরে এলেই ও দেখবে সব যথাযথ হয়ে গেছে। গৌতমদা হেসে কথা বলবেন হয়তো, সুধাদি হয়তো গল্প করবেন আগেকার মতই।

কিন্তু ফিরে এসে—

এত বড় আঘাতের জন্য তৈরি ছিল না অলক। বাড়ি এসে ব্যাগটা নামিয়ে ও চুপি চুপি রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

—সুধাদি,—বোঁ করে এক পাক ঘুরে নিল অলক।—ব্যাস, খুশী তো? চুল ছাঁটা। দেখেছো?

কিন্তু একি, সুধাদির মুখটা অমন গম্ভীর কেন? হঠাৎ সুধাদি বলে উঠলেন,—অলক, পরিতোষ তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে বলেছিল না? দু'বছরের ওপর হয়ে গেল এখনো ও ব্যবস্থা করে উঠতে পারল না?

—সুধাদি,—চেঁচিয়ে উঠল অলক,—কি বলছ সুধাদি, আমি চলে যাবো এখান থেকে?

—পেছনে গমগম গলা বেজে উঠল গৌতমদার,—যাবে না? তুমি কি চিরদিন এখানে থাকতেই চাও নাকি?

—সুধাদি, —অলক দৌড়ে গিয়ে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি লাগাল সুধাদির,—এ সব কি সুধাদি, বলো কথা বলো সুধাদি।

—হ্যাঁ অলক, তুমি নিজের থাকবার ব্যবস্থা করো। আমরা তো অনেকদিন দেখেছি, এবার নিজের পথ নিজে দেখো তুমি।

—কেন, কেন তুমি—কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যায় অলকের গলা,—তুমি আমার দিদি, আর তুমি আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছ? কি করেছি আমি?

—তুমি যা করেছো তার চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। ভালোবাসতে তুমি ঠিকই অলক, তবে দিদির মতো নয়। আমি আগে জানলে অত বাড়তে পারতে না। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি তোমার চোখে কি ছিল, কি উদ্দেশ্য ছিল তোমার অমন অন্তরঙ্গতায়।

—থাক শুনতে চাই না আমি, শুনতে চাই না কিছু, আমি এখুনি যাচ্ছি। এক্ষুনি।—টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল অলকের চোখ দিয়ে। মাথা নীচু করে ও প্রণাম করতে এলো সুধাদিকে, কিন্তু সুধাদি পা সরিয়ে নিলেন, তারপর দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন?

পাথরের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অলক। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল।

সুধাদি তাকে এত কুৎসিত ভাবতে পারলেন!

নিঃশব্দে এসে সুটকেস গুছোতে লাগল। গুছিয়ে বেডিংটা বগলে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। গেট খুলে একবার পেছন দিকে তাকালো ও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন গৌতমদা। যিনি ইংরেজীর অধ্যাপকআর ইংরেজীর চেয়ে বেশী পড়েছেন সাইকোলজী আর সাইকোলজীর চেয়ে সেক্সোলজী। গৌতমদার চোখে যেন পৈশাচিক এক জয়ের উল্লাস নির্লিপ্তের চাদর মুড়ি দিয়ে বসে

আছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুধু বেরিয়ে এল অলকের বুক থেকে। তারপর টলতে টলতে ও নেমে এল রাস্তায়।

এই আকস্মিক আঘাতে একেবারেই ভেঙে পড়ল অলক। প্রায় মাথাই খারাপ হয়ে গেল ওর। পরিতোষের ওখানে উঠেও রোজ একটা করে চিঠি লিখতে শুরু করল সুধাদিকে।—'সুধাদি, একবার শুধু বলে দাও তুমি আমাকে ভুল বোঝ নি। আমি তোমাকে আর কোনদিন মুখ দেখাবো না, কোনদিন আসব না তোমার সামনে, একবার শুধু জানাও আমি খারাপ নই। আমাকে অত বড় মিথ্যা কলঙ্ক তুমি দিও না সুধাদি। লক্ষ্মী সুধাদি, জবাব দাও। নইলে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

কিন্তু কোন জবাব এল না সুধাদির কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত পুণার চাকরি ছেড়ে কোলকাতায় চলে এলো অলক। সেখান থেকেও অনেক চিঠি লিখল ও। জবাব পেল না। ক্রমে ওর চেহারা খারাপ হতে শুরু করল। মাথায় বোঝা বোঝা চুল হল, মুখ ভর্তি দাড়ি, জামাকাপড়ে অযত্ন। কথা বলা প্রায় বন্ধই করে দিল বলা যায়। সবসময়ই কেমন অনমনস্ক থাকে। পাগল হবার লক্ষণ সবই প্রকট হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ওর এক বন্ধু চৈতন্য চৌধুরী ওকে পাটনা এক দৈনিক কাগজে প্রুফ রিডারের কাজে লাগিয়ে দিলে।

তারপর?—পাঁচ বছর পরে—

একদিন কোলকাতায় ওর বাসার ঠিকানায় গৌতম মিত্রের এই চিঠিটা এলো। খুঁজে পেলো না ওকে। ব্যর্থ চেষ্টার পর চিঠিটা শেষ পর্যন্ত হাজির হল ডেড্ লেটার অফিসে।

তার বেশ কিছুদিন পর "পাটনা টাইমস" পত্রিকার প্রুফ দেখতে দেখতে হঠাৎ পাগলের মত অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল অলক। খবরটা এই—"পুণা প্রবাসী জে, ই, কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক শ্রীগৌতম মিত্রের স্ত্রী-বিয়োগ। মৃত্যুকালে তিনি একটিমাত্র কন্যা ও স্বামীকে রেখে গেছেন।"

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। পাগলের মতো হেসে ওঠার কি আছে এতে সহকর্মীরা বুঝতে পারে নি। কিন্তু বুঝতে পারল খানিক বাদে। পাগলের মতো হাসে নি অলক, পাগলের হাসিই হেসেছে ও। পাগল হয়ে গেছে অলক। হিতৈষী বন্ধুরা সব চেষ্টাই করেছে, কোন ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত চিঠিপত্র লিখে রাঁচি পাঠিয়ে দিলে ওরা।

অলকের পাগলামীর মূল লক্ষণ নাকি কোন ছেলেকে দেখলেই দৌড়ে গিয়ে বলে,—তুমি সাবধান। ইমোশনাল এক্সেস তোমাকে মর্বিড করে ফেলেছে, পারভার্ট করে ফেলেছে। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।—রাঁচির ওয়ার্ডের ওয়াচম্যানই হোক, ডাক্তারই হোক, সবাইকেই ও এই বলে তাড়া করে। আর কোন মেয়ে এলে নিঃশব্দে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ছলছল চোখে বলে,—চুলগুলো আমার খুব বড় হয়ে গেছে, না সুধাদি? যাই এক্ষুনি গিয়ে চুল ছাটব। রাগ করো না সুধাদি—

পাগলা গারদ দেখতে-আসা কোন মেয়ে ওর পাগলামী দেখে হেসে লুটোপুটি খায়, কেউ অনাবশ্যক করুণায়, সমবেদনার অশ্রুতে চোখ ভেজায়। কেউ বোঝে না কোথায় ঘা খেয়ে ওর এই চিত্তবিকলন, ওর স্মৃতিবিলুপ্তি।

ভাবতে বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে, যদি যথাসময়ে এই চিঠিটা হাতে পেতো অলক, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতো সুধাদি। সুধাদি না বাঁচুক, হয়তো বেঁচে যেতো অলক। নির্মম চিত্তপীড়ায় ও উন্মাদ হয়ে যেতো না, ও পাগল হত না।

কিন্তু না, বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন কোন লাভ হত না এই চিঠি দেখিয়ে। এই চিঠিটা এখন মৃত আর অলক তার অনেক আগেই বুঝি মরে গেছে। রাঁচির পাগলা গারদে এখন যে আছে সে তো সুধাদির ভাই অলক রায় নয়, সে ওয়ার্ড নম্বর দশের, ন'শ বারো নম্বর পাগল, অলক রায়।

সর্বনাশ পক্ষি, গাড়ির তেল ফুরিয়ে আসছে—

তা হলে, ভয় ছমছম গলায় চেঁচিয়ে ওঠে পক্ষি—কি হবে, কি হবে আয়ার?

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে চুপ করে থাকে আয়ার। জবাব দেবে কি? কি আর দেবার আছে? আয়ারের মুখে অনিশ্চয়তার ক্যাকাসা ঘনিয়েছে হেমন্তের কুয়াশার মতো।

জোরে আরও জোরে চালাও আয়ার। যে করেই হোক এ জঙ্গলটা পেরিয়ে যেতেই হবে। এ জঙ্গলে রাত কাটাতে হলে, উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না—

—কিন্তু তেল কই অতো—ছোট্ট কথা ক'টি চাপাকণ্ঠে বলল আয়ার।

স্পিড বাড়ানো হলো অবিশ্যি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে তখন আর অস্বস্তি বোধ করবার মতো অবস্থা নয় কারুরই। হেডলাইটের তীব্র আলোয় সামনের পথটাকে অত্যুজ্জল দেখাচ্ছে। চাপ চাপ অন্ধকার নিয়ে বিদ্যুতের মতো ছুটে যাচ্ছে দু'পাশের বুনো রাত্রি। সমস্ত বনটা কেমন যেন থমথমে, কেমন এক ভাষামুখর থমথমানি। পক্ষির মনে হলো ওরা যেন জালে আটকানো মাছির মতো জালের পাকে পাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মাঝখানে লালাসিক্ত দু'টি চোখ নিয়ে বসে আছে হিংস্র মাকড়সাটা। তারপর, তারপর সেই রোমশ নখবল্লমাবৃত দীর্ঘ একটা বাহু বাড়িয়ে সেই মূর্তিমান নৃশংসতাটি যেন তাকে, তাকে···উঃ, বড্ড ভয় করছে পক্ষির।

দু'বার হর্ন বাজালো আয়ার। হেড লাইটের চোখ ঝলসানো আলোর আওতা থেকে ছুটে পালালো কয়েকটা খরগোশ। আয়ারের

কপালে দুশ্চিন্তার ঘাম। ওর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় পঙ্কি।

কান পাতলে সমস্ত বনটা জুড়ে একটা বেদনার্ত আর্তি শুনতে পাওয়া যায় যেন। একটা বোবা শনশন আওয়াজ কাঁপিয়ে দিয়ে যায় বুনো রাত্রির অন্ধকার। কানদুটোকে প্রখর করে রাখে পঙ্কি। কয়েকটা রাতজাগা পাখির কলকাকলী গাড়ির দ্রুততার ওপর ঝাপট মেরেই মিলিয়ে গেল পেছনের ঘনান্ধকারে। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে দিয়ে বাঘের গর্জন ফেটে পড়ল বনভূমির প্রান্ত থেকে প্রান্তে। শিউরে উঠে চোখ বুজে দু'হাতে আয়ারকে আঁকড়ে ধরল পঙ্কি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিশ্রী আওয়াজ করে গাড়িটা থেমে পড়ল সেখানেই।

তেল ফুরিয়ে গেছে।

কোডার্মা রিজার্ভ ফরেস্টের আদিম বন্যতা চাপ বেঁধে ওঠে ওদের থেমে থাকা গাড়ির চারপাশে।

কি হবে আয়ার, উঃ—অস্ফুট কণ্ঠে একবার প্রশ্ন করে পঙ্কি সমস্ত মুখটাতে ভয়াটে অসৌন্দর্য কেমন কুৎসিত হয়ে দেখা দিচ্ছে।

শুকনো ঠোঁটদুটো বিসদৃশভাবে একবার চেটে নেয় আয়ার।

জবাব দেয় না কিছু।

মরীচিকা নয়, সত্যি সত্যিই ওয়েসিস। একটা আশ্বাস। মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গীতের সুর যেন শুনতে পাচ্ছে রঙ্গস্বামী আয়ার। পিপাসার শেষ সীমান্তে এসে যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে শান্ত নির্ঝরিণীর কলস্বর। গোবির বিশুষ্কতার মধ্যে যেন উশীর সান্ত্বনা। ঠিক। কানদুটোকে যথাসম্ভব সজাগ করে রাখে আয়ার। ঠিক। মোটরবাইকের আওয়াজ। জীবনের স্পন্দন। সভ্যতার আলোকদূত ছুটে আসছে যেন ত্রাণকর্তা হয়ে।

শুনতে পাচ্ছো—দু'হাতে ধ'রে পঙ্কিকে প্রবল ঝাঁকুনি দিলো আয়ার।

—কি, বাঘটা কি এগোচ্ছে? ফ্যাকাসে মুখ পঙ্কির।

—না, ওই শোন—

মোটরবাইকের আওয়াজ, মানুষ ?—সমস্ত মুখটা বাসন্তী-বিকেল হয়ে ওঠে পঙ্কির।

হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে—

শব্দ বাড়ছে। অগ্নিচক্ষু জ্বালিয়ে আদিম অরণ্যের ভেতর ছুটে আসছে একটা যন্ত্র-দানব। সভ্যতা। বাঁকটা পেরোতেই মোটর-বাইকের আলোটা দৃষ্টিগোচর হলো ওদের। গাড়ির হেড লাইটটা জ্বলছে, তবু একটা হাত সামনে বাড়িয়ে রাখল আয়ার। থামো। ব্রেক কষতে কষতে মোটরবাইক এসে থামলো।

আপনারা কে ? এখানে, এসময় ?—প্রশ্ন হলো ইংরেজীতে।

সাধ্যমত জবাব দেয় আয়ার, বলল,—আমি মাইকা ফিল্ড ইনস্পেকশনে এসেছি কোডার্মা। রাঁচীতে রাত করে ফেরার পথে হঠাৎ দেখি গাড়ির তেলের ট্যাঙ্ক খালি, তাই আটকে পড়ে গেছি এখানে, উনি আমার স্ত্রী—

—যাক, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এ বনেরই ফরেস্টার। চলুন, আমার বাঙলোতেই থাকবেন চলুন, কাছেই আমার বাঙলো। কাল ভোরে যা হয় করবেন। আর গাড়ির জন্যে ভাববেন না। আমার কুলী পাঠিয়ে ওটাকে ঠেলে ঠেলে এক্ষুনি বাঙলোতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। বলিষ্ঠ লোকটার কালো পাথুরে মুখটা উজ্জ্বল দেখায়। পিঠে রাইফেলের নলটা মূর্তিমান সাহসের মতো উদ্ধত হয়ে রয়েছে।

—হেঁটে যাবো ? এইমাত্র বাঘ ডাকল যে, পঙ্কির ভিতু গলা শ্রুতিগোচর হয় ওদের। ইংরেজীতেই বলে পঙ্কি।

—সে আমিও শুনেছি মিসেস আয়ার। ভয় পাবেন না, সে অনেক দূরে, আরেক তল্লাটে। এদিকে বাঘ আসবে না, এছাড়া আপনারা আমার রাইফেলটার ওপরে রিলাই করতে পারেন, ওটা কখনও বেইমানী করে না—বলে লোকটি একটু হাসল কিনা অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা গেল না।

ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার নামটা—আয়ার শুধোল।

—নিশ্চয়ই—পরিতোষ চ্যাটার্জি, আউট এণ্ড আউট বেঙ্গলী—জবাব দেয় ফরেস্টার সাহেব।

—বেঙ্গলী। ওঃ লাভলি, আমিও কোলকাতায়ই মানুষ, বাঙলা জানি। মোর ওভার, আই অ্যাম ম্যারেড টু এ বেঙ্গলী গার্ল। পঙ্কি, এদিকে এসো—

বাঙালী শুনে পঙ্কিও খুশীতে রামধনু হয়ে উঠেছিল। সংক্ষিপ্ত হেসে শুধু বললো—বাঁচলুম।

—চলুন, চলুন আপনারা—ফরেস্টার চ্যাটার্জি তাড়া দেয় ওদের, ও যা খুশী হবে আপনাদের পেয়ে, মানে আমার স্ত্রীর কথা বলছিলাম—

পঙ্কির চমকাতে হলো। এরকম ঘটনাচক্রের জন্যে ও প্রস্তুত ছিল না মোটেই। কুন্তীকে ও আদৌ আশা করে নি এখানে, এমন আশ্চর্য আকস্মিকতার ধাক্কা কাটাতে তাই পর পর দু'গ্লাস জল খেল পঙ্কি।

কুন্তী নির্বিকার।—ওমা বৌদি দেখছি, বলেই জিভ কাটল। মাপ করো ভাই পঙ্কিদি, আগেকার অভ্যেসের ঝোঁকে ও কথাটা বেরিয়ে গেছল। এখন তো তুমি মিসেস—সপ্রশ্ন চোখে তাকায় কুন্তী। 'আয়ার' যোগ করে কথাটাকে সম্পূর্ণ করে পঙ্কি, তারপর যেন মেয়েলী আহ্লাদেপনার সুযোগ পেয়ে বলে বসল—তাতে কি, পঙ্কিদি নয়, তুমি বৌদি বলেই ডেকো না, কৌশিক তোমার দাদা হতে পারে, রঙ্গস্বামীও হোক না। আরেক জনে দোষ কি—শেষের দিকে গলাটা একটু কাঁপলো কি? রুমালটা অমন অনাবশ্যক গলায় বুলোবার বা অমন চটকাবারই কি প্রয়োজন ছিল পঙ্কির?

—বাঁচলুম, তাই ডাকবো—তারপর চাপা গলায় বললো, নতুন বিয়েটা কবে করলে? কি করে হয়েছে?

—বছর খানেক। তা প্রেমে পড়েই বলতে পারো। ছ' মাসের কোর্টশীপের পর।

—ও। আচ্ছা বোস তোমরা, আমি বাবুর্চিটাকে একটু তাড়া দিয়ে আসি। ভয়ানক ফাঁকিবাজ সব ; বলে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় কুন্তী।

সেই কুন্তী, আশুতোষের শানানো মেয়ে, প্রখর ডিবেটার, ছেলেমহলের হৃৎকম্প। আজ ফরেস্টার পরিতোষ চ্যাটার্জির স্ত্রী। পাখার রঙের রামধনুতে সবাইকে চমকে দিয়ে কোন প্রজাপতি যেন গুটিপোকা হয়ে এই আরণ্যক কুটিরে এসে মাথা গুঁজেছে শেষ পর্যন্ত। ঝড়ের দিনে যারা হাল ধরতে চেয়েছিল, সেইসব রমেন, মনীষ, দীপকদের এড়িয়ে নীড় বাঁধল এসে পরিতোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে। আশ্চর্য! আশ্চর্য লাগে ভাবতে। কৌশিক, কৌশিক কেমন আছে, কোথায় আছে কৌশিক? পক্ষির প্রথম স্বামী, প্রথম পুরুষ, প্রথম প্রেম, প্রথম অনুভব? বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে সে খোঁজ নিতে। কিন্তু না, প্রয়োজন নেই। কুন্তী হয়ত ভাববে, এটা তার গোপন দুর্বলতার লক্ষণ, আয়ারকে নিয়ে মন না ভরার সঙ্কেত পাবে এ-ধরনের প্রশ্নে। না। মেয়েলী পরাজয়ে খুশী হতে দেওয়া চলে না কুন্তীকে, ওর দাদার অত বড় মূল্যকে স্বীকার করে নিজের মূল্যহীনতার প্রমাণ দিতে রাজী নয় পক্ষি। কৌশিক!…না না। বরং ওর সম্পর্কে কৃত্রিম নিস্পৃহতায় বেদনাবিদ্ধ করবে সে কুন্তীকে, হারিয়ে দেবে কৌশিককে, অস্বীকার করবে ওর সামান্যতম পরিচয়ের স্বাক্ষরও। বদ্ধপরিকর পক্ষি। রান্নাঘরে এসে ও মিষ্টি গলায় বললো, একটা শাড়ি দেবে ভাই। কাপড়টা পাল্টাবো ভাবছি, আর তোমাদের বাথরুমটা যেন কোনদিকে?

—ওমা, ওই দেখো, ভুলে গেছি শাড়ি পাল্টানোর ব্যবস্থা করতে। না, সংসারী আর হতে পারলাম না আজো। এই ডিমটা ভাজ তো কাংড়া, আমি আসছি। চলো বৌদি, ওই যে বাথরুম, যাও। তারপর এসো। আমি শাড়ি জামা দিচ্ছি তোমায়—

কুন্তীর আতিথ্যটাই অসহ্য মনে হয় পক্ষির ও বুঝতে পারে, হৃদ্যতাটা হঠাৎ চমকে দিয়ে ওঠা একটি আগন্তুক দম্পতির জন্য নয়।

কৌশিকের সেতু পথের যোগাযোগ দিয়ে পুরনো পরিচিত আত্মীয়ার প্রতি কুন্তীর স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির ফল্গুস্রোত পঙ্কির আবেগের বদলে অস্বস্তির মতো গায়ে এসে লাগে। বেঁধে। উঃ, কৌশিক! ভুল। বিশ্বাসঘাতক কৌশিককে সে ক্ষমা করে নি, ঠিক করেছে। সে এখন সুখী হ্যাঁ, খুব সুখী।

—খবর জানো বৌদি, দাদার নতুন উপন্যাস 'সপ্তদ্বীপ' দিল্লী য়ুনিভার্সিটির গণপতি সিংহ প্রাইজটা পেয়েছে, এবছরের সেরা বাঙলা বই হিসেবে প্রাইজটা পেয়েছে দাদা। ছাখো নি তুমি?

আবার কৌশিক! না, কালই তাকে পালাতে হবে, কালই। হেসে জবাব দেয় পঙ্কি—কই না তো? আয়ারটা বড্ড ভবঘুরে। তাই দেশ ঘুরে ঘুরে বই-টই দেখবার বা পড়বার অবসরই পাইনে—

ওমা, সে কি, দাদার বই পড়েই তো তুমি দাদাকে,—আচ্ছা দাঁড়াও! কুন্তী কি ভেবে নিয়ে একটা সুটকেস খুলে বসলো, তারপর রঙীন ঝকঝকে মলাটের একখানা বই বের করে এনে হাতে দিল পঙ্কির। 'সপ্তদ্বীপ'—লেখক কৌশিক গুহঠাকুরতা। মলাট খুলেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে পঙ্কির। কৌশিকের হাতের লেখা। সেই আশ্চর্য ভাল হাতের লেখা কৌশিকের। 'স্নেহের কুন্তীকে—দাদা'। তারপর মাসখানেক আগের তারিখটা; না, হেরে যাচ্ছে, ক্রমশ হেরে যাচ্ছে পঙ্কি। মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো কেউ যেন তাকে এনে ফেলেছে কুন্তীর এই ঝাঁপিতে। চোখ তুলে দেখলে সামনে কুন্তী নেই, আর ও'ঘর থেকে চুরুটের কড়া গন্ধ বুনো হাওয়ায় ভেসে আসছে এ'ঘরে। ওদের অনর্গল এত কি কথা বলার ছিল বুঝতে পারে না পঙ্কি। মাঝে মাঝে নেহরুর ফরেন পলিসী, ম্যাড্রা-সের কমিনিস্টদের হোল্ড, কোরিয়ার জার্ম ওয়ার, মানকড়ের খেলা, হাজারের বোলিং, অলিম্পিক, মাইকার পিট, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি, মমের লেখা, সার্ত্তর-এর মূলকথা, বেটি ডেভিসের অভিনয়, সবরকম সাত-সতেরো আলোচনার ভগ্নাংশ শুনতে পাচ্ছে ও। আলোচনায় দু'জনে একেবারে জম-জমাট। উঃ, এতোও বকতে পারে পুরুষমানুষগুলো।

পুরুষমানুষগুলো ?—

না, তা'হলে কৌশিক ওরকম স্বল্প কথার মানুষ হলো কি করে ? শুধু স্বল্প কথার, লোকটা কখনও কথা বলতো কিনা, বলতে পারে কিনা, মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো পঞ্চির। ও'রকম বোবাও হয় মানুষ। মূক শিলাভূত স্ট্যাচুরও মুখেচোখে একটা বাঙ্ময় রূপ দেয় আর্টিস্ট কিন্তু কৌশিকের মুখ বুঝি স্ট্যাচুর চাইতেও কঠিন।

অথচ এতেও ওর ভালো-লাগা এড়ায় নি। তবু কৌশিককে আশ্চর্য ভালোবাসতে পেরেছিল পঞ্চি। পেরেছিল কি ? হ্যাঁ, পেরেছিল বৈকি।

সতেরোর চৌকাঠ ডিঙিয়ে আঠারোর বসন্তে পঞ্চি স্কটিশের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। সাহিত্য পাঠে ওর প্রবল ঝোঁক তখন, বাবার উৎসাহ আর মা'র বিরোধিতার মাঝখানে প্রবল জোয়ারের মতো এতো এগোচ্ছিল ওর বই পড়া।

—হ্যাঁ পড়ো, শিক্ষাই জ্ঞান, সাহিত্যই হচ্ছে দেশ—বাবা বলতেন। সারাদিন নভেল আর নভেল পড়া কি লো—বলতেন মা। দু জায়গায়ই হাসতো পঞ্চি, প্রতিবাদ করতো না। বেশ তো চলছে, এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না !

তখন নতুন লিখিয়ে কৌশিক গুহঠাকুরতার প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে 'সূর্যকন্যা'। তুমুল আলোড়ন সে বই নিয়ে। রোমান্স আর রিয়ালিজ্‌ম-এর এমন আশ্চর্য মিশেল নাকি বাঙলা সাহিত্যে নতুন। একজন প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন, এর নাম হচ্ছে 'রেভ্যুল্যুশনারী রোমান্টিসিজ্‌ম'। আর একজন লিখেছেন এদ্দিন কোথায় ছিল এই শক্তিধর ? আর দ্বিতীয় বই রম্যরচনা আর উপন্যাস-এর সংমিশ্রণ 'নতুন দিল্লীর পুরনো গল্প' বেরুনোর পর বইয়ের দোকানগুলো কৌশিক ছাড়া কিছু শুনলো না একটানা কয়েক মাস।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চির মনের রাজা হয়ে বসল কৌশিক। একটি

সাহিত্য-পত্রিকায় কৌশিকের অনিন্দ্যসুন্দর চেহারার ফটো আর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে য়ুনিভার্সিটির ফিফ্‌ত ইয়ারের চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটার কথা জেনে অসম্ভব দুর্বলতা দেখা দিল ওর। পঞ্চির মনের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসল কৌশিক, ওর হৃদয়ের টঙের একমাত্র পায়রা। হয়তো এমনি ভালো-লাগার রোমাঞ্চ নিয়ে কেটে যেতো কিছুদিন, তারপর ক্রমে একদিন ধূলির প্রাপ্য ধূলিকে দিয়ে সব ভুলে যেতো পঞ্চি, সহস্রের জটিল বাঁধনে জীবনের কোন্ পথ দিয়ে কোথায় চলে যেতো কে জানে! তখন দূরান্তের কোন তারার মতো কৌশিক শুধু ওর এককালের প্রিয় লেখকমাত্র, পছন্দসই ভালো ডিজাইনের শাড়ি তৈরির এককালের প্রিয় মিলের মতো, এককালের প্রিয় সেন্টের কোম্পানী!

কিন্তু আসলে অভাবনীয় অনেক কিছু ঘটে যায় পৃথিবীতে। পৃথিবীতে ইতিহাস তো আকস্মিকতারই মালা গাঁথা। তাই সেদিন ট্রামের ভিড়কে পরবর্তী জীবনে পঞ্চির কাছে আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছিল। দীর্ঘ তিন বছর অন্তত সে ভিড়ের ওপর কৃতজ্ঞতা ছিল পঞ্চির। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। প্রফেসর সেনগুপ্তের ক্লাস শুরু হতে আর আধ মিনিট বাকী। হন্তদন্ত হয়ে মেয়েদের কমনরুমে এসে ঢুকল পঞ্চি।

—এটা কোন ফ্যাশান ভাই? নতুন স্টাইল বুঝি?—বীণা প্রশ্ন করে হেসে। কৌতুককণ্ঠে। হঠাৎ সব মেয়েদের চোখ পড়ে ওর ওপর, তারপর সবাই হেসে উঠল কলকণ্ঠে।

কি ব্যাপার, হকচকিয়ে যায় পঞ্চি, কি হয়েছে? হাসছিস কেন?

—না, ব্লাউজের ওপর পেন রাখা বুঝি আজকাল সেফ নয় তোর পক্ষে, তাই কালো কেশে বেঁধেছিস ঝরনা কলম? উদ্দেশ্য, যতোই কালি ঝরুক, ঝরুক কালো চুলের গহিনেই, হৃদয়ের পদ্মে কোন কালি নয়, সেখানে কালির কলঙ্ক সইবে না, তাতে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে অন্য কোন হতভাগ্যের হৃদয়, তাই নারে পঞ্চি?

—মুখরা মল্লিকার লম্বা কথার শানে হেসে লুটিয়ে পড়ল সবাই।

চম্‌কে চুলে হাত দিল পঞ্চি, আর অবাক হয়ে দেখল চুলের গোছায় একটা কালো রঙের শেফার্স পেন আটকে রয়েছে। আলতোভাবে পেনটাকে খুলে ফেলে পঞ্চি। আশ্চর্য, এটা কোথেকে কেমন করে এল ওর চুলে? ভোজবাজী নাকি, ম্যাজিক?

—অমন দমে গেলি যে, ব্যাপার কি?—সান্ত্বনা শুধোয়।

—সত্যি ভাই, এটা কি করে এল আমার চুলে। কিছুই বুঝতে পারছি না? পঞ্চির সারা মুখে বিস্ময়ের মেঘ।

মল্লিকা ফের একটা লম্বা লেকচার ঝাড়তে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ক্লাসের ঘণ্টা পড়ায় ওকে থেমে যেতে হল। তাড়াহুড়ো করে পেনটা ব্লাউজে আটকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকল পঞ্চি।

ভেবে খানিকটা আঁচ করে পঞ্চি। ট্রামের ভিড়ে সে যখন সেই জমাট জনজঞ্জালের ভিড় ঠেলে বেরিয়েছিল, তখনই হয়তো কারুর আলগা পকেট থেকে পেনটা ওর চুলের সঙ্গে আটকে চলে এসেছে। ভাগ্যিস, এর মালিক তখন দেখে নি, দেখলে তুমুল হাস্যরসের অবতারণায়, ট্রামভর্তি লোকের হাসিতে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেতে হতো ওর। কি বিড়ম্বনা!

—তবে কি পেনটা চেপে যাবে, বেশ চমৎকার শেফার্স পেন। কি হবে চেষ্টাচরিত্র করে মালিককে ফেরত দিয়ে? না না, ছি ছি ছি, একি ভাবছে পঞ্চি। ক্লাস শেষ হলে পঞ্চি বেরিয়ে এলো। তারপর ইচ্ছে করে কমনরুমে না গিয়ে চলে এল লাইব্রেরীতে। একটা গল্প পড়তে শুরু করল পত্রিকা টেনে নিয়ে। এক পাতা শেষ করে বুঝল, সে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে মাত্র আসলে একটা অক্ষরও পড়া হয় নি ওর।

কি ভেবে বইটা বন্ধ করে বেরিয়ে এল পঞ্চি। আরো দু'টো অফ পীরিয়ডের পর স্পেশাল বাংলার ক্লাস ছিল। থাক, আজ আর ও ক্লাসটা করবে না পঞ্চি। ট্রামে ভিড় কম, একটুক্ষণ ভেবে ও টিকিট কাটলো কলেজ স্কোয়ার!

দেড়টায় দাদার অফ রয়েছে। এগারো নম্বরে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে হয়তো দাদাকে। সিঁড়ি ভেঙে ইউনিভার্সিটির

দোতলায় এল পক্ষি। তারপর এগারো নম্বরে উঁকি মারার আগেই নজরে পড়ল দেয়ালের ওপর নোটিশ বোর্ডের মতো একটা রাজনৈতিক পোস্টার। তার একদিকে একটি প্রাচীরপত্র। কৌতূহল জাগে পক্ষির—প্রাচীরপত্রের এক কোণে লাল কালিতে লেখা একটা আঠা দিয়ে সাঁটা চিরকুটে চোখ আটকে যায় ওর। 'হারিয়েছে—আমাদের প্রাচীরপত্রের সম্পাদক কৌশিক গুহঠাকুরতার একটি কালো শেফার্স কলম হারিয়েছে। ট্রামের পথে বা ইউনিভার্সিটিতে, কোন সহৃদয় ছাত্র বা ছাত্রী পেয়ে থাকলে লাইব্রেরীতে গিয়ে মালিকের কাছে কলমটি ফেরত দিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। সময়—ছটো থেকে সাড়ে তিনটা—সম্পাদকমণ্ডলী।' আঠার ভেজা ভাব শুকোয় নি এখনো।

বুকটা ছলাৎ করে ওঠে পক্ষির। লনের তটপ্রান্তে আছাড় খেয়ে পড়ে বিরাট একটি সামুদ্রিক ঢেউ। কানের পাশটায় একটানা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক।

—কি রে তুই এ সময়?—দাদা এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে,—তোর ক্লাস-ট্লাস নেই এখন?

—ছিল একটা, চলে এলাম! ভালো লাগছে না।

—কেন শরীর খারাপ?

—না এমনি—

—তা চল্, ওয়াই এম সি-এতে যাবি?

—চলো।

ওয়াই এম সি-এর কেবিনে দাদাকে সবিস্তারে পেন প্রসঙ্গটি বললো পক্ষি। শুনে দাদ' অবাক হলেন খুব। তারপর বললেন—চল্ তাহলে তিনটে বাজে, কৌশিককে ফেরত দেয়া যাক্ কলমটা। এটাই কৌশিকের পেন সন্দেহ নেই। আমার সঙ্গে আলাপ নেই কৌশিকের, তবে মুখ চিনি। চল্, তুইও যা ভক্ত হয়ে পড়েছিস ওর লেখার, আলাপ করলে খুশী হবি—কৌশিকের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ হল পক্ষির। প্রথম পরিচয়।

আলাপ ? আহা, আলাপের কি ছিরি ! পক্ষির এখন ভাবতেও হাসি পায়।

—এই যে ভাই কৌশিক, শুনুন, আপনার কলমটা, ধরুন, যদি ফেরত দিতে পারি এখন, কি খাওয়াচ্ছেন ? দাদা প্রশ্ন ছোড়েন।

লম্বা রোগা ফর্সা একটি ছেলে। লজ্জাভরা মুখ-চোখ। সদাকুণ্ঠিত ভাব। ওমা, এই কৌশিক গুহঠাকুরতা ? হালের সবচেয়ে মিষ্টি লিখিয়ে ? দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত ! অবাক হয়ে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পক্ষি। ট্রামের ভিড়ে এই কাতর-মতো-মুখ ছেলেটাকে মনে আনবার চেষ্টা করে ও। ছিল, হ্যাঁ, এও ছিল সেই অচেনা মুখদের ভিড়ে।

পেয়েছেন ?—কোন উৎসাহ নেই, উত্তেজনা নেই, ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলা। হতাশ হয়ে যায় পক্ষি। আর চরিত্রটা আশানুরূপ নয় বলেই কৌতূহলীও হয়ে ওঠে ও।

মিষ্টি সুরেলা গলায় মৃদুস্বরে ও পেনটার কাহিনী বলে যায় কৌশিককে। তারপর বাড়িয়ে দেয় কলমটা।

'ওঃ, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ আপনার নামটা যেন কি পুলিন, পুলিন ব্যানার্জি না ?—কৌশিক জানতে চায় এবার। নেহাত নিয়মরক্ষার জন্যেই দাদাকে শুধোয় ও।

হ্যাঁ, আর আমার বোনের নাম পক্ষি, পাঞ্চালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ও কিন্তু আপনার লেখার ভয়ানক ভক্ত পাঠিকা, আপনার সঙ্গে আলাপের ওর খুব শখ,—দাদা বললেন—চলুন না, ওয়াই এম সি-এতে। একবার পক্ষির দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল কৌশিক, তারপর একটা কথাও না বলে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল,—কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমার পক্ষে হয়তো আপনাদের খাওয়ানোই উচিত ছিল, নয় তো একটুক্ষণ বসে আলাপ করার। কিন্তু আমার পকেটে পয়সা নেই তেমন, আর, আর, এখন একটু কাজ আছে আমার, এক্ষুনি যেতে হবে। চলি—কৌশিক বেরিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল পক্ষি, তারপর চাপা গলায় বলল,—অভদ্র। চলো দাদা, না-কি তোমার ক্লাস বাকি আছে?

—হ্যাঁ, একটু বাদে যাবো আমি, তুই চলে যা।

সারা গায়ে যেন বিছুটির জ্বালা নিয়ে বেরিয়ে এল পক্ষি। সমস্ত শরীর রি রি করছে। একে-ই সে এত শ্রদ্ধা করেছে এতকাল, এত ভক্তি! অথচ, ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় একটি কলেজে পড়ুয়া মেয়েকে এতটা অপমান করতে সাহস পায় ও। এত অহংকার। কিন্তু এ রাগ আর ক'দিনের? মাস দুই বাদে কৌশিকের লেখা 'অতলান্তিক' উপন্যাসখানা যখন দাদা এনে ওর হাতে দিয়ে বললো—এই নে, ছেলেটার চরিত্রই ওইরকম, আসলে খুব খারাপ নয়রে। ছাখ, নতুন বইখানা তোকে এক কপি নিজের হাতে লিখে দিয়েছে। বলল, পেন ফেরত পেয়েখাওয়াতে পারি নি, বই দিয়েই তার শোধই না হয় দিলাম। পাতা খুলে পুলিন দেখালো আশ্চর্য ভালো হাতের অক্ষরে লেখা কয়েকটি শব্দ—'পক্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়—সুচরিতাষু'—কৌশিক,—তারপর তারিখ। আর কি বলেছে জানিস, পড়ে কেমন লাগল জানালে ও খুব খুশী হবে, ঠিকানা রয়েছে ভূমিকার তলায়—পক্ষি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে হাসলো। কিন্তু আশ্চর্য, বইটা পড়ে মতামত জানাতে গিয়ে ওর কথা আর ফুরুতে চাইলো না। মুখর কথার শোভাযাত্রা মস্ত প্যাডের পাঁচ পাতা ছাড়াবার পর যেন সচেতন হয়ে লজ্জা পেয়ে সাড়ে পাঁচে শেষ করলো চিঠি। তবু কি মন ভরে? আরো দশ লাইন বাড়ল পুনশ্চর তলায়। তবু কি খুঁতখুঁত পক্ষির, বইটার উপহার-পত্রে কৌশিকের সংক্ষিপ্ত চারটে শব্দে যেন এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু বলেছে কৌশিক। যেন সে চারটে শব্দের ফুলে আকাশ-ভরা রৌদ্র এসে ভালোবাসার শিশির-কৌটায় সপ্ত রঙের ইন্দ্রধনু জ্বালিয়ে দিয়েছে। মস্ত একটা উপন্যাসের কাহিনী বুঝি লুকিয়ে আছে সেই চারটে শব্দের চতুষ্কোণে। সে শব্দ চারটের কাছে যেন পক্ষির এই ছ পাতার চিঠিখানা হেরে গেছে, তুচ্ছ হয়ে গেছে।

তারপর অনেক ঢেউ ভাঙলো ওর মনের শ্যামতটে, অনেক সময় ওর ছোট্ট লেডিজ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। সে কাঁটার দিকে যখন একদিন নজর পড়ল ওর, তখন আর ফেরবার পথ নেই। আর বেশী এগোলে কাঁটাটা বুঝি রক্তাক্ত করে ফেলবে ওর হৃৎপিণ্ড, অনিবার্য-ভাবে কোন এক অবাঞ্ছিত অনাহূতের ইঙ্গিত জানাবে ওর ছোট্ট শুচিমুখের অগ্রগতিতে।

তাই টইটম্বুর রঙখুশীর মন নিয়ে একদিন ওরা দু'জন সন্ধির স্বাক্ষর রাখল ম্যারেজ রেজিস্টারের কোর্টে। পদবী বদলালো পঙ্কি। বাবা মারা গিয়েছিলেন ইতিমধ্যে, দাদা মাকেও রাজী করাতে পেরেছিলেন। কৌশিকদের বাড়িতে সেদিন নিটোল একটি অনুষ্ঠানে হেসে হেসে সবাইকে খুশীটুশী করে পঙ্কি গুহঠাকুরতা যখন অনুষ্ঠান শেষে খোঁজ করল স্বামীকে, তখন চমকে দেখতে পেল ও, কৌশিক ওর বৌদির ঘরে বৌদির খাটে শুয়েই ঘুমুচ্ছে। স্বামীর নিস্পৃহ উদাসীনতায় হিংস্র হয়ে ওঠে পঙ্কির মন। ধীর পায়ে এগিয়ে ও নাড়া দেয় কৌশিককে। অ্যাই, শুনছ—থাক না ভাই, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না—শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বৌদি। কৌশিকের বিধবা বৌদি। যার স্বামী গত যুদ্ধে মারা গেলেন আরাকানে। বিয়ের মাত্র দু'বছর বাদে। মুখ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে বৌদির দিকে তাকালো পঙ্কি। দরজা ধরে শ্বেতশুভ্র পোশাকে দাঁড়িয়ে বৌদি। কিন্তু সে চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে ও। উঃ, কি আশ্চর্য সৌন্দর্য, কি অসম্ভব রূপ। কমনীয় নয়, হিংস্র, দ্যুতিময় সম্মোহনী। সাক্ষাৎ কিরণময়ী বুঝি!

পিঠে হাত পড়ায় চমকে ওঠে পঙ্কি। যেন ঠাণ্ডা একটা সাপ। ধীর গলায় বললেন বৌদি—চলো, তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমুই আমরা—

প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ নয়; অজস্র সজ্জায় অনিন্দিতা নববধূ পঙ্কি নিশি-পাওয়ার মতো ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পেছনে বৌদি, উদ্যত ফণা—পদ্মনাগ।

অনেক চেষ্টা করেছিল পক্ষি। অনেক। কিন্তু হেরে গেল, পারল না। কিছুতেই পারল না কৌশিককে সে মাকড়সার জাল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে। অসহায়, বড় অসহায় কৌশিক। আর পক্ষি? ভগ্নপক্ষ জটায়ু। পরাজিত। আশ্চর্য বৌদির ক্ষমতা। বার বার চেষ্টাতেও হেরে গিয়ে পক্ষি অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল। কৌশিককে বাজী ধরে যেন আসলে ওর আর বৌদির মধ্যে পাঞ্জা চলছে। দ্বন্দ্ব। গোপন সংগ্রাম।

ব্যর্থমনোরথ হয়ে পক্ষি এবার নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। ভাবল যদি এ আঘাতে বিচলিত হয় কৌশিক। দেখাই যাক; ফিল্মের ব্যাপারে ঘোরাঘুরি শুরু করল ও। মাড়োয়ারী প্রযোজকের কথায় রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল ও। ডিরেক্টরের গাড়িতে হাওয়া খেতে যাওয়ার নেমন্তন্নে এতটুকু আপত্তি জানালো না। সজ্জায় কতটা মার্কিনী হওয়া যায় তার প্রচেষ্টা চললো, খাওয়ায় কতটা বেনিয়ম সহ্য হয় তার কসরতও।

বলা বাহুল্য, চান্স জুটল ঠিকই। সিনেমার কয়েকটি পত্রিকা উল্লেখ করতে ভুলল না যে, হালের নামী সিনেমা স্টার কাজলী দেবীর আসল নাম পক্ষি গুহঠাকুরতা, তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশেরই বধূ, ব্যক্তিগত জীবনে সুলেখক কৌশিক গুহঠাকুরতার স্ত্রী।

কিন্তু না, কৌশিক নির্বিকার। বৌদিও। যেন কিছু নয় এ-সব, সব তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ব্যাপার। রাতে না ফিরলেও কেউ কিছু শুধোত না। শুধু হ্যাঁ, শুধু কৌশিকের অন্ধ মা বিড়বিড় করতেন কি সব, তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিত কুন্তী। কৌশিকের বোন। হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত ও। ছুটিছাটায় এলে খুব জমাতো পক্ষির সঙ্গে। ও বাড়ির একমাত্র মেয়ে, যাকে ভয়ানক ভালোবাসত পক্ষি। সিনেমায় নামার পর শুধু একবার ছোট্ট চিঠিতে লিখেছিল কুন্তী—বৌদি কি শুরু করেছো বল তো? নিজেকে ওভাবে ধ্বংস করে কি লাভ?

কি লাভ? কেন, কি ক্ষতি? কোশিক আর বৌদির নিস্পৃহতা যতো দেখতো, ততো উন্মত্তের মতো উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ত পঙ্কি। নিজেকে পণ্যের মতো নিয়ে নিজেই লোফালুফি করতো।

হঠাৎ কোন একটা বাঙলা ছবির তামিল সংস্করণ করতে গিয়ে আলাপ হল আয়ারের সঙ্গে। সহযোগী ব্যবস্থাপনায় ছিল রঙ্গস্বামী আয়ার। এ ছবিটার পরই পঙ্কি ওর সঙ্গেই ভেসে পড়ল। মাদ্রাজ বোম্বাই ঘুরল। কত জায়গা! সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ায় এখন ও। হারাতে পারে নি ওদের, হারাতে পারে নি কৌশিককে, বৌদিকে। তাই সে নিজেই পালিয়ে চলে এলো ওদের সেই চক্রজাল থেকে। পরাজয় মেনে বসে থাকার চেয়ে পলায়ন ঢের ভালো। নিজেকে নিঃশেষে ফুরিয়ে দেওয়ার চাইতে ঢের ভালো কানা-লণ্ঠনের আলোই। সূর্যের আলো না পেয়ে সূর্য তপস্যার পক্ষপাতী নয় পঙ্কি, তাই কানা লণ্ঠনের মরা আলোতেই পথে বেরিয়ে পড়ল ও। চুকিয়ে দিল পেছনের যত গ্লানিময় দেনা, যতো ব্যর্থ আক্রোশের স্মৃতি।

কিন্তু সব চুকলো কি? তবে কেন আজও ইচ্ছে হয় কৌশিকের খবর জানবার? কে জানে?···

ওমা বৌদির কাণ্ড ছাখো, বইটা নিয়ে বসে আছে। কি ভাবছ অতো, অ্যাঁ?—চমক ভাঙলো পঙ্কির। কুন্তী এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

না, কিছু না—বলে পঙ্কি। তারপর রান্নাঘরের পাট চুকল? হ্যাঁ ভাই, উঃ বাঁচা গেল। ওদিকে তোমাদের পেট তো খিধেয় চোঁচোঁ করছে, তাই না?—

না—না—লজ্জিত হাসি হাসল পঙ্কি।

—ওদিকে ছাখো, ছ'টি মানুষের বকার রকমটা ছাখো। বাব্বা, আমার লোকটি জানো, এক নম্বরের বাচাল। এখানে যখন আমার

সঙ্গে কথা বলে বলে অতিষ্ঠ করা শেষ হয়, তখন উনি ওই 'টাইগার', ওই কুকুরটার কথা বলছি গো, তার সঙ্গে যাবতীয় রাজনীতি সমাজনীতি সবরকম কথা শুরু করবেন, সে যদি ছাখো তুমি—হেসে লুটিয়ে পড়ল কুন্তী, অনর্গল খুশীর ফোয়ারা।

আনন্দ! আনন্দ? এত খুশী কুন্তী? এত দাম্পত্য মাধুর্য। মনের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষা ফণা দোলায় পক্ষির। অসহ্য। ঘর তো সেও চেয়েছিল, একমুঠো একটা ঘর-ই। কেন তা হল না, কেন ভেঙে গেল সে স্বপ্ন? কোন ঝড়ে, কার জন্যে? কে দায়ী? আজকের যাযাবরী জীবন তো তার মুখোশ মাত্র, মুখশ্রী নয়।

কাংড়া, যা বাবুদের ডাক তো এবার, টেবিল ঠিক করেছিস, বেশ। ডাক বাবুদের, বল রাত আরো কিছুটা কাটাতে পারলে ডিনার নয়, একেবারে ব্রেকফাস্টই হয়ে যাবে এ টেবিলে। যা ডেকে আন্ শীগগির—তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল কুন্তী,—এসো বৌদি।

খাওয়া চুকলো শেষ পর্যন্ত। পক্ষিই বললো কুন্তীকে—এসো আমরা একসঙ্গে শুই, বেটা ছেলেদের ও-ঘরে দাও, রাত্তিরভর ওরা বকে মরুক।—

সেই ভালো—বললো কুন্তী।

শুয়ে শুয়ে উসখুস করে পক্ষি। তারপর যেন এমনিতে আচমকা প্রশ্ন করে বসল—তোমার দাদা এখন কোথায় কুন্তী?

—কেন জানো না, গরমের ছুটিতে হঠাৎ হাতের ওই গণপতি সিংহ প্রাইজের টাকাটা পড়ে যাওয়ায় দাদা দার্জিলিং গেছে—পরশু দাদা আর বড় বৌদির লম্বা চিঠি পেলাম। খুব মজাতে আছে। খুব নামজাদা হোটেলে উঠেছে—কি নাম যেন, দাঁড়াও বলছি—হোটেলের নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করে কুন্তী।

—থাক্—অস্বাভাবিক কটুকণ্ঠে বলে উঠল পক্ষি। আবার সেই বৌদি? সেই হিংস্র মাকড়সাটার জালের পাকে পাকে এখনও ঘুরে মরছে মাছিটা। কৌশিক। উঃ নিদারুণ পরাজয়। এতো দেশ ঘুরলো, এত ছবি করলো, কতো ছেলের দল, কতো প্রযোজক,

কাহিনাকার, টেকনিশিয়ান, কতো যুবরাজ, নবাবনন্দনের দল পায়ের কাছে এতটুকু স্থান পাওয়ার জন্যে ধনমনপ্রাণ উৎসর্গ করতে বসেছিল, অথচ কৌশিককে কিছুতেই ও টেনে আনতে পারলো না বৌদির নিষ্ঠুর থাবা থেকে। এ লজ্জা লুকোবার মুখ কোথায় ওর?

হঠাৎ মনে হল পক্ষির, কুন্তীর কথায় ও-রকম রূঢ়ভাবে বাধা দেওয়া ঠিক হয় নি। একটু ম্লান হেসে বলল ও—কিছু মনে করো না ভাই, থাক তোমার দাদার কথা। এবার তোমার কথাই শুনি। বলো কি করে অমন রাঙা বরটাকে যোগাড় করলে—

—বারে, বৌদির খালি ঠাট্টা—কুন্তীর লজ্জিত কণ্ঠে মধুরতা ঝরে।

—ঠাট্টা কি, বলোই না শুনি, রোমান্সের কথা তো এখনও খুব রোমাঞ্চকর লাগে আমার—

—ছাই রোমান্স। রাঁচীতে সেই যে এসেছিলাম বন্ধুদের নিয়ে, তখনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমার বন্ধু শীলার দাদা ও।

—চলুক, বলো না, বেশ তো বলছ—

—কি আর বলব। শীলা একদিন বলল—দাদা তো কোডার্মা রিজার্ভ ফরেস্টের ফরেস্টার। চল্ বাঘের জল খাওয়া দেখবি? জ্যোৎস্না রাত্তিরে কি চমৎকার দেখায় যে, কি বলব তোকে।—শুনে প্রথমে তো আমি ভয়েই অস্থির। দরকার নেই বাঘ দেখার। জল খাওয়া, তারপর, যখন আমাদের খেতে আসবে। শুনে ও হেসেই আকুল।—কি যে বলিস তুই, যেরকম ব্যবস্থা, বাঘের বাবারও সাধ্য নেই আমাদের কিছু করে। চল্—তারপর আমরা কয়েকজন এলাম ঠিকই, বাঘ দেখলামও রাত্তিরে—

—কিন্তু সে বাঘ না ধরলেও আরেক বাঘের খপ্পরে পড়ে গেলে শেষ পর্যন্ত, এই তো—পক্ষি হেসে ওঠে।

যা বলেছো—হাসে কুন্তীও। তৃপ্তির হাসি। সব-পাওয়ার আনন্দ।

তারপর ক'দিন হল তোমাদের বিয়ের?

—মাত্র দেড় বছর—

—কোন আগন্তুক ?

খুব চাপা গলায় বললে কুন্তী, আসছে।

—তাই নাকি ?—প্রায় উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে পঙ্কি।

—যাও। তুমি যেন কি বৌদি—কুন্তী পঙ্কির বুকে মুখ লুকোল। লজ্জার এত মাধুর্যের খবর রাখত না পঙ্কি, সে অবাক হয়ে গেল। প্রেম এত সুন্দর ? মাতৃত্ব এমন রোমাঞ্চকর ?···

—ক'মাস ?

—চার—তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে বলল কুন্তী—জানো মানুষটা এ খবর পেয়ে কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। বাপ হওয়ার আনন্দ কতো, যেন পৃথিবী জয় করেছে! দুধ, মাখন, ফল, মাছ-মাংস, ওষুধপথ্যি, এখন থেকেই যা শুরু করেছে না, তুমি হলে পাগল হয়ে যেতে বৌদি। নামজাদা ডাক্তার থেকে নার্স সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে পাকা। এমন হৈ-হুজ্জোত করে না বৌদি, যে আমার লজ্জা করে,—আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠ কুন্তীর। নিস্তব্ধতার প্রতিটি মুহূর্তকে সে যেন সম্ভোগ করছে। উঃ এত তৃপ্তি, এত সুখানুভূতি ?···অসহ্য, অসহ্য লাগে পঙ্কির। এ ও কিছুতেই হতে দেবে না। প্রতিশোধ, হ্যাঁ, প্রতিশোধই নেবে সে, নির্মম প্রতিশোধ। কিন্তু কুন্তী তো কোন দোষ করে নি ওর কাছে, কুন্তী তো তার শত্রুপক্ষ নয় ? না হোক,—ভাবল পঙ্কি,—তবু এত নিটোল জীবন সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

কেন, সেও কি কৌশিকের বৌদির কাছে কোন অপরাধ করেছিল, তবে তার জীবনকে এভাবে চূর্ণ করে দিলো কেন সে ? কেন ? কৌশিকের কাছে, তাঁর বৌদির কাছে হেরে গেছে ও। আজ না হয় কুন্তীকে হারিয়ে দিয়েই সে তার শোধ নেবে। বন্দুকের গুলীতে উড়ন্ত ঝাঁকের প্রথম পাখিটা না পড়ুক, শেষেরটা পড়লেই সে খুশী। অসম্ভব রাগ হয় তাঁর, নিদারুণ ঘৃণা জাগে কৌশিকের ওপর। কেন কৌশিক তাকে বিয়ে করেছিল ? সেও কি বৌদির

ইচ্ছাতেই, হাতের মুঠোয় এনে একটা মেয়েকে হারিয়ে দেবার উল্লাসে বৌদিই কি এই নাটকের যবনিকা তোলার নিশানা দেখিয়েছিলেন? নাগিনী?…

জলের কুঁজোটা কোন দিকে ভাই,—পঞ্চি শুধোল। গলাটা কেমন শুকনো শুকনো হয়ে উঠেছে।

দাঁড়াও দিচ্ছি আমি—কুন্তী ওঠবার উপক্রম করে।

—না—দু'হাতে ওকে জোর করে শুইয়ে দেয় পঞ্চি—তুমি বলে দাও, আমিই নিয়ে নিচ্ছি—

—ওই যে বারান্দার কোণে, ওই দিকে—

বারান্দায় বেরিয়ে এল পঞ্চি। কাঠের জাফরি কাটা বারান্দা। জাফরির ফাঁক দিয়ে অজস্র জ্যোৎস্না এসে বাঘবন্দীর ছকের মতো লুটিয়ে পড়েছে। মৃদু বাতাস এসে জুড়িয়ে দেয় ওর উত্তপ্ত শরীর। বুনো লতাপাতার মিশেল হাওয়ায় কেমন এক নেশা ধরানোর গন্ধ। অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পঞ্চি। নিশ্চুপ। আঃ, কি মিষ্টি হাওয়া! হঠাৎ চুরুটের গন্ধ এল নাকে। এত রাতে চুরুট খাচ্ছে কে। চমকে তাকালো ও, বারান্দাটা দিয়ে বাংলোর সামনেটা দেখা যাচ্ছে বেশ। সেখানে কয়েকটা ডেক চেয়ার ছড়ানো ইতস্তত। আর রেলিং-এ ভর দিয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট বোঝা গেল সে পরিতোষ। ফরেস্টার পরিতোষ চ্যাটার্জি; কুন্তীর স্বামী।

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে পঞ্চির মাথা। হিংস্র প্রতিশোধাতুর মনটা ফণা তুলিয়ে ওঠে আহত কালকেউটের মতো। এই তো, এই তো, কি? সুযোগ?…না, পরিতোষ ওকে দেখে নি? ওর চোখ বাইরে, বন-জ্যোৎস্নার রূপ দু'চোখ ভরে পান করছে ও, পান করছে আরণ্যক নির্জনতায়। ঘরে ঢুকে পা টিপে টিপে দেখল পঞ্চি, কুন্তী ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর সুখসুপ্তির আয়েশী শ্বাসপ্রশ্বাসের ভারি শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। পা টিপে খুট করে দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসে ও। পেছনে খাটটা যেন নড়ে উঠল একটু, কুন্তী কি তবে জেগে উঠেছে? রুদ্ধশ্বাসে খানিকক্ষণ দাঁড়ায় পঞ্চি, না, জাগে নি,

ধীর সতর্ক পদক্ষেপে ও এগিয়ে আসে সামনের বারান্দাটার দিকে। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো ও, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঃ চমৎকার। মনে মনে নিজেকে শক্ত করে নেয় পঙ্কি। জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করতে চলেছে ও, তারই চরম প্রস্তুতি সেরে নেয়। ভয় নেই, অভিনেত্রী কাজলী দেবী, ভয় পেয়ো না তুমি !··· ক্যামেরা, সাউণ্ড স্টার্ট···অলক্ষে পরিচালকের নির্দেশ শুনতে পেল যেন পঙ্কি। তারপর এগিয়ে এল আস্তে।

—ঘুম পাচ্ছে না আপনার ?—পরিতোষের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ায় পঙ্কি।

সঙ্কুচিত লজ্জিত পরিতোষ চমকে ওঠে,—না, মানে বাইরে বেশ ঠাণ্ডা! কিন্তু আপনার কি হল ?

—মাথাটা বড্ড ধরেছে,—বললো পঙ্কি,—মাঝে মাঝে মাথাটা আমার কেমন যেন করে ওঠে—

—ভালো নয়। শুনেছি স্টুডিওতে তীব্র লাইট আর গুমোট গরমের মধ্যে কাজ করতে হয়, হয়তো তাতেই হবে,—সমবেদনার ঠাণ্ডা গলা পরিতোষের।

না, এত নরম হয়ে এগোলে চলবে না।

বাবা, কি বিশ্রী করছে মাথাটা—রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরে পঙ্কি, সামনের দিকে ঠিক ততখানিই ঝুঁকে পড়ে ও, যতখানি ঝুঁকলে কাঁধের ওপর থেকে আঁচল খসে পড়তে পারে। আগুন আসুক চোখে, নেশা লাগুক মনে।

—তাহলে মিঃ আয়ারকে ডাকব, না হয় কুন্তীকে ডাকি—ব্যস্ত হয়ে ওঠে পরিতোষ।

না, না—অসহ্য যন্ত্রণাকাতরকণ্ঠে ধ্বনিতে হল পঙ্কির গলা—কাউকে ডাকতে হবে না, কাউকে না। আপনি একটু ধরবেন আমাকে, এক্ষুনি কেটে যাবে এ অবস্থা, শুধু—যেন টাল সামলাতে পারছে না পঙ্কি।

শশব্যস্ত হয়ে দু'হাতে পঙ্কির কাঁধ জড়িয়ে ধরে পরিতোষ,

তারপর বললো—আপনি কোনরকমে আমার ওপর ভর দিয়ে আসুন, ওই ডেক চেয়ারটায় বসবেন চলুন—

তাই চলুন—নিবিড় হাতে পরিতোষের কোমর জড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করে পঞ্চি। উষ্কখুষ্ক চুল পঞ্চির, কোমর থেকে ছড়ানো আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে। খানিকটা এসে আচমকা পঞ্চির হ্যাঁচকা জোরালো একটা টানে পরিতোষ টাল সামলাতে পারল না। কাঠের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ত্রস্তে বাঁ হাতের ধারালো ক্লিপটা নিজেরই গালে ঘষে দিল পঞ্চি, যেন ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাতেই ওর গাল কেটে গেছে। আকস্মিক ঘটনাগুলোয় কেমন ঝিম মেরে যায় পরিতোষ। তারপর নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ও ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় পঞ্চির সঙ্গে। আর সুযোগ বুঝে হঠাৎ তীব্র আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো পঞ্চি,—ছাড়ুন, ছাড়ুন বলছি। জানোয়ার, স্কাউণ্ড্রেল— পরিতোষ হকচকিয়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—আপনি এত নীচ, এত ইতর পরিতোষবাবু—অসংবৃত বেশবাস গুছোবার আয়োজন করে পঞ্চি। ওর চিৎকারে আয়ার এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, কুন্তীও আলুথালু পোশাকে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিতোষ।

আঃ এই তো চাই, মনে মনে ভাবল পঞ্চি, সফল, সফল প্রয়াস। লুটনো আঁচলটা কাঁধে তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে পঞ্চি, যেন ধর্ষিতা কোন শ্রান্তা মেয়ে।

আয়ার একেবারে নিশ্চুপ। ওর নির্বোধ চোখ ভাবাহীন আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে কুন্তীর চোখে। একবার ওর জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকালো পঞ্চি, তারপর আঁচল দিয়ে গালের কাটা দাগটার ওপর বুলিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল রক্তের লালিমাসিক্ত সাদা আঁচলটার চেহারা। সবচেয়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে পরিতোষকে। লম্বা জোয়ান একটা পুরুষমানুষের চোখে এত ভয়, এত বিস্ময় বুঝি আর কখনো ভাবাও যায় না। মৃত চোখ। কঠিন মুখ। কয়েকটি নিরুদ্বিগ্ন মুহূর্ত।

তারপর হঠাৎ শান্ত অথচ চাপা কণ্ঠে খুব আস্তে আস্তে বলল কুন্তী—চমৎকার অভিনয় করলে বৌদি। তোমার সমস্তটুকু অভিনয় আমি জল খেতে উঠে ও-বারান্দার 'বক্সে দাঁড়িয়েই দেখেছি। দরজা খুলে বেরুবার সময়ই ঘুম ভেঙেছিল আমার। যাক্—তারপর কি ভেবে ঘরে ঢুকে মুহূর্তেই বেরিয়ে এলো। হাতে একটা শিশি। বর্তমান নাটকের সবচেয়ে মহিমময়ী চরিত্র যেন কুন্তী, ঋজু, সংযমী, কঠোর। শিশিটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল কুন্তী,—পুরুষমানুষের দাঁতের দাগে মেয়েদের কোন ক্ষতি হয় না বৌদি, কিন্তু চুড়ির আঁচড়ের কাটা তো, টিটেনাস হতেই বা কতক্ষণ, নাও টিংচার আইডিনটা লাগিয়ে নিও—তারপর স্থবির অনড় পরিতোষকে শক্ত হাতে ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—বারান্দায় চেয়ারে বসে একটু জিরিয়ে নাও বৌদি, স্টোভ ধরিয়ে এক্ষুনি আমি তোমাকে এক কাপ চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—কি দাঁড়িয়ে আছো হাঁ করে, ইডিয়ট,—ঠাস করে আয়ারের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল পক্ষি। তারপর প্রচণ্ড জোরে টিংচার আইডিনের শিশিটা বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে! বাগানের লোহার জালি জালি রেলিংটায় লেগে তীব্র কাঁচ-ভাঙা আওয়াজে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো শিশিটা।

বেঞ্জী সাহেব। নাম জিজ্ঞেস করলে বলত—ফিলিপ ডি রোজারিও। অথচ বাইরের লোক ডাকে ওই বেঞ্জী সাহেব বলে, কেউ কেউ বা পাগলা সাহেব। ফিলিপ ডি রোজারিও কি করে রূপান্তরিত হল বেঞ্জীতে, সেটা গভীর এক গবেষণারই বিষয়। কে জানে, এ'দেশের লোক ইংরেজীকে বলে ইঞ্জিরি, সে 'ঞ্জ' টাই ফিলিপ সাহেবের হু'টি প্রখর বেজীর মতো চোখ থাকায় 'বেজী' কথাটার সঙ্গে জুড়ে গিয়ে ওই অদ্ভুত শব্দটার উৎপত্তি হয়েছিল কিনা, বাঙ্গের পলস্তারাতেই বুঝি বেজী দাঁড়িয়েছিল বেঞ্জীতে!

বেঞ্জী সাহেব নামেই সাহেব। ইংরেজী ভাষায় তার জ্ঞান 'টেক্ টেক্, নো টেক্ নো টেক্, একবার তো সি'—জাতীয়। ব্যস্, তার বেশী নয়। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা ওদের এক পুরুষের মাত্র। শোনা যায়, হঠাৎ মেঘনাপার রাণীচক গাঁয়ে নিকলসন নামে এক বুড়ো পাদ্রী হাজির হয়েছিলেন একদা, পরম কারুণিক যীশুর বাণী নিয়ে তিনি এদের গাঁয়ের পাপী-উদ্ধারের মহৎ ব্রত নিয়ে জোর প্রচারণায় নেমে যান, লোভের কাজল টেনে সারা রাণীচকের জেলে, ভূঁইমালী নমশূদ্রদের দীক্ষিত করে ফেলেন খ্রীষ্টধর্মে। দেখতে দেখতে একটা গির্জে গজিয়ে উঠল তরাসগঞ্জে, স্কুল গড়ে উঠল হুধপলাশপুরে সেণ্ট নিকলসন ইনস্টিটিউট নামে, বোর্ডিং-এর নাম রাখা হল মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছাত্রাবাস। এমনকি মেঘনাপার রাণীচকে একটা ছোট্ট স্টিমার স্টেশন পর্যন্ত হয়ে গেল বুড়ো নিকলসনেব চেষ্টায়। ভিনি, ভিডি, ভিসি! এই নিকলসনের আমলেই বেঞ্জী সাহেবের বাপ কুঞ্জ

ভূঁইমালী খ্রীষ্টান হয়ে গেল। কুঞ্জ ভূঁইমালীর ছেলের নাম হল—ফিলিপ ডি রোজারিও।

ফাদার নিকলসনকে আমি দেখি নি। তবে শুনে শুনেই তাঁর সম্বন্ধ অনেক জেনেছিলাম। আমি ছিলাম সেন্ট নিকলসনের স্কুলেরই ছাত্র, ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংএরই বোর্ডার। নিকলসনের কথা আমরা শুনেছি হেড মাস্টার স্যামুয়েল হরেন সরকারের গদ্‌গদ বক্তৃতায়, আর মাঝে মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ফাদার গ্রেগরীর সুসমাচার পাঠের ফাঁকে ফাঁকে। অজস্র 'ট' ভারাক্রান্ত বাংলায় ঈশ্বরের পুত্রের কাহিনীর মাঝে মাঝে তেজপাতার মতো ছড়ানো থাকতো টুকরো টুকরো নিকলসনের গল্প।

বেস্ত্রী সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার মনে রাখবার মতো। সাহাদের ছোটবাবু নতুন ঘোড়া কিনেছে। মস্ত কালো এক আরবী ঘোড়া। ঘোড়াটা দেখা গেল একটু পাগলাটে গোছের। পিঠে উঠেছো কি কথা নেই, খানিকবাদে এমন বিশ্রী চার'পা ছুড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োবে যে সওয়ারকে ছিটকে না ফেলে সে আর থামছে না। বাগ মানাতে সহিস গলদঘর্ম। মনে আছে ছোটবাবু প্রথমবার চড়তে গিয়েই পড়ে পা মচকালেন, চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার এলো ঢাকা থেকে।

সহিসটি থাকতো আমাদের বোর্ডিংএর সর্বশেষ ছোট কানা কুঠরীটায়। সঙ্গে ছিল তার দুটি মেয়ে আর একমাত্র ছেলে ঘেটু। ওই তার সংসার। দুরন্ত ছেলে এই ঘেটু। বুদ্ধিতে পাকা, শয়তানিতে চৌকস, স্বাস্থ্যে টইটম্বুর। একদিন রোববারের দুপুরে আস্তাবল থেকে বাপের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘেটু ঘোড়া নিয়ে উধাও। সহিসের চেঁচামেচিতে জানা গেল ঘটনাটি। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল.........

বেলা তিনটে নাগাদ রক্তাক্ত মৃত ঘেটুকে পৌঁছে দিয়ে গেল কিছু লোক। নকুড়হাটা পোলের নিচে নাকি পড়েছিল দেহটা, ঘাড়টা ভেঙে দুমড়ে গেছে, মুখটা থ্যাতলানো, সারা গায়ে

ক্ষতচিহ্ন। নিহত ঘোড়াটাকে পাওয়া যায় তিনদিন বাদে সেনডাঙার পুলিশ স্টেশনে। জনা দুই শিশুকে মেরে ফেলে আরও অনেককে আহত করে এক মুখ ফেনা নিয়ে পাগলা ঘোড়াটি যখন তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল তখন বড় দারোগার নাকি গুলি করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামা চুকতে বেশী সময় লাগল না। তারপর ঠিক হল, আমরা বোর্ডিংএর ছেলেরাই ঘেটুকে শ্মশানে নিয়ে যাবো।

শ্মশানে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন বেলা গড়িয়ে আসছে। সারা রাস্তা ধরে সহিসটি বাচ্চা ছেলের মতো একটানা কেঁদেছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। মেয়েটিও। মৃতদেহ নামিয়ে মেঘনার জলে হাত পা ধুয়ে সব ওপরে উঠেছি, এককোণে কাঠ মেপে মেপে দিচ্ছিল শ্মশানের মধু ডোম, এমনি সময় ছেঁড়া একটা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ফুলপ্যান্ট, আঙুল বেরিয়ে থাকা কেড-শু, (যার রঙ কোনদিন সাদা ছিল বললে এখন ইতিহাসে বংশক্রম বিচার করে তবে বিশ্বাস করতে হবে) কালো রঙের সাদা ছোপ ছোপ একটা ছেঁড়া শার্ট, বেঢপ-একটা ফেল্টের টুপি, কাঁধে একটা চটা-ওঠা প্লেট ক্যামেরার বোঝা,—এই বিচিত্র বেশভূষায় একটা লোক এসে হাজির হল। লোকটার গায়ের রঙ অস্বাভাবিক কালো, আর মুখটায় যেন আরেক প্রস্থ আলকাতরা মাখানো। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মতো ছুঁচালো, কুতকুতে; লাল আর তীক্ষ্ণ, একটা বন্য হিংস্রতায় ক্রুর। অস্বস্তিকর চাউনি। এসেই নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসল,—মড়ার ছবি তুলতে হবে কোন?

—ছবি?—সমস্বরে প্রশ্ন করলাম আমরা।

—হ্যাঁ, ছবি না তো ম্যাজিক লণ্ঠন? তা ম্যাজিকও বলতে পারো। এমন ছবি তুলে দেব যে দেখে মনে হবে জ্যান্তো,—নিষ্ঠুর কর্কশকণ্ঠে একগাল হেসে নেয় সে,—কি, দেব তুলে? চার্জ খুব কম, 'ডেথ কন্‌সেশান' পাবে তার ওপর। তুলবো?—আশ্চর্য, লোকটার কণ্ঠস্বর কি নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত। যেন কোন

পিকনিকের ছবি তুলতে এসেছে ও, এমনি খুশিয়াল! শিবকে যে সবচেয়ে আপনভোলা নির্লিপ্ত কল্পনা করা হয়, তিনি কি এর চেয়েও নির্বিকার? এর চেয়েও উদাসীন?

আশ্চর্য মানুষ তো! আমাদের বিস্ময়ের ঘোরই কাটতে চায় না। খানিক বাদে একজন শুধোল সহিসকে,—কি সহিস, ছেলের কোন ছবি রাখবে নাকি?

আবার হাউমাউ করে এক পশলা কেঁদে নিয়ে সে জানালো. এ'রকম বীভৎস ক্ষতবিক্ষত মুখের ছবি রাখলে সে পাগলা হয়ে যাবে। না, তার কোন ছবি চাই না ছেলের।

পাগল নাকি,—কৌতুক কণ্ঠে হাসিতে ফেটে পড়ে লোকটি,—তোমার ছেলের চেহারা কোন্ কালে যিশাস্ ক্রাইস্ট ছিল বাপু, এতেই বরং বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। আত্মহত্যার কেসগুলোতে মাইরী চেহারাটা যেন আরো খোলতাই হয়। সেদিন রাজু মল্লিকের মেয়েটার কেরোসিন-পোড়া মুখটা, আহা, যেন মাদার মেরীর মতো দেখাচ্ছিল। শালী কোন্ পরপুরুষের ইয়ে ধরেছিল পেটে কে জানে। তা বেটির মরতেও হল। মরলো কেরোসিন ঢেলে—হো-হো করে এক ঝলক তেতো অশ্লীল হাসি হেসে ওঠে বেঙ্গী।

—চুপ করো,—লোকটার অসহ্য ইতরতায় চিৎকার করে ওঠে আমাদে ই একজন।

—যাও তুমি কেটে পড়। আমাদের কোন ছবিটবি চাই নে। এখন যাও,—আরেকজন তাড়া লাগাল।

—চাই না ছবি? খুব সামান্য চার্জ ছিল কিন্তু। পার শট ওন্‌লি সিক্স আনাস। আর মাইরী, ওই ছুঁড়ি ছুটো কেমন কেঁদে কেঁদে বেড়ে সুন্দরী হয়ে গেছে। ওই ছুটোকে মড়ার পাশে বসিয়ে ছবি তুললে, আঃ চমৎকার ছবি হয়। মনে হবে বায়োস্কোপের ফাস্ট ক্লাস একখানা সিন। হুঁ—তুমি এক্ষুনি এখান থেকে যাবে কিনা বলো,—আমাদের একজন তেরিয়া হয়ে রুখে উঠলো। জামার আস্তিন গুটোতে থাকে সে রীতিমতো।

চুপ করে যায় বেঞ্জী। কয়েকটি মুহূর্ত কুতকুতে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বোবার মতো। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে খলখল করে,—শালার এদিক নেই, ওদিক। যে না একটা প্যাঁচার মতো মড়া তার জন্তে দরদ কতো, একেবারে পঞ্চম জর্জের মতো মেজাজ—বলেই আর দেরি করে না, মুখ ফিরিয়ে হাঁটা শুরু করে। সিংবাজার হাটমুখো রাস্তাটা ধরে বরাবর চলে যায়। কোথায় যাচ্ছে কে জানে?

পাগল নাকি,—বিস্ময়ে বলে উঠেছিলাম আমি।

—আজ্ঞে না বাবু, উই বেঞ্জী সাহেব, ওনার ওই প্রিকৃতি,—বিকৃত উচ্চারণে বেঞ্জী সাহেবের পরিচয় জানায় মধু ডোম,—মড়া আলেই কুথেকে খবর পেয়ে যান, তক্ষুনি ছবি তুল্‌তে আয়েন পাগল সাহেব, শকুনের মতো গন্ধ পান মড়ার। আর তেনার কথাবার্ত্তা উই রকম, পাগলের মতোন। কিন্তু খারাপ মুনিষ নন।

বেঞ্জী সাহেবকে সেই আমার প্রথম দেখা। আলাপটা তার বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

দুধপলাশপুর থেকে মেঘনার দূরত্ব মাইলটাক পথ। প্রায় রোজ বিকেলেই আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম মেঘনা পার রাণীচক স্টিমার ঘাটে। কোনদিন খালি জেটিটার সামনে গিয়ে বসতাম পা ঝুলিয়ে, কোনদিন একটু দূরে মার্টিন সাহেবের পোড়ো বাংলা বাড়িটার বারান্দায় বসে আসর গুলজার করতাম, আবার কোনদিন মোটরলঞ্চের ঘাটে ভাসমান পন্টুনটায় গিয়ে বসতাম। এখানে মেঘনার চেহারাটা ভয়াল। এপার থেকে ওপার ধু-ধু। কালো কালো ঢেউয়ের দাপটে জেটি পন্টুন কাঁপতো থরথরিয়ে, অজস্র ঢেউয়ের মুকুটে পশ্চিমী রোদ রুপো গলাতো, ফেনার হাসিতে খুশির নূপুর বাজাতো, আর হাওয়ায় ভাসতো জলের মদো মদো গন্ধ। মেঘমিতা দুর্বার নদী মেঘনা, কালাবদর। ভাবতে এখনো রোমাঞ্চ জাগে, চোখের সামনে

স্রোতবতী অজগরটা নড়ে ওঠে, দুর্বিনীত কালো ঘোড়ার মতো নেচে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল নদীটা।

সেদিন রোজকার মতো বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমরা। মোট তিনজন। ঢেউএ দোল খাওয়া পন্টুনটার ওপর বসে সাহাদের ছোট বৌ'র বাচ্চা না হওয়ার কারণ-থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টে আমাদের স্কুলের পরাজয়, হেডপণ্ডিতের নস্যির কৌটো চুরি থেকে, কাননবালার অভিনয় সব রকম আলোচনায় আসর সরগরম। একেবারেই খেয়াল করি নি ওদিকে আকাশে ঘনিয়ে আসছে আসন্ন ঝড়ের সংকেত, কালবৈশাখী। মেঘের মুখ দেখে মেঘনা কামনাতুর আনন্দে উদ্বেল, বেপথুমতী শবরীর উল্লাসে যেন মেতে উঠেছে সে। যখন খেয়াল হল ঝড় শুরু হয়ে গেছে। সোঁ-সোঁ হাওয়ার শিসটানা আওয়াজে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে অশান্ত মেঘনার মাতলামি। প্রচণ্ড ঢেউএ আঁচড়াচ্ছে লোহার পন্টুনটা। ধুলোঝড় মেঘে চারদিক অন্ধকার। ব্রিজ পেরিয়ে হোস্টেলের দিকে দৌড়ুতে শুরু করলাম। কিন্তু যাবো কি, এক পা এগোচ্ছি তো হাওয়ায় হটিয়ে দিচ্ছে দু'পা। এগোনো যাচ্ছে না। খানিক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। তখন আমাদের একজন চেঁচিয়ে বলল,—ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে চলো উঠি। এ ঝড়ে এগোনো যাবে না মোটেই।

বেশ। রাজি সবাই। এবার সবার দৌড় আলোর নিশানায়। কোন পথে কোন জায়গায় যাচ্ছি কিছু জানি না। সে কি প্রাণান্তকর দৌড়। কাছে এসে দেখি সেটা মার্টিন সাহেবের পোড়ো বাংলোটা। কিন্তু এ বাড়িতে তো মানুষ থাকে না, তবে আলো এলো কোত্থেকে? ছমছম করে উঠল গা। ঝড়ের পাল্লায় এ কোথায় এসে হাজির হলাম আমরা?...

কিন্তু পেছনে সামনে ঝড়ের চাবুক, ভাববার সময় কোথায় তখন। দৌড়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত বাংলো বাড়িটাই ঝড়ের দাপটে মটমট করে উঠেছে, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় চার্লের

খানিকটা শন্ করে উড়ে চলে গেল। ভয়ে ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম ঘরের ভেতরে আলোটার দিকে।

কে? জানালা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে আসে। লন্ঠনের লালাভ আলোয় লোকটাকে চিনতে কষ্ট হল না আমাদের। বেঞ্জী সাহেব। চমকে উঠলাম তিনবন্ধু। সেই শ্মশানচারী ফোটোগ্রাফার।

—কে তোমরা, এসো ভেতরে এসো, ছাত্র বুঝি?—ভাবলেশ নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

দরজার দিকে এগোচ্ছিলাম আমরা হঠাৎ ধমকে উঠল বেঞ্জী সাহেব,—আঃ, ওদিকে নয়। দরজা এখন খোলা যাবে না। হয় জানালা দিয়ে এসে ঢোকো, নইলে বাইরে পড়ে ভেজো। যতসব জ্বালাতন বাবা—।

তিনজনই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম বার কয়েক। দরজা থাকতে জানালা কেন, কে জানে। লোকটার খারাপ মতলব-টতলব নেই তো কিছু?—

কালা নাকি তোমরা, শুনতে পাও নি? ঝড়ের ঝাপ্টায় ভিজছ কেন, চলে এসো না ভেতরে। দরজাটা বন্ধ করতে অনেক সাজসরঞ্জাম কসরত করতে হয়েছে আমাকে। সে আমি কিছুতেই খুলতে পারবো না; বাইরে তোমরা মরে গেলেও না।—

অগত্যা নিপাট জানালা দিয়ে একে একে তিনজনই ভেতরে ঢুকলাম। না, বেঞ্জী সাহেব বলেছে ঠিকই। ভাঙা দরজাটা যে-ভাবে নানা ভাঙা আসবাবপত্রের স্তূপ দিয়ে ঠ্যাকা দেওয়া হয়েছে, এখন তা সরাতে গেলেই হাওয়ার দাপটে বিস্ফোরণ অনিবার্য।

—হুঁ, তা হোস্টেলের ছাত্রই তো দেখছি। তা এত রাত্রে মেঘনা পারে আসা হয়েছিল কেন, মড়া পোড়াতে?—মুখটা কুৎসিত বিকৃত করে প্রশ্ন করে বেঞ্জী সাহেব।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ও মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকালে সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটাই বোধ হয় ভুলে যাবো। আলোটার চারদিকে

কতগুলো জহরব্রতী পোকার প্রার্থনা শোনা যাচ্ছে আর বাইরে একটানা ঝড়ের গোঙানি।

সে রাতেই বেঞ্জী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল আমাদের। গভীর আলাপ। আবহাওয়া আর পরিবেশ কোনটার প্রভাবে কে জানে, আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের পরই থেমে, কখনও উত্তেজিত হয়ে, কখনও বিকৃত মুখভঙ্গী করে, কিছুটা অনাবশ্যক পায়চারি করে, ভাঙা কথার জটলায় যে গল্পগুলোও বলল—সেগুলোকে এক করলে যে সুসম্পূর্ণ একটা কাহিনী গড়ে ওঠে, তা যেমন করুণ, তেমনি মর্মস্পর্শী। যেন এক বিয়োগান্তক নাটকের পরাজিত সম্রাটের উপাখ্যান। তেমনি মহৎ নিষ্ফলতা।

না আজকে ফসিল বেঞ্জী সাহেবকে দেখলে বোঝা যাবে না আগেকার সেই যুবক ফিলিপ ডি রোজারিওকে। আজকের শিলাপাহাড়ের তলায় কোথাও নেই সে অনুভূতির এতটুকু অঙ্কুর, সে বিরাট প্রাণৈশ্বর্যের, সে কস্তুরীনাভির এতটুকু সুবাসও নেই। আজ শুধু তার ভস্মাবশেষ, আজ শুধু তার মর্মর কাঠিন্য।

কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি এই বেঞ্জী সাহেবেরও হাসি কান্নার দিন ছিল, সর্বঋতুর আকাশ ছিল, সর্বরঙের সিম্ফনি।

আর ছিল টগর।

উপেন জলদাসের একমাত্র মেয়ে টগর দাসী। খ্রীষ্টান নয় ওরা, হিন্দুই। তবু কোন জাদুমন্ত্রে কে জানে, কে বলবে কোন দুঃসাহসে ভর দিয়ে ধর্ম অধর্মের সমস্ত বেড়া ডিঙিয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ক্রমে একে অন্যের মনমানুষ হয়ে উঠল।

কিশোর বয়সেই ক্লাস সিক্সে তিনবার গড়াগড়ি দিয়ে সেই সে যেদিন গির্জে থেকে বেরিয়ে ডুমুরগাছের তলায় হঠাৎ রেবেকার ঢিলে ছেঁড়া শাড়িটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে, তারপর মামাবাড়িতে পাঁচদিন ফেরারী জীবন কাটিয়ে এসে সারা পিঠে কুঞ্জর বেতের দাগ নিয়ে চারদিন না খেয়ে যে ন'দিন স্কুল কামাই করল বেঞ্জী সাহেব, সেখানেই তার স্কুলজীবনের ইতি।

তখনও অবিশ্যি মনের আকাশে কোন তারা ছিল না, পদ্মপাতায় তখনো শিশিরবিন্দুতে মুক্তো জ্বলেনি। মেঘনায় সাঁতার দিতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে যায় টগরের। তাকে বাঁচিয়েছিল—কে? কে আবার, বেঞ্জী সাহেব। তারপর কি অবাক, দেখা গেল সেই কিশোরী টগরই ওর ভালো লাগার মেঘনা সাঁতারে একদিন ওর ভালোবাসার মাটিতে উঠে বসেছে। গরঠিকানার ভাঙা নৌকা বুঝি শুকতারার নির্দেশ পেয়ে মরয়ুপঙ্খী হয়ে উঠেছে হঠাৎ। ওরা কখন দু'জন দু'জনের কাছে হার মেনে বসলো তা আর ভেবে ভেবে বুঝতে পারলো না কিছুতেই, পৃথিবীটা রাতারাতি এত সুন্দর হল কেমন করে।···

টগরের বাপের তীব্র শাসন ছিল, আর কুঞ্জর শাসনও ছিল সমান হিংস্র। তবু টগর আর বেঞ্জীর বিনা সাক্ষাৎকারে একটি দিনও কাটে নি, কোন নিষেধের প্রাচীরই বাদ সাধতে পারে নি ওদের মনের ফল্গুস্রোতে। দিনগুলো গান হল, আর রাতগুলো কবিতা। একরাশ প্রজাপতি-দিনের মৌসুমী। কিন্তু ভুললে চলে না, আজকের পর কাল আছে। আর কালের পর পরশু। তাই একদিন হাপুস কেঁদে জানায় টগর, তার নাকি বিয়ে।

চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে ওঠে ফিলিপের, চোখের মণিদুটো ঝলসে ওঠে ফসফরাসের মতো।—বিয়ে? তারপর খপ করে ওর একটা হাত ধরে ফেলে বলে,—চল, আমরা তাহলে পালাই টগর।

পালাবো?—ফ্যালফ্যাল করে বোকাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে টগর। কোন জবাব দেয় না।

তক্ষুনি সায় না দিলেও কয়েকদিন আলাপের পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ওরা পালাবে। কোথায় যাবে? কোথায় আবার— কোলকাতা। কোথায় উঠবে? ফিলিপের এক মামাতো ভাই নাকি কাজ করে কোন এক মোটর মেরামতের কারখানায়, সেখানে ফিলিপ চিঠি লিখে দিয়েছে এর মধ্যে। টাকা? ফিলিপ কথা দেয়, সে ভাবতে হবে না, তার ব্যবস্থাও ভাবা আছে।

রাণীচক স্টিমার ঘাটের ওয়েটিংরুমে সেদিন একা একা সারারাত ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিল টগর। রাত দেড়টায় স্টিমার এলো, লোক ওঠানামা করলে, সার্চলাইট ঘুরল, সিটি বাজাল সারেঙ, চলেও গেল তারপর, শূন্য হয়ে গেল স্টেশন। কিন্তু ফিলিপের কোন হদিস নেই। সারারাত শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষার পর ভোরের দিকে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এল টগর। নির্ঘুম রাত্রি আর নিদারুণ নিষ্ফল প্রতীক্ষার পর টগরকে কেমন দেখাচ্ছিল সে শুধু বলতে পারবে সেই অভিসার রাত্রির শেষ প্রহর।

ভুল নয়, সব খবরগুলোই ঠিক ঠিক জানতো ফিলিপ। জানতো কাল স্কুলের মাইনে, আর একদিন আগে সমস্ত টাকাটা স্কুলে হেডমাস্টারের ড্রয়ারে জমা থাকে। এই খবরটুকু জানতো বলেই, সে রাতেই টগরকে নিয়ে পালাবার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল ফিলিপ। কিন্তু একটা নতুন খবর জানতো না ও, জানতো না যে আজকাল গরম হলে দরোয়ান বেটা তার ঘরে না শুয়ে টিচার্স রুমের বড় টেবিলটার ওপর শোয়, দক্ষিণমুখী জানালার সুবাতাস দাক্ষিণ্যের আরামে। বিপত্তি ঘটল তাই। অভাবিত অঘটন।

ড্রয়ারটা নকল চাবিতে খুলেছিল ঠিকই, কিন্তু ড্রয়ারটা টানবার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কাঁচা পয়সা-ভাঙানি ঝনঝন আওয়াজ করে উঠল। পেছনে দৌড়ুবার আর অবসর পেল না ফিলিপ। তার দীর্ঘ দু'টি সবল বাহু সাঁড়াশির মতো ওর গলায় চেপে বসেছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে ফিলিপের, চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার দানা বেঁধে ওঠে।

চার মাসের আর. আই. হয়ে গেল ফিলিপের। সশ্রম কারাদণ্ড।

ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দিনেই বিয়ে হয়ে গেল টগরের। স্বামীর সঙ্গে চলে গেল সে ভিন গাঁ শ্বশুরবাড়ি। ঘোড়াশাল ছাড়িয়ে সেই কলমীগঞ্জ না মৌপতা যেন।

চারমাস পর ছাড়া পেল ফিলিপ। কিন্তু বাপের চৌকাঠ সে

মাড়াতে পারল না। দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল কুঞ্জ, খেঁকিয়ে উঠল সতেরো বছর পর ফের বিয়ে করা কুঞ্জর নতুন বৌ।

অনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন যাত্রা শুরু হল ফিলিপের, নোঙরহীন নৌকা।

এটা আর ওটা। টুকিটাকি ইতিউতি কাজকিসিমে কাটল কিছুদিন। মনের ভেতর একটা বোবা শূন্যতা, চোখের সামনে মেঘলাঞ্ছিত বিবর্ণ আকাশের কুহেলী। তার জীবনের রঙই বুঝি হারিয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে সব ফুলের গন্ধ। এমন কি টগরেরও।

টগর? ফুঃ, সব ঝুটা।

নরসিংদি স্টেশনে ওস্তাদের চায়ের দোকানে কাজ করতে করতে হাসি পেত তার। সুতীক্ষ্ণ চোখদুটোর পাতা পড়ত ঘনঘন। সব ধোঁয়া। দিলখোশ তো সব খোশ। একটা বেপরোয়া 'যা-খুশী-তাই' করবার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে ফিলিপ। নির্বিকার চিত্তে মদ ধরে ও, ফোর্থ ক্লাস মফস্বল টকিতে বসে শিস টানে, অশ্লীল কথায় আসর গেঁজিয়ে তোলে, পকেট ভারি থাকলে বে-পাড়ায় গিয়ে দু'চার রাত কাটিয়ে আসতেও পেছ'পা হয় না।

তারপর যুদ্ধ।

সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওঅর। বোমা বারুদ রক্তের নির্মম ব্যবসা।

সেকেণ্ড ফ্রন্ট, ঈস্টার্ন রাইফেল, রয়েল ইণ্ডিয়ান আর্মি, কুমায়ুন রেজিমেণ্ট, ডিফেন্স ব্যাটালিয়ন, প্লটুন নাম্বার সিক্স বাই এফ···

যুদ্ধে যোগ দিল ফিলিপ। সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হল বণ্ড সই করে। ট্রেনিংএ ঘুরলে হরেক জায়গা, বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। শেষ সেণ্টার ছিল তেজগাঁ। তারপরই বরাবর ফ্রণ্টে। কিন্তু ফ্রণ্টে যাওয়ার আগেই—

সেদিন একঘেয়ে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল সকাল থেকে। বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে আর গুমোট আবহাওয়া। মনমেজাজ তেমন শরীফ ছিল না ফিলিপের। দিনটা আবার রোববার। সাপ্তাহিক মাইনেটা যথারীতি কাল পাওয়া গেছে। দু'চার পাঁইট টেনে আসবে নাকি?

থাক, ভালো লাগছে না। বাইরে বেরুলেই তো কাদা আর ঘ্যান-ঘ্যানে বৃষ্টি। তারচেয়ে চুপচাপ শুয়েই থাকা যাক, সেই ভালো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শেডের ভেতরকার কালো টুপিওয়ালা মৃদু বাবগুলো জ্বলছিল মিটমিট করে। কয়েকটা বর্ষার পোকা ম্লান আলোটার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন তন্দ্রায় চোখদুটো জড়িয়ে এল, ঘুমে ভরে গেল চেতনার সমস্ত আকাশ। ঘুমিয়ে পড়ে ফিলিপ।

এই শালা ওঠ,—চাপা কণ্ঠে ডাকতে থাকে কে, ধাক্কা দিয়ে ফের বলে—ওঠরে শালা, খাসা একটা মাল পাওয়া গেছে, চল—

আরে চল না, দ্বিতীয় জনের ধাক্কা।

চোখ রগড়ে উঠে বসে ফিলিপ, বুঝতে বুঝি খানিকক্ষণ সময় লাগে ওর। বাইরে তখন বৃষ্টির একঘেয়ে কান্না। মনটা হঠাৎ কেমন চাঙা হয়ে ওঠে ফিলিপের। ম্যাজম্যাজ শরীরে মেয়েদের বিনুনির মতো সর্পিল একটা অনুভূতি পাক খেয়ে ওঠে। নিমিষে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কোথায় রে, কদ্দূর? লোভী চোখে প্রশ্ন করে সে। এ'রকম অভিসারে বেরুনো সৈনিকজীবনে তার নতুন নয় কিছু।

—কাছেই, ভাগুচরণের খালি গুমটি ঘরে এনে রাখা হয়েছে। চ' শীগ্‌গির। শালা ভিখিরী হলেও কড়া মাল মাইরী। চ' চ'—

সবসুদ্ধ ছ'জন। ছ'টি জানোয়ার। ছ'টি ক্ষুধার্ত হায়েনা। একজনের হাতের মুঠোয় একটা হাফ পাউণ্ড রুটির টুকরো। এই টুকরো আর সামান্য কিছু পয়সা, বড়জোর টাকাখানেক, ব্যস ছ'জনের জন্যে মেয়েটির ঐ মজুরী। উপায় নেই, তাড়া করে ফিরছে তেরশ পঞ্চাশ!

বাই টার্ন যেতে হবে, একের পর এক। শংকরই ঢোকে প্রথমে। গুমটিঘরের বাইরে ওরা বাকি পাঁচজন গজল্লা জুড়ে দেয়, নোংরা প্যাচপ্যাচে হাওয়ায় ভাসে আনকোরা আর্মি কোয়ালিটি লাকি স্ট্রাইকের গন্ধ। মাঝে মাঝে একজন উঠে একটু পাহারা দেয়,

চারদিকে সতর্ক নজর রাখে, বুটের তলায় কাদাজলের বুদ্বুদের আওয়াজ শোনা যায়। টিনের চালে বেজে চলে বৃষ্টির একটানা নূপুর।

তারপর আনোয়ার, মাইকেল, রাধিকাচরণ, হিমাংশু। একের পর এক। ঢুকল ; বেরুলো।

—এবার যা ফিল্‌পে, মাগী পটলই তুলেছে কিনা কে জানে। যা—

দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢোকে ফিলিপ। ঘরের কোণে একটা ধূমায়িত লণ্ঠন ধূম্রউদ্গিরণে চিমনিটাকে কালো করে তুলেছে। আলোর বদলে লণ্ঠনটা যেন অন্ধকারের ঘনত্বটাকে প্রকট করে তুলেছে।

কোণের দিকে, যেখানে অন্ধকারটা সবচেয়ে জমাট, সেখানে একটা ছেঁড়া চটের ওপর শুয়ে আছে মেয়েটি, সাড়াশব্দহীন, নিশ্চল দেহ। মরেই গেছে নাকি? মেরে ফেলেছে নাকি ওরা? ভয় পায় ফিলিপ। মেয়েটির মুখের ওপর হাত রেখেই সে চমকে ওঠে। জল-জল ভেজা-ভেজা কি যেন লাগল হাতে।

পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বের করে ফিলিপ। জ্বালে।

না, হয়তো প্রচণ্ড চিৎকার করাই উচিত ছিল ওর। কিন্তু বোবা বিস্ময়ে সে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল পাথরের স্ট্যাচুর মতো। হাত থেকে পড়ে গিয়ে নিভে-যাওয়া টর্চটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল কোথায়। মেয়েটির গালে চাকা চাকা দাগ। রক্ত জমাট। কোনটা থেকে আবার রক্ত চুইয়ে চুইয়ে এসে পড়েছে কানের পাশে রুক্ষ চুলের অরণ্যে। উঃ, অসহ্য।

অসম্ভব তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা। টগরের বোজা চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন তাকে সূচের মতো বিদ্ধ করছে। মাথার শিরা ছুটিতে গতিবেগের কুরুক্ষেত্র।

দৌড়ে বেরিয়ে এল ও। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ক্লান্ত কুকুরের মতো। সারা শরীরে ঘামের ফোয়ারা।

—কিরে শালা, মেয়েটাকে একেবারে গয়া করে এলি নাকি। খতম একেবারে?

—জানি না, নিরুত্তাপ জবাব দেয় ফিলিপ।

পরদিনই ডেজার্ট করে ফিলিপ। বণ্ডের প্রাচীর টপকে সৈন্যবাহিনী থেকে পালায় ও। পেছনে ওয়ারেন্টের শিকারী দৃষ্টি ঘুরবে জানে ফিলিপ, জানে ধরতে পারলে কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে হয়তো। তবু বেপরোয়া ফিলিপকে পরদিন ভোরের প্যারেডের সময় তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না কোথাও। ফিলিপ-ডি-রোজারিও—ফেরারী।

তারপর কতো শহর, কতো গ্রামে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ালো ফিলিপ। আজ এখানে কিছুদিন, তারপর আচমকা হাওয়া, কিছুদিন বাদে দেখা গেল আরেক জায়গার বাজারে সিগারেট কিনছে ও। বর্ধমানের গণ্ডগ্রাম থেকে মেদিনীপুর শহরে, পূর্ণিয়া থেকে কোলকাতার শহরতলি, কতো জায়গাই না ঘুরে বেড়ালো। ঘা খেয়ে খেয়ে মনের মাটি কখন পাথর হয়ে উঠল, পলিমাটি রূপ নেয় শিলাপাহাড়ে।

পূর্ণিয়া থাকতেই ক্যামেরায় হাতেখড়ি। ওখানে এক ফটো-গ্রাফারের দোকানে চাকরের কাজ করত ও। তারপর কিছুদিন নাম ভাঁড়িয়ে নারায়ণগঞ্জে ফটো তোলার কাজ শেখে ও। এই নারায়ণগঞ্জের ফটোগ্রাফারটি ছিল শ্মশানের ফটোগ্রাফার। মৃত লোকদের ছবি তোলাই তার ব্যবসা। নাম মনে আছে গগন কুশাই। অভ্যাসে অভ্যাসে তার হৃদয়ানুভূতিগুলো কংক্রীট হয়ে গেছে। প্রথমে এই শুষ্ক মমতাহীন নিষ্ঠুর লোকটার সাহচর্য কেমন অসহ্য মনে হত ফিলিপের, কিন্তু ক্রমে সেও নির্বিকার উদাসীন শ্মশান ফটোগ্রাফারই হয়ে উঠল। মমতার অঙ্কুর চাপা পড়ে গেল ব্যর্থতার পাষাণে।

শ্মশান ছাড়াও আরেকটু বিস্তৃততর ছিল গগনের ব্যবসা। নারায়ণগঞ্জের বিশেষ হাটহাঙ্গামা খুনজখম, অ্যাকসিডেন্ট, ইত্যাদির ছবিও তুলত সে। কোলকাতার কোন এক দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল গগনের।

সেদিন ট্রেনে চাপা পড়া একটি গর্ভবতী মেয়ের ছবি তুলে আনে

গগন। ফিল্মগুলো প্রিন্ট ও ডেভলপের দায়িত্ব পড়ে ফিলিপের ওপর।

নেগেটিভটায় চোখ আটকে যায় ফিলিপের। গাড়ির চাকাটা পেটের ওপর দিয়ে চলে গেছে। পেট থেকে নিচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব দলা-পাকানো একরাশ মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, আলাদা করে চেনবার এতটুকু উপায় নেই। কিন্তু মুখটা স্পষ্ট। স্পষ্ট বোজা চোখ দুটিও। প্রিন্ট করার পর আর সন্দেহ করবার কারণ রইল না।

টগর।

উঃ, এখানেও টগর? টগর কি ওকে তাড়া করে ফিরবে চিরকাল? সারা জীবন? দাঁতে দাঁত চাপে ফিলিপ। তারপর কি ভেবে সমস্ত নেগেটিভগুলো আর প্রিন্ট কয়টি নষ্ট করে ফেলে। না, এ টগরের বীভৎস ছবি কাগজে ছাপানো চলবে না, কিছুতেই না। ক্যামেরাটা কাঁধে ফেলে দৌড়ে বেরিয়ে যায় ফিলিপ।

খোঁজ নেয় হাসপাতালে, ছুটে যায় মর্গে, লাশ-কাটা ঘরে। এই খানিকক্ষণ—ওরা জানায়, ওকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্মশানে?

শ্মশানমুখো দৌড়য় ফিলিপ। পথে পকেটের সমস্ত পয়সা দিয়ে একরাশ ফুল কেনে। ওকে আজ ফুল দিয়ে মনের মতন করে সাজাবে ফিলিপ, শেষবারের মতো সারা জীবনের জমাট ভালবাসা আজ ফুলে ফুলে উজাড় করে দেবে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি। চিতাটা জ্বলছে দাউ-দাউ লেলিহান শিখায়, শেষবারের তীব্রতায়।

এই দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও,—বোকার মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ফিলিপ, চমকে ওঠে ওরা। হাসপাতালের কয়েকজন নতুন ডোম। এরা চেনে না ফিলিপকে। একজন শুধোল,—তোর কুছ হয় নাকি এই পাগলী বিটি?

আমার?—নির্বোধ চোখে তাকায় ফিলিপ,—কি হয়? না কিছু হয় না। কি আবার হবে।

হোহো করে হেসে ওঠে ওরা।

—এ ভি আউর এক পাগলা আছে।

সমস্ত ফুলগুলো সকলকে চিতার আগুনে ছুঁড়ে দেয় ফিলিপ। সে চিতাবহ্নি ওর হৃদয়ের যেটুকুও মমত্ববোধের অস্তিত্ব ছিল তাও পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। পেছন ফিরে বেরিয়ে আসে ও।

সে রাতেই নারায়ণগঞ্জ ছাড়ল ফিলিপ।

তারপর?·········

তারপর আর কি, ঘুরতে ঘুরতে ফের এখানে। দেশের মাটিতে। থাকবার আস্তানা বলতে কিছু নেই। সাজসরঞ্জাম যা-কিছু তা পলাশডাঙার ভাঙা নীলকুঠীর জঙ্গলাকীর্ণ অপরিসর একটু কুঠুরিতে রাখে। আর শোওয়া? কোনদিন সিংবাজার হাটের ছাউনির তলায়, কোনদিন সাহাবাবুদের মণ্ডপঘরের সিঁড়িতে। কোনদিন এই পোড়ো বাংলোবাড়িটায়, কোনদিন বা মীনাবাজার ভাঙা মসজিদের চত্বরে। যখন যেখানে হয়।

এ তল্লাটে সব শ্মশানেই ঘুরে বেড়ায় ফিলিপ। ছবি তোলে, নরসিংদি থেকে প্রিন্ট করিয়ে এনে মৃতের বাড়ি পৌছে দেয়। শ্মশানে মড়া এলে যেন বাতাসের মুখে খবর পায় ও, মুহূর্তে সেখানে গিয়ে হাজির।

ফিলিপ? না, এখানে ও বেঞ্জী সাহেব। লোকমুখে কিভাবে কে জানে, ওর নামটা রূপান্তরিত হয়েছে ঐ বেঞ্জীতে। সবাই জানে ও হচ্ছে শ্মশানচারী বেঞ্জী সাহেব। আবার কেউ কেউ বলে,—পাগলা সাহেব।

ওর জাতধর্ম যে কি তা এ তল্লাটের সবার কাছেই আজো রহস্যময়। খৃষ্টান? তবে শেতলাতলায় ও যখন মাথা নোয়ায় তখন পাকা পনেরো মিনিটে একবারও মাথা তোলে না কেন? হিন্দু? তা'হলে মুন্সীপুরে গরু কাটার খবর পেলে ও কেন ছোটে গোস্ত খাবার দাওয়াত আদায়ের জন্যে? মুসলমান? তা'হলে কখনো মধু ডোমের সঙ্গে ওরকম জারিয়ে জারিয়ে শূয়োর খেতে

পারতো ? অদ্ভুত, বিচিত্র এই বেঞ্জী সাহেব। জীবন্ত একটা দুর্বোধ্যতা যেন।

বেঞ্জী সাহেব গল্প শেষ করলেন একসময়। ওর গল্প শুনতে শুনতে আমরা টেরই পাই নি এর মধ্যে কখন ঝড় থেমে গেছে। নির্মেঘ আকাশ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। মেঘনার বুকে অজস্র জ্যোৎস্নার মদির সোহাগ। বাংলো বাড়িটার ভাঙা সিঁড়ির বুকে ঢেউএর ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মিষ্টি জলতরঙ্গ। মন্ত্রমুগ্ধ আমরা তিনজন। বেঞ্জীও নিশ্চুপ।

হঠাৎ সমস্ত সুর কেটে গেল বেঞ্জীর কর্কশ কণ্ঠে। মোমের মতো মসৃণ নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তেতো গলায় বলে উঠল ও,—কি, হোস্টেলে ফেরার নামই নেই দেখ্‌ছি। এবার ঘরে গিয়ে মরো না কেন বাপু। কতো আর জ্বালাবে, বকে বকে তো ফেনা তুলে ফেললাম মুখে। যাও, এবার কেটে পড়ো তো বাছাধনরা।—কুৎসিত বিশেষণকে লজ্জা দেবার মতো বিকৃত হয়ে উঠল কাজল-কালো মুখটা।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমরা। তারপর না, দরজা নয়, জানালা দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম তিনজন নিঃশব্দে।

বাড়িটার চেহারা দেখেই আহত হয়েছিলাম। রাস্তার নামটাও এমন কিছু কুলীন নয়, শংকর ভটচাজ লেন। যদিও রাস্তাটা যতটা হরিজন ততটা আমরা আশা করিনি। ভেবেছিলাম, লেন হলেও রাইও লেন নয় নিশ্চয়ই, ইলেকট্রিক না থাক, গ্যাস-আলোর কাঁচ-গুলো অন্তত অটুট আছে। কিন্তু হতাশ হতে হলো। ভাবতে রীতি-মতো খারাপই লাগল যে এ রকম একটা কানাগলির এমন একটা বোবা রোগা ফ্ল্যাট-বাড়িতেই থাকেন নাম-করা গাইয়ে কনাদ চৌধুরী। নীরদই প্রথম গেটের কাছে নম্বরটা আবিষ্কার করে। কড়া নাড়তেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন।

—কাকে চাই?

—কনাদবাবু এ বাড়িতে—

—হ্যাঁ, দোতলায় উঠে যান।—ভদ্রলোক তক্ষুনি অদৃশ্য হলেন।

আমরা তিন বন্ধু একটুক্ষণ ইতস্তত করলাম। সিঁড়িটা দিনের বেলায়ই এত অন্ধকার আর রেলিংটা এমন দুর্বল যে দোতলাটা যেন এ বাড়ির পক্ষে একটা বিদ্রূপ। সিঁড়ির পরিখা পার হয়ে তবে সে উচ্চাবাসে আরোহণ করতে হবে। বৈতরণী পার হওয়ার প্রথম অভিযাত্রী হল সৌরেন। তারপর নীরদ, সবশেষে আমি। পা টিপে টিপে অনুসরণ করি, সতর্ক সন্ত্রস্ততায়। কয়েক ধাপ সবে উঠেছি, চোখটা অন্ধকারকে পরাভূত করে একটু বুঝি শক্তি সঞ্চয়ও করে নিয়েছিল, অমনি পেছনে একটা মেয়েলী গলা বেজে উঠল,—এই সনৎ!

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চেনা গলা। পুরনো, কিন্তু ঘষা

পয়সার আওয়াজের মতো অচল হয় নি এখানো। বেশ খানিকটা উঁচু থেকে শোনা গেল নীরদের হাঁক,—কই সনৎ, উঠেছিস? চলে আয়। ডানদিক বাঁচিয়ে, একটা ভাঙা পেরাম্বুলেটার রয়েছে, হোঁচট খাস নি যেন।

কিন্তু হোঁচট খেলাম। শারীরিক নয়, মানসিক। মুখ ফিরিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি—রমাদি না?

শেষ ধাপের ম্লান আলোকে বিষণ্ণ একটা প্রদীপের মতো রমাদি দাঁড়িয়ে। আলোছায়ায়, শাড়িতে ঘোমটায়, হলুদে সিঁদুরে সলজ্জ সংকোচে আর খুশিতে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো মনে হল রমাদি-কে।

—যাক, চিনতে পেরেছো সনৎ, ভাবলাম···এখানেই টুপ করে জলে ঢিল ফেলে দেওয়ার মতো চুপ করে যায় রমাদি। শুধু ক্রমবিস্তারী জলচক্রের গতিতে পুরনো-দিনের স্মৃতি আমার মনে বিস্তৃততর হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে একটু একটু।

—ওপরে, কনাদবাবুর কাছে যাচ্ছো বুঝি? কোন ফাংশান, না—

—ঠিক ধরেছো। কলেজ সোশ্যালে ওঁকে আমরা নেবার জন্যে এসেছি। রি-ইউনিয়ন হচ্ছে কিনা। কিন্তু তুমি, মানে—

—আচ্ছা, ওপর থেকে কাজ সেরে এসো। আমার এখানে চা খেয়ে তবে যাবে, আমি কিন্তু জল চড়াচ্ছি। ওই ঘর আমাদের, ওই দরজা।—ধীর পায়ে চলে গেলেন রমাদি। আমাদের এক-কালের দলনেত্রী, রমনার রমাদি।

অন্যমনস্কতার জন্যে স্বভাবতই হাঁটুতে লাগল। পেরাম্বুলেটারের গেরিলা-আক্রমণ সম্পর্কে তৈরি ছিলাম না। ভাবছিলাম এই রমাদির কথা, আমাদের চিরপরিচিত রমনার রমাদি। উঃ সে-সব কী দিন গেছে আমাদের, সেই বর্ণোজ্জ্বল আলাদিপ্ত কৈশোর!

—তোমার বন্ধুরা কোথায়? ব'সো ওই মোড়াটা টেনে, রান্নাঘরে এসেই ব'সো তা'হলে—আপ্যায়নে মুখর হন রমাদি।

—ওরা চলে গেল।

—কেন? কি আশ্চর্য, আমি তিনজনেরই জল চড়িয়েছিলাম যে।—ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন রমাদি, যদিও মনে মনে আমার ঐকিক সান্নিধ্যেই খুশি হন বেশি।

—ওদের এক্ষুনি আবার যেতে হবে অন্য জায়গায়, একেবারে সময় নেই। আর, তিন কাপ চায়ের জন্যে ভেবো না, আমি ক্রমান্বয়ে দশ কাপ চাপ খাওয়ার রেকর্ড রেখেছি।—সহজভাবে হাসতে চেষ্টা করি।

—হুঁ, কলকাতায় এসে অনেক গুণ হয়েছে! তা এখন বড় হয়েছো, দশ কাপ চা খাবে, দশ প্যাকেট সিগারেট খাবে, নস্যি নেবে, মদও খাওয়া চলে, তাই না?—শাসনশোভন কপট গাম্ভীর্যের রাংতা জড়ানো রমাদি। পরমুহূর্তে হেসে শুধোন—তা খবর-টবর কি সব বলো, এতদিন বাদে দেখা, প্রণামটা করতে না হয় ভুলেছো, আজকালকার ছেলে, ও'সব ঝামেলা হয়তো ভালো লাগে না, তা বলে ভালোমন্দ আলাপ করতেও ভুলে গেছো? পুরনো দিনের মতোই মুখর হয়ে ওঠেন রমাদি, কটাক্ষে স্নেহ ছিটিয়ে লঘুকণ্ঠে বলে চলেন,—তুমি যে একজন মস্ত সাহিত্যিক হয়েছো, কবি হয়েছো, ডাক্তারি পড়ছ, এসব খবর আমার জানা আছে। তুমি আমাদের খবর না রাখলে কি হবে, আমি তোমাদের একটু আধটু খবর রাখি, বুঝেচো? তা মাসিমা কেমন আছেন? নন্দার কটি ছেলেমেয়ে হলো? সুজিতের এখন কোন্ ক্লাস? নাকি, কলেজ? মাসিমার কি এখনো ফিট হয়?

প্রথম কাপ চায়ে আমার নিজের বলার ভাগ ফুরোল।

দ্বিতীয় কাপে জানা গেল রমাদির কাহিনী। বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। অবিশ্যি স্বামীর সঙ্গে আলাদা বাসা হয়েছে এই বছর খানেক। স্বামী পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, পার্কার কোম্পানীর জুনিয়র ক্লার্ক। সামান্য আয়, তার থেকেও আবার যাদবপুরে দিতে হয়, শাশুড়ী আর দুই ননদ ও এক ঠাকুরপো থাকেন

ওখানে, রেফ্যুজী কলোনীতে। টায়ে-টোয়ে চলে। হ্যাঁ, এই একখানাই মাত্র ঘর। আর এইটুকু রান্নাঘর। ভাড়া বত্রিশ টাকা। না, বাথরুমের বড় অসুবিধে, তিন ভাড়াটের ওই একটাই কল-পায়খানা, লাইট সুদ্ধ। -বেশি ভাড়া? তা কম ভাড়ায় আর কোথায় পাচ্ছি বলো, এ খুঁজে পেতেই দু'বছর। না, আজকাল থিয়েটার-ফিয়েটার সব ভুলে গেছি। রমনার সে-সব দিন আর নেই ভাই, উনুন ঠেলবো না প্লে করব, বলো?…

তৃতীয় কাপে সলজ্জকণ্ঠে অনুরোধটা জানালেন রমাদি।

কি? না, ছেলেমেয়ে হবে রমাদির। তা বলে কি করতে হবে আমায়? না, নাম ঠিক করে দিতে হবে।

—মামা হতে যাচ্ছো সনৎ ফাঁকি নয়। সাহিত্যিক মামা, ভাগ্নের জন্যে এবারে নাম ঠিক করো। বানিয়ে বানিয়ে তো তোমরা কেমন সুন্দর গল্প কবিতা লেখ, দু'টো সুন্দর নাম ঠিক করে দাও তো, দেখি মামা হওয়ার কতদূর উপযুক্ত তুমি।—লজ্জারক্ত গালে মিটিমিটি হাসির কুচি সারা মুখে ঝিকমিক করে ওঠে রমাদির।

—বেশ তো, কতো নাম চাই বলো না। এখুনি নাম বলে দিচ্ছি আমি। ছেলে হলে নাম রেখো—কৌস্তুভ, মেয়ে হলে—কস্তুরী। নয়তো, সৌরভ আর সুরভিও রাখতে পারো। যেটা খুশি।

—না না, অত ব্যস্ত হতে হবে না। খুব ভালো করে ভেবে আমাকে জানাবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই তেমন।—কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল ভাবী সন্তানের নামকরণে এতটা লঘুত্ব দেওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন রমাদি। নামকরণের মতো গুরুতর ব্যাপারে কতো প্রস্তুতি থাকবে, আয়োজন থাকবে, গভীর দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাধারা থাকবে, তা না, খট্ করে যেন পোষা কুকুরের নাম রাখার মতো দায়সারা গোছের ব্যাপার! এতে তাঁর ভাবী সন্তানের রীতিমতো অমর্যাদাই করেছি যেন আমি। রমাদির সারা মুখে এমনি একটা আহত লজ্জার রক্তিমা।

সংকুচিত হয়ে বললাম—বেশ। কয়েকদিন বাদে তোমাকে আমি নামের জাহাজ দিয়ে যাবো। দেখবে নামকরণ কাকে বলে।

—না না, বেশি নাম এনো না। বেশি আনলেই গণ্ডগোল। তুমি গুটিকয় নাম ঠিক করবে। তার মধ্যে দু'টি সিলেক্ট করা হবে। বেশী আনলে খালি খুঁতখুঁত করবে মন। কোন্‌টা রাখি কোন্‌টা ফেলি সে এক দুশ্চিন্তার ব্যাপার হবে। তা কবে আসছ বলো?

লুচির প্লেটের পরিত্যক্ত চিনিগুলোর ওপর নক্‌শা কাটতে কাটতে বললাম,—শীগ্‌গিরই। ধরো, রোববার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো, রোববারই এসো। আজ তো ওঁর সঙ্গে দেখা হল না, সেদিন ছুটির দিন, দু'জনের পরিচয় করিয়ে দেবো'খন। এসো কিন্তু।

কিন্তু তখনো উঠতে পারি নি, আরও প্রায় আধঘণ্টা পর উঠতে পারলাম। রমাদির কথা কি ফুরোবার! পুরনো দিনের জমাট কথাগুলো যেন আজকের চকিত-সাক্ষাতের ঝরনামুখে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন রমাদি।

—রোববার সকালেই আসবে, দুপুরে এখানেই খাবে, বিকেলে যাবে, মনে থাকে যেন। এ গলি পার হয়েই যেন রমাদিকে ভুলে যেও না। আর শোন—তোমার লেখা কয়েকটা বই-ও নিয়ে এসো, কেমন?

হেসে বললাম,—আমার বই! কি যে বলো রমাদি, এদিক ওদিক আজেবাজে মাসিক পত্রিকায় গল্প কবিতা লিখেছি দু'চারটে, আমার আবার বই কি!

—বেশ, তবে সে পত্রিকাই এনো কয়েকটা।

কথা দিলাম আসব, পত্রিকা আনব, আর ভেবে আসব গুটিকয় সুন্দর নাম।

কিন্তু—না, মঙ্গলবারই চিঠি পেলাম ভিগবয় থেকে। দিদিমার

বড় বাড়াবাড়ি অসুখ, মামা লিখেছেন, পত্রপাঠ যেন ছোট মাসিমাকে নিয়ে ডিগবয় রওনা হই।

শুক্রবার কোলকাতা ছাড়লাম। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে দেখা করি নি রমাদির সঙ্গে। শুধু একখানা পোস্টকার্ডে জানালাম— ফিরে এসেই দেখা করব আমি। নাম, পত্রিকা, কোনটার কথাই ভুলি নি। নাম যা ভেবে আসব—না, সে আর আগে ফাঁস করছি না! সে নামকরণের জোরেই ছেলে হলে প্রধানমন্ত্রী, আর মেয়ে হলে মাডাম কুরী না হয়!—ইতি।

দিদিমা মারা গেলেন তিন সপ্তাহ বাদে আর আমার ফিরতে লাগল আরও দু'সপ্তাহ। সবদিক গুছিয়ে বসতেই প্রথম মনে পড়ল রমাদির কথা।

পুরনো এক বোঝা আনন্দবাজারের 'আনন্দমেলা'র পৃষ্ঠা, যুগান্তরের 'পাততাড়ি' আর 'মৌচাকে'র ধাঁধার উত্তর ঘেঁটে ছ'টি ছ'টি নাম ঠিক করলাম প্রথমেই। একটা কাগজে লিখে নিলাম। ব্রততী, নূপুর, পূরবী, সাহানা, বিশাখা, অদিতি আর সৈকত, সন্দীপ, অর্ণব, সুদীপ্ত, অম্লান, পূজন।

ব্যস, এইবার রমাদিকে আমি খুশী করতে পারবো। নাম পেয়ে উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারবেন না রমাদি। সন্ধ্যার ধূপছায়া আলো তখন সবে স্লেট আকাশে মুছে আসছে। নাম-লেখা চিরকুটটা পকেটে পুরে আর খান-দুই কবিতা-ছাপা পত্রিকা নিয়ে আমি রওনা হলাম শংকর ভট্টচাজের গলির দিকে। কালীঘাটে ঘিঞ্জি বসতির মধ্যে গলিটা খুঁজে পাবো তো!

ঠিক পেয়ে গেলাম। কাঁচভাঙা ক্ষীণায়ু গ্যাসবাতি, খোয়া-ওঠা কঙ্কাল রাস্তা আর বোবা-বিধবা এলোমেলো বাড়ির সারি। দরজা নাড়তে হল না, আধ-ভেজানোই ছিল। ঢুকে স্বল্প ধোঁয়ায় ধূসর করিডরটুকু পার হয়ে রমাদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঢুকতে যাবো, পেছনে গলার আওয়াজ হল,—

কে, সনৎ? এসো, রান্নাঘরেই চলো বসবে।

ঘরের ভেতর থেকে শোনা গেল একটা পুরুষকণ্ঠে—আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও রমা।

—কে পরিতোষদা বুঝি? দাঁড়াও আলাপ করে নি।—দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাধা দিলেন রমাদি।

—না, যেও না। তুমি রান্নাঘরে গিয়ে ব'সো, আমি আসছি।

আশ্চর্য তো! সব কিছুই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে আমার। বিমূঢ়ের মতো ধীর পায়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলাম। একটা পিঁড়ি পেতে নিজেই বসলাম চুপ করে!

খানিক বাদে ঘরে ঢুকলেন রমাদি। ম্লান মুখ, সারা শরীরে করুণ ক্লান্তির স্বাক্ষর। বিষাদের ছায়াশরীর বুঝি। ঠোঁটে অনাবশ্যক হাসির কঙ্কাল ঝুলিয়ে বললেন রমাদি—কি ব্যাপার এতদিন বাদে যে।

—বুড়ি মরল কিনা তাই ফিরতে দেরি হল আমার।—সহজকণ্ঠে হাল্কা হতে চেষ্টা করি।

—ছি ছি, ওকি কথা? ও-ভাবে বুঝি বলতে হয় গুরুজনদের মৃত্যু সংবাদ।—একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন রমাদি।

নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমিই। এ থমথমে আবহাওয়া অসহ্য নিষ্ঠুর মৌন। বললাম,—আচ্ছা ও ঘরে পরিতোষদা,—ফের বাধা দিলেন রমাদি, হাত বাড়িয়ে পত্রিকা দুটো টেনে নিয়ে বললেন, —যাক, শেষ পর্যন্ত মনে করে এনেছো পত্রিকা। দেখি তোমার লেখা কেমন, কি লিখে অত নাম তোমার। পত্রিকা দুটোর পাতা উল্টোতে ঝুঁকে পড়েন রমাদি। বুঝলাম, কোথাও কোন কারচুপি আছে, কোন অসঙ্গতি! ইচ্ছে করেই এবার ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলাম আমি। সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দুষ্টুমি-ভরা গলায় বললাম,—আর যা এনেছি রমাদি, আঃ, একেবারে গুপ্তধনের নক্‌শা! কিন্তু, এক ডজন লুচি আর আধ ডজন-কাপ চা না হলে সে ঐশ্বর্য দেখানো যাবে না।

—কি ভাই?—মুখ তোলেন রমাদি, বলোই না।

—আশ্চর্য বুঝতে পারছো না? নামাবলী, বুঝলে নামাবলী! ছ'টি ছ'টি নাম এনেছি। নাম পিছু এক এক কাপ চা হওয়া উচিত, যাক, সেটা না হয় মাপ করে দিলাম। ফিফ্‌টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট। বসাও চা, নইলে দেখাচ্ছি না কিন্তু।

শুনে মুখটা কেমন পাঁশুটে হয়ে গেল রমাদির। কষ্টের হাসি টেনে বললেন, বেশ বসাচ্ছি চা, দেখি, তোমার নাম দেখি আগে।

যেন কত দামী জিনিস এমনি সযত্নে চিরকুটটা পকেট থেকে বের করে দিলাম।

মাথা নিচু করে নাম ক'টা পড়ে গেলেন রমাদি। আশ্চর্য, পড়তে কত সময় লাগে? মাথাটা যে আর তুলছেন না।

—রমাদি!—ডেকে উঠলাম আমি।

ঝরঝর করে এবার কেঁদে ফেললেন রমাদি। চিরকুটটা ভিজে উঠল সে চোখের জলে। কান্না-বিকৃত কণ্ঠে শুধু একবার বললেন—আমার নামের দরকার নেই সনৎ। তারপরই আঁচল চাপা দিলেন চোখে।

—কি হল, কাঁদছ কেন রমাদি? স্তম্ভিত বিস্ময়ে গলা বুজে আসে আমার।

কিন্তু আঁচল সরিয়ে মুখ তোলেন না রমাদি, কান্নার দমকে শুধু পিঠটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুললেন রমাদি। কান্নায় ফুলো ফুলো চোখ তুলে ষড়যন্ত্র-চাপা ফিসফিস অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন,—সনৎ, তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। তুমি আমার ছোটভাইয়ের মতো, ভাই হয়ে বোনের উপকারটুকু তুমি করবে না? লক্ষ্মী ভাই আমার, তুমি ডাক্তারি পড়ছ, এ জন্যে আরো বিশেষ করে বলছি। আমাকে, আমাকে একটা,—গলাটা মরীয়া মাঝির শেষ ভয় কাটানোর মতো কেঁপে উঠল কয়েকবার,—মানে, ঐ ওষুধ! এনে দিতে হবে তোমায়।

ওষুধ! কিসের ওষুধ!—বিস্ফারিত চোখে আমি অনিশ্চয়তার ভেলায় বসে অর্থের ডাঙা খুঁজি।—কি বলছ তুমি রমাদি?

—মানে,—রমাদি দু'বার ঢোক গিললেন,—পেটের বোঝাটা আমি খালাস করে দিতে চাই সনৎ, আমি মুক্তি চাই।—

—রমাদি!—প্রায় আর্তনাদ করে উঠি আমি।—এ তুমি কি বলছ রমাদি।

—ঠিকই বলছি—বরফের উপর দিয়ে ভেসে আসা নিশ্চিন্ত নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর রমাদির,—ভেতরে ভেতরে অনেক আগেই কাজ শুরু করেছিল। নিজে উনি টেরও পেয়েছিলেন, কিন্তু কাউকে জানান নি। না আমাকে, না অফিসে। কিন্তু অফিস ক্রমশ সন্দেহ করতে শুরু করে, ওরাই এক্সরে'র ব্যবস্থা করিয়েছে। টি-বি। তারপরই ছাঁটাই। এদিকে সংসার অচল হয়ে উঠেছে। উনি একজনই তো শুধু রোজগেরে ছিলেন। আসল খুঁটি ভাঙলে আর তাঁবু টিকবে কি করে বলো। আবার পরশু চিঠি এসেছে ঢাকা থেকে। মা লিখেছেন, পাসপোর্ট হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানে। তার আগেই ছোট বোনটাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে আসছেন। আমার এখানেই উঠবেন। মেয়ে আর জামাই ছাড়া মা'র যে কেউ নেই। কোনদিকে আমি আর পথ দেখতে পাচ্ছি না ভাই। এ কাজটা তোমাকে—

—না না!—প্রায় চীৎকার করে উঠি আমি,—কিন্তু পরিতোষ-দারও কি এই মত?

—উনিই তো প্রথম বলেছেন। এ-রকম দুর্দিনে নিজেদের পেটেই জুটছে না, এমন সময় একটা বাড়তি লোক,—

বসে থাকতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম শুধু,—এখন আমি যাই রমাদি।

—চা খেয়ে যাবে না?

—না।

—কিন্তু কাজটা করে দেবে তো ভাই, বেশি দেরি করলে আবার—

মাথা নিচু করে থাকি। চোখ তুলে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। গলাটা যেন কাঠ।

—যদি নিজে না এনে দিতে পারো না দিলে, অন্তত ওষুধের নামটা তুমি লিখে দিয়ে যেও ভাই। আমি কাউকে দিয়ে ঠিক আনিয়ে নিতে পারব। কালই দিয়ে যাও তো ভালো হয়, আসবে কাল? উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় অধৈর্য কণ্ঠস্বর রমাদির।

ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে বলি,—না না, আমি পারব না, এ অমৃত-সম্ভাবনার ঠোঁটে বিষ তুলে দিতে পারব না আমি, কিছুতেই না।—

কিন্তু না, কিছুই বললাম না। বলতে পারলাম না।

মনে হচ্ছে যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু কোথায় পালাবো, এ কানাগলির মুখটা কি আমি খুঁজে পাবো শেষ পর্যন্ত?···

রুস্তমচাচা

রুস্তমচাচার গাড়ির শুধু রঙ নয়, নম্বর, হর্নের আওয়াজ এমনকি পোড়া মোবিল অয়েলের গন্ধ পর্যন্ত আমাদের মুখস্থ ছিল। আর রুস্তমচাচা মানে কি?

রুস্তমচাচা মানে চকোলেট, রুস্তমচাচা মানে খেলনা, রুস্তমচাচা মানে দরাজ গলার উচ্চহাসি।

কি করে আমাদের পরিবারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হল চাচার বলতে পারব না। প্রথম অবিশ্যি আলাপ ডাক্তার হিসেবে বাবার সঙ্গে, তারপর সে সূত্রেই একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন চাচা, কি মন্ত্রে কে জানে ভাব জমিয়ে ফেললেন আমাদের সঙ্গে। ছোটদের সঙ্গে। ছোটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল রুস্তমচাচার। আমরা সব ভক্ত জুটেছিলাম চাচার।

হঠাৎ এতদিন বাদে সেই রুস্তমচাচার কথা মনে পড়ে গেল কেন জানি না। মাঝে মাঝে এমনি হয়, অনেকদিনের পুরনো স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বিস্মরণের সমুদ্র থেকে, মনে পড়ে আট বছর আগে কোন এক শীতার্ত রাতের চাঁদকে, ইরাবতীর ধারে সেগুন বনের ভেতর একক কোন কাঠের বাড়ির জাফরির ভেতর দিয়ে যাকে দেখেছিলাম আমি।

রুস্তমচাচার গল্প আমরা শুনেছিলাম মালীর মুখে, অনেকদিন পর। রুস্তমচাচা ততদিনে মারা গেছেন। মৃত্যুটা একটু রহস্যময়, রুস্তমচাচার মৃতদেহ ইরাবতীতে পাওয়া গিয়েছিল। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমরা ভুলেও গেছি তাঁর কথা, এমন সময় বোমা পড়ল রেঙ্গুনে, প্রোমেও। শহর থেকে তখন আমরা

পালিয়ে গেলাম সেই রুস্তমচাচার জঙ্গলবাড়িতে, সেটা তখন খালি, শুধু চাচার মালীটা থাকত একা। সেই আমাদের অনুরোধ করে ওখানে নিয়ে যায়। এবারই চাচার সমস্ত কাহিনী শুনিয়েছিল রহমান মালী।

কিন্তু তার আগে আমাদের প্রথমবারের অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার।

সেটাই বলি।

রুস্তমচাচাকে একদিন আমরা ধরলাম, চাচার বাসায় যাবো! একটু গাঁইগুঁই করল চাচা,—জঙ্গলের মধ্যে বাসা, কেউ নেই কাছেপিঠে, শুধু একটা মালী আর আমি, তোমাদের ভালো লাগবে না যে।

তারচেয়ে চলো লম্বা মোটর ড্রাইভ দি, তোমাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাই।—

না চাচা না,—আমি, ছোড়দি, বড়কা, ডাবলু সবাই প্রায় কোরাস গাইলাম। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। বললেন, কাল রোববার, কাল সকালে নিয়ে যাবো তোমাদের, সোমবার সকালে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

আমাদের নৃত্য তখন দেখে কে!

পরদিন সকালে গাড়ি এলো।

আমরা সবাই সেজেগুজে তৈরি। প্রোম শহরের বাইরে এইটুকু জানতাম, কিন্তু শহর থেকে কতদূর জানতাম না। গাড়ি এঁকেবেঁকে গভীর জঙ্গলে ঢুকল, তারপরও আরো অন্তত সাত আট মাইল ভেতরে রুস্তমচাচার বাড়ি।

বাড়িটা দেখে সত্যি বলতে দিনের বেলাতেই আমাদের কেমন গা ছমছম করতে লাগল। পুরনো কাঠের দোতলা, চারপাশের শুধু সেগুনের ঘন অরণ্য আর পেছনে ছোট্ট একটা ইরাবতীর খাড়ি।

কেমন বোবা বোবা, বিধবা বিধবা বাড়ি।

তারপর ভয় পেলাম কানা মালীকে দেখে, নাম জানলাম, রহমান। দেখলে সত্যি বেশ ভয় ভয় করে।

আমাদের বাড়িতে রেখে চাচা গেলেন বাজার করতে ফের গ্রামে।

বিপত্তি হল এসেই।

আবিষ্কারটা ছোড়দির। খালি বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে একটা সিন্দুক পাওয়া গেল। তালা খোলা।

আর এটা খুলি,—ছোড়দির দুষ্টবুদ্ধি উদ্বেল হয়ে উঠল। চারজনের ঘাম বার করা চেষ্টার পর লোহার ঢাকনি তোলা গেল। আর তুলেই আমরা অবাক।

মণিমুক্তো হীরে জহরত নয় অজস্র খেলনা, ব্যবহৃত কিছু—কিছু নূতন, আর ছোড়দির বয়সী কোন মেয়ের পোশাক থাক করে সাজানো। দামী কাপড়ের পোশাক, চোখ ঝলসানো। কার এগুলো?

চাচার তো মেয়ে আছে কোনদিন শুনি নি, তবে? আর এমন যত্নে এগুলো রাখারও কি কারণ থাকতে পারে? ছোড়দি ওসব ভাবছে না। ও হঠাৎ বেছে বেছে একটা ঘাগরা আর জামা বার করে পরে নিল। পরে সিঁড়ি দিয়ে বুঝি নিচে নামছিল, প্রচণ্ড একটা আর্তচিৎকার শুনে সবাই আমরা ছুটে গেলাম।

রুস্তমচাচার এ চেহারা আমরা কোনদিন দেখি নি। রাগে থরথর করে কাঁপছে চাচা আর ভয়ে ছোড়দি দাঁড়িয়ে পড়েছে পুতুলের মতো, নড়তে পারছে না।

ঝড়ের মতো উঠে এলেন চাচা, তারপর নিজে ছোড়দির পোশাকগুলো টানতে টানতে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন,— খোল খোল সব। কে তোমাকে এগুলো পরতে বলেছে, খোল।

চাচার হিংস্র-টানে ঘাগরাটা ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল, দৌড়ে ছোড়দি চলে এল ঘরে, আমরাও। সব সিন্দুকের জিনিস সিন্দুকে ভরে রাখলাম। তারপর চারজন কাঁপতে লাগলাম যেন যমের মুখে পড়েছি আমরা।

চাচা তখন এলেন না।

এলেন বেশ খানিক বাদে। এসেই নিজের দুর্ব্যবহারের লজ্জায় কেঁদে ফেললেন। ছোড়দিকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না। কে বলবে এই সেই রুস্তমচাচা, একটুক্ষণ আগে যে বদ্ধ উন্মাদের মতো ব্যবহার করছিল।

খানিকক্ষণ পর্যন্ত রুস্তমচাচা এমন কাণ্ড করলেন যে আমরা বেমালুম তার খানিক আগের চেহারা ভুলে গেলাম।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল রাত্তির বেলায়।

রাত্তির তখন আটটা হবে।

রুস্তমচাচা তার কাজে বেরিয়েছেন গাড়ি নিয়ে, বলেছেন— যাবো আর আসব, আর আসবার সময় তোমাদের জন্ম ঝুড়ি ভর্তি বাজি নিয়ে আসব, চমৎকরে সব বাজি। খুব মজা করা যাবে।

আমরা খুশিতে টইটুম্বুর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটালাম বাজির স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু কতক্ষণ আর মুখ বন্ধ করে ভদ্রলোক থাকতে পারে। আমিই বললাম সবাইকে, চলো লুকোচুরি খেলা যাক, সবাই এক পায়ে খাড়া।

খেলা চলল। এক সময় আমিই চোর হলাম। লুকোবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সোজা তেতলায়। হঠাৎ দেখলাম সিঁড়ির ঠিক শিয়রে একটা তালাবন্ধ ঘর। ঢোকবার কি কোনই রাস্তা নেই? সতর্ক চোখ মেলে দেখি। ব্যস, তারপরই ইউরেকা! সিঁড়ির রেলিং-এর শেষদিকে একটা জানালা, আধ ভেজানো। রেলিং ধরে ধরে খুব সাবধানে জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। রেলিং-এর দু'ইঞ্চি পরিসরে ভারসাম্য বজায় রাখা বেশ কষ্টকর, আর পা হড়কালেই সিঁড়ি গড়িয়ে একেবারে নিচে! কিন্তু লুকোতে হবে আমাকে, এমন লুকনো, কেউ বার না করতে পারে।

সুতরাং ভেজানো জানালা খুলে এক লাফে ভেতরে!

মাত্র ভেতরে ঢুকেছি অমনি শুনতে পেলাম ওদের অগ্রসরমান কলকণ্ঠ। নিঃশ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা উঠে আসছে।

আরে, এ কার গলা, রুস্তমচাচার গলা না?

ছোড়দির চেঁচানি কানে এলো।

খোকা বেরিয়ে আয় চাচা এসেছে।

আসছি,—জবাব দিলাম আমি। বেরিয়ে রেলিং-এ দাঁড়িয়েছি অমনি নিচ থেকে হুঙ্কার শোনা গেল রুস্তমচাচার।

আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম, অতি কষ্টে সামলে ঢিপঢিপ বুকে নেমে এলাম। রুস্তমচাচার হুঙ্কারে সবাই একেবারে নিশ্চুপ।

আমি থরথর। ধীর পায়ে সামনে এসে কঠিন গলায় বললেন চাচা,—ঐ ঘরে কেন ঢুকেছিলে?

—চোর—চোর খেলতে গিয়ে—

—কেন ঢুকেছিলে?—যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে বলে চলেছেন চাচা। সমস্ত মুখ আগুন রঙে রাঙা, চোখ দুটি হিংস্র দ্যুতিতে বিষাক্ত। তারপরই এক চড়।

প্রস্তুত ছিলাম না, ঘুরে ছিটকে পড়লাম দূরে। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। দুমদুম পা ফেলে নিচে নেমে গেলেন চাচা।

আমরা ভাইবোনরা সব হতভম্ব, ভয়ে সবাই কাঠ! রুস্তমচাচার পর পর দু'টো ব্যবহারই রহস্যময় মনে হল।

ডাবলু বলল,—চল দাদা, আমরা এখুনি চলে যাই।

ছোড়দি বলল, চল হেঁটে পালিয়ে যাই এখান থেকে। বড়কাও ঘাড় কাত। সবাই রাজি।

নেমে এলাম নিচে।

ছোট একটা ব্যাগ ছিল, তাতে টুকিটাকি সব ভরে নিলাম।

বেরুবার আগেই দেখি রুস্তমচাচা ঘরের দরজায়, দু'চোখ দিয়ে দরদর জল। বললেন,—তোমরা ভয় পেয়েছ জানি, থাকতে চাও না, সেই ভালো। চলেই যাও। বড় কষ্ট দিলাম তোমাদের, আর

এসো না। আর কোনদিন এসো না। এ বাড়িটা বড় খারাপ, বড় খারাপ।—

রুস্তমচাচার বেদনা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, এটুকু বুঝলাম কোথাও গভীর কোন দুর্বল জায়গা আছে রুস্তমচাচার মনে, যেখানে ঘা খেলে নিজেকে আর সামলাতে পারে না।

—তোমাদের আর খেতে বলব না, তোমরা যাও। শুধু এই বাজিগুলো নিয়ে যাও, ইচ্ছে হয় জ্বালিও। মালী, এগুলো গাড়িতে তুলে দে।—রুস্তমচাচা নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করি, তারপর মালীর সঙ্গে হেঁটে গাড়িতে চেপে বসি। নির্জীবের মতো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়বার আগে মালী শুধু বলল,—তোমরা সাহেবের ওপর রাগ করো না। সাহেবের মস্ত বড় একটা কষ্ট আছে, সেখানে ধাক্কা খেলে অমন খেপে যায়। আর আজই হচ্ছে সতেরোই এপ্রিল, বড় সাংঘাতিক দিন। তোমরা শেষ-পর্যন্ত এমন দিনেই এসেছিলে,—কেমন বোবার মতো চুপ করে যায় রহমান। তারপর ফিসফিস করে বলল,—লক্ষ্মী খোকা-খুকুরা, বাড়িতে যেন আজকের কাণ্ডকারখানা কিছু বলো না, সাহেবের মনটা খারাপ নয়, কিন্তু—আচ্ছা যাও—। স্পষ্ট দেখলাম রহমান মালীর কানা চোখ জলে ভরে এসেছে। গলা ভারি। ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করল। রাস্তায় কেউ একটা কথাও বলতে পারলাম না। সবাই চুপ।

কিসের সতেরোই এপ্রিল, কিসের কি, কিছুরই রহস্যোদ্ধার করতে পারি নি। বলা বাহুল্য বাড়িতে এসে কাউকে কিছু বলি নি আমরা।

তারপর থেকে রুস্তমচাচা কম আসতেন, তেমন হৈহৈ করতেন না। ঠিক তার এক বছর বাদে উনি মারা গেলেন। মৃতদেহ ইরাবতীর জলে ভাসছিল।

বাবার কাছে শুনেছিলাম মর্গে জানা গেছে মরার তারিখ, আশ্চর্য সেটা সতেরোই এপ্রিল।

তারপর অনেক দিন কেটেছে।

ভুলেই গেছি চাচার কথা। অতঃপর বোমা। শেষ পর্যন্ত বুড়ো রহমান মালীর অনুরোধে সবাই গিয়ে উঠলাম সেই বাড়িতে। রুস্তমচাচার পরিত্যক্ত বাংলোতে।

এইবার রহমান মালী জানালো সত্তেরোই এপ্রিলের রহস্য। সেটাই বলছি শুনুন।

বারান্দায় বসেছিলাম আমি। মস্ত বড়ো চাঁদ উঠেছিল আকাশে। জাফরি দিয়ে এসে বাঘবন্দীর ছকের মতো পড়েছিল দোতলার নির্জন বারান্দায়। সেখানে বসে জলভরা চোখে রুস্তমচাচার গল্প শোনাল রহমান। শোনাল তার অপমৃত্যুর মর্মান্তিক ইতিহাস। শীতের কনকনে হাওয়া ছিল, তার চেয়েও বেশী শীত ছিল রহমান মালীর গলায়।

রুস্তমচাচা যখন প্রথম প্রোমে আসেন তখন তিনি একেবারেই গরীব ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে তিনি এলেন সুদূর বর্মা মুলুকে। মা আর নতুন বৌ ফেলে, একা। এখানে এসে প্রথমে রিক্‌শা টানলেন কিছুদিন, কিছুদিন চায়ের দোকানে চাকরের কাজ করলেন। তারপর কাঠের ব্যবসায়ী ইয়ং পো-র কারখানায় কাজ পেলেন। ইয়ং পো-র নেকনজরে পড়লেন রুস্তমচাচা। বুড়ো পো ভালোবেসে ফেলল চাচাকে। ব্যস, এতেই সর্বনাশটা ঘটল। পো বাড়িতে নিয়ে যেতে শুরু করল চাচাকে।

সেখানে চাচা দেখলেন ইয়ান মিয়াওকে। ইয়ান মিয়াও ইয়ং পো-র একমাত্র মেয়ে। আগুনের মতো রূপ তার, আর আগুনের মতোই তেজ। সেই রূপ পাগল করে ফেলল ভারতবর্ষের উষ্ণ রক্তের জোয়ান ছেলে রুস্তমজী করাঞ্জিয়াকে। সে মেয়ের জন্য সব ভুলে গেলেন চাচা। মেয়েও সমান উৎসাহী। সেও নিজেকে সামলাতে পারল না।

মার কথা, নতুন বৌ-র কথা সব তুচ্ছ হয়ে গেল। রুস্তম-চাচার জীবনের একমাত্র মন্ত্র তখন—ইয়ান মিয়াও।

কিন্তু ভুল করেছিলেন, মস্ত ভুল।

ইয়ান মিয়াওকে বিশ্বাস করেছিলেন চাচা, সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন এক মিথ্যে কুহেলিকাকে। দুর্বার বর্মার উগ্র যৌবনের মধুকর ইয়ান মিয়াও। কোথাও থেমে থাকবার মেয়ে নয় ও, একজনের হৃদয় পেয়ে তৃপ্তি নেই ওর, একজন ওর ক্ষুধা মেটাতে পারবে না। ঘুরে ঘুরে বৈচিত্র্যের মধ্যে আনন্দ খোঁজে ও। সেই ওর স্বভাব। একে সামলাবে কি করে রুস্তমচাচা। বুকভরা প্রেম দিয়ে? অসম্ভব, রুস্তমচাচার ব্যর্থ জীবনই সে অসম্ভাব্যতার স্বাক্ষর।

বিয়ে করল চাচা ওকে। খবর পেয়ে মা আর বৌ ছুটে এসেছিল এখানে। কিন্তু চাচা তখন অন্ধ, উন্মাদ অবস্থা তাঁর। তাই প্রায় গায়ের জোরেই বাড়ি থেকে মা বৌকে বার করে দিলেন রাস্তায়। কাণ্ডজ্ঞানহীন রুস্তমচাচার জীবনের তখন একমাত্র সত্য ইয়ান মিয়াও। কিন্তু কি দাম দিল ইয়ান মিয়াও?

ওর বাপের সাহায্যে রুস্তমচাচা নিজে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে এর মধ্যে। এখন শুধু ইয়ান মিয়াও আর চাচা, শান্তিময় দাম্পত্য জীবন। কিন্তু যেখানে শান্তি, যেখানে স্বস্তি সেখানে কি থাকতে পারে ইয়ান মিয়াও? না, এ জাতের মেয়েরা তা পারে না। তাই একদিন চাচার প্রিয়পাত্র কারখানার দারোয়ান তেজবাহাদুর নেপালীর সঙ্গে পালিয়ে গেল ইয়ান মিয়াও। সামান্য একজন দারোয়ানের সঙ্গে! আর এই তেজবাহাদুরকে চাচা ছেলের মতোই ভালোবাসতেন।

মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল চাচার। এতবড় একটা কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে পারে এ তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি। ইয়ান মিয়াও কিনা পালালো সামান্য একজন নেপালী দারোয়ানের সঙ্গে? সমস্ত কাজকর্ম ভুলে গেলেন চাচা। ইয়ান মিয়াওকে খুঁজতে লাগলেন পাগলের মতো। পেলেন না। কয়েকদিনের ভেতর বিশ্রী চেহারা হয়ে গেল চাচার, চান নেই, খাওয়া নেই। দেখে সবাই ভয় পেল। মরে যাবে না তো লোকটা!

কিন্তু পাঁচ মাস বাদে ফিরে এল ইয়ান মিয়াও। শুধুই ফিরে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো কুৎসিত যৌনব্যাধি, তবু এমনভাবে এলো যেন কিছুই হয় নি, তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি এতটুকু, তাঁর স্থানে সে এখনও অটুট। কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না চাচা, নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—কোন জবাবদিহি চান না তিনি তাঁর কাছে, শুধু এইটুকু কথা চান সে যেন চাচাকে ছেড়ে আর না যায় কোথাও। ইয়ান মিয়াও মাথা নাড়ল। বলল,—যাবে না।

আবার সুস্থ হয়ে উঠল চাচা, তারপর রেঙ্গুন থেকে বড় ডাক্তার আনল ইয়ান মিয়াওর চিকিৎসার জন্য। ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠল ইয়ান মিয়াও। নরক থেকে ফিরে এলো সুস্থ জীবনের স্বর্গে। কিন্তু ফিরে কি এলো তাঁর হৃদয়? তার প্রেম? না।

দারোয়ান গেল। রেখে গেল চিহ্ন। রোগ। রোগ গেল ডাক্তারের দৌলতে, কিন্তু ডাক্তার গেল না। ডাক্তার জড়িয়ে পড়ল ইয়ান মিয়াওর জালে। ডাক্তার হল দ্বিতীয় শিকার।

রুস্তমচাচা দেখেও কিছু বুঝতে পারতেন না, ঠেকেও কিছু শেখেন নি। শেষ পর্যন্ত মাস সাত ঘুরতে না ঘুরতে ইয়ান মিয়াও পালালো আবার। ডাক্তারের সঙ্গে। এবার রুস্তমচাচা খুঁজলেন না। কিছুই করলেন না। যেন জমাট পাথর হয়ে গেছেন তিনি।

তারপর? চুপচাপ সময় কাটতে লাগল। রুস্তমচাচা কম কথা বলেন, হাসেন না, কাঁদেন না, যেন যন্ত্র বিশেষ। কাজের সময় নিঃশব্দে কাজ করেন, বাকী সময় চুপ কবে থাকেন বোবার মতো।

দীর্ঘ দু'বছর এমনি কেটে গেল। তারপর একদিন কাঠের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে চাচা মাণ্ডেলেতে এলেন? সঙ্গে রহমান মালী যথারীতি রয়েছে। আর মাণ্ডেলেতে তখন একটা কার্নিভাল চলছিল। চাচার বন্ধু জোর করে একদিন কার্নিভালে নিয়ে এলো চাচাকে। আর কার্নিভালের দরজায় দেখা গেল ইয়ান মিয়াওকে।

ছোট্ট একটা মেয়ে পাশে নিয়ে ভিক্ষা করছে। বছর তিন বয়েস মেয়েটির। ছেঁড়া কাপড়, বিশ্রী স্বাস্থ্য, জটবাঁধা চুল।

বিদ্যুৎশ্রী ইয়ান মিয়াও নয়, যেন তার কঙ্কাল।

চাচা ফের ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওর ওপর। জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন হাউহাউ করে। বললেন,—তাকে ফিরে যেতেই হবে। কার্নিভালের সামনে সে এক দৃশ্য বটে। ইয়ান মিয়াও কিছুতেই যাবে না। ওর ভয় চাচা ওকে আর তার বাচ্চাকে মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু চাচা ওর পা জড়িয়ে ধরল।

শেষ পর্যন্ত ফিরে এলো ইয়ান মিয়াও। মেয়ে সঙ্গে। কার মেয়ে? ইয়ান মিয়াও লুকোল না। জানাল, এ মেয়ে সেই ডাক্তারের। রুস্তমচাচা আর শুনতে চান নি কিছু। বলেছিলেন শুধু—হোক্, তবু এ তাঁরও মেয়ে। মেয়েকে রুস্তমচাচা ভালোবাসতে শুরু করলেন। কিন্তু ইয়ান মিয়াওর ভয় কিছুতেই কাটে না। ওর বিশ্বাস মেয়েকে কোন এক সময় মেরে ফেলবে চাচা। সে ভুল ভাঙানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন চাচা, পারেন নি।

অ্যাকসিডেণ্ট ঘটল এক বছর বাদে। মেয়েকে নিয়ে ইরাবতীতে নৌকোয় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন চাচা। প্রচণ্ড ঝড় উঠল সেদিন। ঝড়ের অনেক পরে চোরের মতো ফিরে এলেন চাচা। একা।

নৌকাডুবি হয়েছিল। নিজে বেঁচেছেন কিন্তু মেয়েকে খুঁজে পান নি। মেয়েটি মারা গেল সেই ঝড়ে। তোলপাড় করে খুঁজেছিলেন। পান নি।

সে রাতের কথা বলতে গিয়ে কেমন শিউরে শিউরে উঠছিল রহমান।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইয়ান মিয়াও। বলল,—সব মিথ্যে, আসলে চাচা তাঁকে খুন করে এসেছে। কি?—হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন চাচা। ইয়ান মিয়াওর ওপর এই তার প্রথম ক্রোধ। এই তার শেষও।

—যা বললাম তাই। তুমি খুন করেছো।

হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন চাচা। দুই হাতে নিষ্ঠুরভাবে গলা ধরলেন ইয়ান মিয়াওর, বললেন, আর বলবি?

ইয়ান মিয়াও-ও বর্মার মেয়ে। তাঁরও জেদ কম নয়। সে অবস্থাতেই চেঁচিয়ে সে বলে চলল,—বলব, বলবই। খুনী, তুমি খুনী—খুনী। ব্যস, আর বলতে পারে নি। দুটি লৌহকঠিন নিষ্ঠুর হাতের পেষণে সে গলা চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। এই সমস্ত ঘটনাটা রহমান নিঃশব্দে দেখল। বাধা দিল না। ইচ্ছা করেই।

ইয়ান মিয়াওকে গলা টিপে মারলেন চাচা। শেষ করে দিলেন তাঁর ব্যর্থ জীবনের জন্য দায়ী সর্বনাশীকে। রাতারাতি মৃতদেহ কবর দেওয়া হল জঙ্গলের গভীরে। চাচা আর রহমান দু'জনে। সেদিন সতেরোই এপ্রিল।

তারপর দিন কাটতে লাগল। সব ঠিক হয়ে গেল ক্রমশ। শুধু মাঝে মাঝে সিন্দুক খুলে মেয়ের জামা কাপড়, খেলনা বুকে চেপে ধরে কাঁদেন চাচা। মেয়েকে বড় ভালোবাসতেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যুতে সত্যিকারের কষ্ট পেয়েছেন। মেয়ের কথা মনে পড়লে সামলাতে পারতেন না নিজেকে। আর সতেরোই এপ্রিলের বিভীষিকা। এ তারিখে রাত্তিরে চেঁচিয়ে ওঠেন চাচা ভয়ে। স্বপ্নে নাকি দেখেন মেয়ে ইরাবতী থেকে উঠে এসেছে মা'র সঙ্গে দেখা করতে, আর যে ঘরের ভেতর ইয়ান মিয়াওকে খুন করেছিলেন সে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর ডাকছে মা মা বলে।

ভেতর থেকে নাকি ইয়ান মিয়াও-ও 'আসছি মা' বলে দরজা খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, পারছে না।

এ স্বপ্ন দেখেই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন চাচা, তারপর জেগে উঠেই টর্চ নিয়ে ছোটেন ওপরের ঘরে, দেখতে। কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। দরজার বাইরে কেউ নেই, মরচে-ধরা তালা তেমনি ঝুলছে, ঘরের ভেতরেও কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু রাত্রির বাতাস

বয়ে যাচ্ছে শিরশির করে গাছের পাতা কাঁপিয়ে। দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু সতেরোই এপ্রিলের জন্য এই দুঃস্বপ্ন তাঁর বাঁধা। অন্য সময় বেশ ভালো মানুষ। কে বলবে রুস্তমচাচার জীবনে এত সব ইতিহাস রয়েছে, এত বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবন তাঁর।

মৃত্যুটা মর্মান্তিক। সতেরোই এপ্রিল অনেক কেটেছে।

কিন্তু সেদিন ছিল ঠিক প্রথম দুর্ঘটনার দিনের মতো ঝড়ো সতেরোই এপ্রিল। প্রচণ্ড ঝড়ে তোলপাড় করছিল সব। গাছপালাগুলো যেন আছড়াচ্ছিল মাটিতে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল নীল তীব্র দ্যুতিতে, অঝোর বৃষ্টি, বজ্রের হুঙ্কার; প্রকৃতি যেন তাণ্ডবে মেতেছিল সেদিন।

সেই ঝড়ের মধ্যে নিয়মিত হাতছানিতেই বুঝি রুস্তমচাচা বেরিয়ে পড়েছিলেন।' কেউ জানতে পারে নি, রহমান মালীও নয়।

হয়তো মেয়েকে খুঁজতেই গিয়েছিলেন ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ ইরাবতীতে। আর ফেরেন নি। মৃতদেহ জলে ভাসিতে দেখা গিয়েছিল তিনদিন বাদে।

রহমান মালীর কাছে এ গল্প শোনার পর সমস্ত রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে পারলাম। বুঝলাম সতেরোই এপ্রিলের গুপ্তকথা। কেন সেদিন ও সিন্দুক খুলে জামাকাপড় পরাতে ছোড়দির ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন চাচা, কেন আমাকে মেরেছিলেন বন্ধ দোতলার ঘরটায় ঢোকাতে, সবই পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু একটা জিনিস আজও আমি বুঝতে পারি নি—সত্যি সত্যি কি ইয়ান মিয়াওকেই ভালোবাসতেন রুস্তমচাচা? নাকি নিজের ভালোবাসার অহমিকাকে?···ইয়ান মিয়াওর কাছেই হেরে গিয়েছিলেন রুস্তমচাচা, না নিজের কাছে?···এ রহস্যের কিনারা আমি আজো করতে পারি নি।

কৌতুকী

লেখকের নিবেদন

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে আমি প্রচুর কৌতুকী শুনিয়েছি। সেই সব ভাণ্ডার থেকে কিছু কৌতুকী নির্বাচিত করে এখানে মুদ্রিত করা হল। সংখ্যাগুরু পাঠকবৃন্দ এইসব চুটকী পড়ে আনন্দ পেয়েছেন। স্বল্প সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা 'শচীন ভৌমিকটা কি যাচ্ছে তাই লেখে' বলে রেগে-মেগে (হয়তো জোকগুলো একবারের জায়গায় দু'তিনবার পড়ে নিয়ে !) নির্মম ভাষায় পত্রাঘাত করেছেন আমাকে। সম্মান ও পত্রার্জনী লেখক হিসেবে আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এবারও এই দ্বিবিধ প্রাপ্যের জন্য প্রস্তুত রইলাম। কৌতুকী মানে হাস্য রসের সমুদ্র। যাঁরা উৎসুক, যাঁরা এই হিসির সমুদ্রে অবগাহন করতে চান, মাপ করবেন,'হিসি'র নয়, হাসির সমুদ্রে অবগাহন করতে চান, তাঁরা চটপট সব বসন খুলে, না না, আমি বলতে চাই, সব শাসন ভুলে, ঝাঁপিয়ে পড়ুন এই প্রমোদ সাগরে। ভয় নেই, কেউই ডুববেন না। কেননা ইংরেজীতে রয়েছে He who laughs—lasts. (losts নয় !) অতএব মাভৈঃ।

—শ. ভৌ.

এক

ডাক্তারের চেম্বার।

তরুণী মেয়েটি রুগ্ন শিশু কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

মেয়েটি বললেন,—দেখুন ডাক্তারবাবু, খোকা একেবারে খেতে চায় না। দিন দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে।

হুঁ,—বললেন ডাক্তারবাবু,—দাঁড়ান দেখছি।

বলেই ডাক্তার মেয়েটির জামাটামা খুলে ভালো করে বুকটা পরীক্ষা করলেন। তারপর হতাশকণ্ঠে বললেন,—বাচ্চার স্বাস্থ্য কি করে ভালো হবে বলুন, আপনার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই। মেয়েটি বললেন,—আমি ওর মা নই ডাক্তারবাবু, আমি ওর মাসী।

দুই

একটি মহিলা ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছেন।

ডাক্তার : বলুন আপনার সিমটমস্ কি কি ?

মহিলা : আমার মাথার বাঁদিকটা ব্যথা হয়, তলপেট কেমন গরম ভাপ বেরুচ্ছে মনে হয়, বাঁ-কানটা কটকট করে আর পায়ের বুড়ো আঙুল ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, জল খেলে খালি হেঁচকি ওঠে, ঘুম হচ্ছে না একদম আর চুল পড়ে যাচ্ছে খুব।

হুঁ,—বললেন ডাক্তার,—এক কাজ করুন। ঠাণ্ডা বরফ-গোলা জলে বেশ ঘণ্টাখানেক ভালো করে স্নান করুন। তারপর পাখা খুলে তার নিচে ন্যাংটো হয়ে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকুন।

ভদ্রমহিলা অবাক। বললেন,—এতে আমার রোগ সেরে যাবে ?

না,—বললেন ডাক্তার,—এতে আপনার নিমুনিয়া হবে। আর নিমুনিয়া কি করে সারাতে হয় আমি জানি।

তিন

একটি বাচ্চা মেয়ের স্বভাব ছিল কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে জবাব দিত "আমি শিশির সেনের মেয়ে জয়শ্রী"। একদিন মা মেয়েকে ধমক লাগিয়ে বললেন,—শোন, কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে "আমি শিশির সেনের মেয়ে" বলবি না। বাবার নাম বলার দরকার নেই। বুঝেছো? মেয়ে ঘাড় কাৎ করল।

পরদিন এক ভদ্রলোক মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন,—আরে তুমি শিশির সেনের মেয়ে জয়শ্রী না?

: কাল পর্যন্ত তো তাই জানতাম। কিন্তু মা বলেছেন—না, —জবাব দিল ছোট্ট মেয়েটি।

চার

জজসাহেব বললেন,—একই শাড়ির দোকানে এক রাত্রিতে তুমি তিন তিনবার চুরি করতে ঢুকেছিলে কেন?

চোর: ধর্মাবতার, চুরি একবারই করতে গিয়েছিলাম। বৌর জন্য শাড়ি চুরি করেছিলাম। বাকি দু'বার শাড়ি বদলাতে গিয়েছিলাম হুজুর।

পাঁচ

শিক্ষয়িত্রী: আচ্ছা বলতো অজয় "আমি একটি সুন্দরী মেয়ে" কোন টেন্স্?

অজয় মাস্টারনীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিল, তারপর জবাব দিল,—পাস্ট্ টেন্স্।

ছয়

নববিবাহিত দম্পতি হনিমুন করতে দিল্লী এসেছিল। একদিন দিল্লী থেকে বেশ দূরে এক নির্জন জায়গায় ওরা পিকনিক করতে

গিয়েছিল। হঠাৎ চারটে পাঞ্জাবী গুণ্ডা এসে মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে সবাই মিলে বলাৎকার করে চলে গেল। স্বামী চুপচাপ সব দেখল, টুঁ শব্দটি করল না। গুণ্ডরা চলে যাবার পর স্ত্রী বেচারী শাড়ি কাপড় গুছিয়ে ক্লান্ত শরীরকে কোনরকম টেনে তুলে ঘৃণ্য চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল,—তুমি মানুষ না ইঁদুরেরও অধম। ওরা এভাবে আমার ওপর অত্যাচার করল তুমি একটা কথাও বললে না?

বোকার মতো কথা বলো না,—বলল স্বামী ভদ্রলোক,—কথা বলব কি করে? আমি কি পাঞ্জাবী ভাষা জানি যে কথা বলব।

সাত

বলুন তো ওটা কি কাজ যেটা পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে, কুকুর তিন পায়ে আর মেয়েরা বসে করে থাকে, কেননা সেটাই রীতিসম্মত। বলুন কি কাজ সেটা?

না, যা ভাবছেন তা নয়। এর জবাব হল,—হ্যাণ্ডসেক্।

আট

রায়, রায়, রায় ও রায়, কোম্পানীতে ফোন এল।

: হ্যাল্লো, আমি কি মিস্টার রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

জবাব: মিস্টার রায় এখন আউট অফ স্টেশন, একটা কাজে দিল্লী গেছেন।

: আচ্ছা, তাহলে আমি কি মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

জবাব: মিস্টার রায় এখন একটা কনফারেন্স এটেণ্ড করছেন। ব্যস্ত রয়েছেন।

: আচ্ছা, তাহলে আমি কি মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

জবাব: মিস্টার রায়ের ফ্লু হয়েছে। উনি আজ অফিসে আসেন নি।

: আচ্ছা, তাহলে আমি কি মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

জবাব: কথা বলছি।

নয়

স্বামী স্ত্রী জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন গাড়ি করে। পথে ডাকাতের আক্রমণ হল। ডাকাতের সর্দার স্বামী পুঙ্গবের চারদিকে একটা গোল চক্র বানালো কাঠি দিয়ে মাটির উপর দাগ কেটে। তারপর কম্পমান স্বামীটিকে বলল,—এই চক্রের বাইরে যাবে না। চক্রের বাইরে পা বার করেছো কি জানে মেরে দেবো। বুঝলে।

তারপর বৌকে মাটিতে ফেলে সে ধর্ষণ করে চলে গেল। ধর্ষিতা স্ত্রী উঠে স্বামীকে বলল,—ছিঃ ছিঃ। তুমি এরকম কাপুরুষ। এত ভীতু।

কাপুরুষ আমি? আমি ভীতু?—স্বামী রীতিমতো রেগে উঠলেন—তুমি তাহলে আমাকে চিনতেই পারো নি। বেটা যখন এদিকে তাকাচ্ছিল না তখন একবার নয়, দু' দুবার আমি এই চক্রের বাইরে পা বার করেছিলাম তা জানো? আমাকে বলছো কিনা কাপুরুষ!

দশ

মিস্টার মেহরা নতুন বাড়ি কিনে পার্টি দিয়েছেন।

সব কিছু নতুন চকচকে ঝকঝকে। পার্টি বেশ জমে উঠেছে। এক সময় পার্টির বিশেষ অতিথি মিসেস দময়ন্তী সাহানীর বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হল। কমোড সিট ছেড়ে উঠতে গিয়ে এক বিপত্তি হল। কমোড সিটে নতুন বার্নিশ লাগানো হয়েছিল সেটা দময়ন্তী দেবীর নিতম্বে আটকে গেল আঠার মতো। কিছুতেই ছেড়ে ওঠা যাচ্ছে না। একেবারে চিপ্‌কে গেছে। বিশ্রী কাণ্ড। হোস্টেস মিসেস মেহরাকে কোনরকমে ডাকলেন উনি। শত চেষ্টাতেও সিট খুলতে পারলেন না মিসেস মেহরা। শেষ পর্যন্ত স্ক্রু খুলে সিটটাই কমোড থেকে উনি খুলে দিলেন। সিটটা দময়ন্তী দেবীর পেছনে একটা বৃত্তের মতো আটকে রইল। তারপর তাকে বেডরুমে রেখে তাড়াতাড়ি

ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। দময়ন্তীর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। যাই হোক, ডাক্তার এলেন।

ডাক্তারকে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন মিসেস মেহরা, ডাক্তারবাবু, এরকম কোনদিন আপনি আগে দেখেছেন ?

ডাক্তার বললেন,—দেখেছি বহুবার। তবে অস্বীকার করব না, বাঁধানো অবস্থায় এই প্রথমবার দেখ্‌ছি।

এগারো

নতুন জুতোর দোকান খুলেছেন জনার্দন বসাক।

বন্ধু সন্তোষ এসে প্রশ্ন করলেন জনার্দনকে,—কি রে, ব্যবসা কেমন চলছে তোর ?

জনার্দন বললেন,—গতকাল এক জোড়া জুতো বিক্রি করে-ছিলাম। আজ তার চেয়েও খারাপ অবস্থা।

সন্তোষ বললেন,—কালকের চেয়েও খারাপ অবস্থা কি করে হতে পারে ?

জনার্দন বললেন,—কালকের খদ্দের আজ সেই জুতোজোড়া ফেরত দিয়ে গেছে।

বারো

সেলুন। এক ভদ্রলোক দাড়ি কামাচ্ছিলেন নাপিতের কাছে। নাপিত : স্যার, আপনি যখন সেলুনে ঢুকেছিলেন তখন কি গলায় লাল রুমাল জড়িয়ে এসেছিলেন ?

ভদ্রলোক : না। আমি সাদা রুমাল জড়িয়ে এসেছিলাম।

নাপিত : তাহলে মনে হচ্ছে আমি আপনার গলাটা কেটে ফেলেছি।

তেরো

একজন অশিক্ষিত ধনকুবের একটি কলেজে টাকা দান করতে রাজী হয়েছেন। বিপক্ষদলের এক ভদ্রলোক তাই শুনে একদিন দেখা করতে এলেন সেই ধনী ব্যক্তির সঙ্গে।

ভদ্রলোক : আপনি যে কলেজে টাকা ঢালতে চলেছেন সে কলেজে একসঙ্গে ছেলেমেয়েরা গ্র্যাজুয়েট করে থাকে সে খবর রাখেন ?

ধনী : ছিঃ ছিঃ, কি বলছেন আপনি ?

ভদ্রলোক : এ তো কিছুই নয়। আপনি কি জানেন সে কলেজে ছেলেমেয়েদের একই ক্যারিকুলাম্ ব্যবহার করতে হয় ?

ধনী : কি ঘেন্নার কথা। এত জঘন্য কাণ্ড হয় সেখানে ?

ভদ্রলোক : আর জানেন কি, পুরুষ প্রফেসাররা যখন-ই চাইবেন মেয়েদের থিসিস্ দেখতে, মেয়েরা তাদের থিসিস্ দেখাতে বাধ্য হয় ?

ধনী : এ যে নরক মশাই। না না, আমি ঐ অসভ্য নোংরা কলেজে এক পয়সাও দান করব না, এক আধলাও না।

চোদ্দ

ছেলেদের বাথরুম ও মেয়েদের বাথরুম দু'জায়গায়-ই অশ্লীল ছবি ও লেখা দেখা যায়। ইংরেজীতে বলে গ্রাফিটি। একজন যুক্তিবিজ্ঞানের প্রফেসরের মতে ছেলেদের বাথরুমের চেয়ে মেয়েদের বাথরুমে অশ্লীল লেখা ডবল থাকা উচিত। কেননা ছেলেরা এক হাতে লিখে থাকে, কিন্তু মেয়েদের দু'টো হাতই ফ্রি থাকে সুতরাং ওরা দু'হাতেই লিখতে পারে। ডবল সুযোগ। অকাট্য যুক্তি। কি বলেন ?

পনেরো

কলেজের ক্লাসরুম।

একটি ছেলে প্রফেসরের অনুপস্থিতিতে ব্ল্যাকবোর্ডে এসে লিখল The Professor will not take his classes today.

একটি মস্তান ছেলে এসে Classes-এর "C"টা কেটে দিল। হয়ে গেল—The Professor will not take his lasses today.

একটি তুখোড় ছাত্রী লেখা দেখে স্বভাবতঃই রেগে গেল। সে lasses-এর থেকে "L"টা কেটে দিল। মস্তান আচ্ছা টিট। কেননা এখন লেখাটা দাঁড়ালো The Professor will not take his asses today. কে বলে মেয়েদের বুদ্ধি নেই?

ষোল

Sunil, don't park the car here
Sunil, don't park the car
Sunil, don't park
Sunil, don't
মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সতেরো

কলেজের ছেলেদের য়ুরিনাল্স্-এর দেওয়ালে একটি লেখা ছিল—I LIKE PUNJAB GRILLS

নিচে আরেকজন লিখেছে—NOT GRILLS, YOU STUPID, GIRLS.

আঠারো

আমেরিকার হাইওয়েতে মোটরচালকদের উদ্দেশ্যে যে সব বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় সেগুলো তাদের রসিক মনের কৌতুকপ্রিয়তার উচ্চতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যায়। নমুনা শুনুন।

(ক) IT IS GOOD TO BE LATE, MR. MOTORIST
THAN TO BE THE LATE MR. MOTORIST

(খ) THE DRIVER IS SAFE IF THE ROAD IS DRY
THE ROAD IS SAFE IF THE DRIVER IS DRY

(গ) 'SLOW' HAS GOT FOUR WORDS
SO HAS — 'LIFE'
'SPEED' HAS GOT FIVE WORDS
SO HAS — 'DEATH'

(ঘ) IF YOU ARE KISSING A GIRL AND DRIVING
A CAR YOU ARE NOT GIVING PROPER
ATTENTION TO BOTH

(ঙ) DO NOT DRIVE AS IF YOU OWN THE ROAD
DRIVE AS IF YOU OWN THE CAR

(চ) IF YOU WANT TO SEE OUR CITY—DRIVE SLOW
IF YOU WANT TO SEE OUR JAIL—DRIVF FAST

উনিশ

পনেরো থেকে কুড়ি বছরের মেয়েরা হল ভারতবর্ষের মতো। মানে রহস্যময় আকর্ষণীয়।

কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মেয়েরা ইউরোপের মতো। উপোভাগ্য। আনন্দময়। চঞ্চল, উজ্জ্বল।

পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের মেয়েরা হল আমেরিকার মতো। অভিজ্ঞ। বস্তুতান্ত্রিক। ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন।

ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েরা হল বৃটেনের মতো। গম্ভীর। ঐতিহ্যবাহী। স্মৃতিভারাক্রান্ত।

পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মেয়েরা হল অস্ট্রেলিয়ার মতো। সবাই জানে অস্ট্রেলিয়া কোথায় কিন্তু কেউউ সেখানে যেতে বিন্দু-মাত্র উৎসাহী নয়?

কুড়ি

এক ভদ্রলোকের কথায় কথায় বাজি ধরার বিশ্রী অভ্যাস ছিল। তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোটর একসিডেণ্টে মরে গেল।

সবাই ভদ্রলোককে বলল,—দেখো বাপু, মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে খবর দিতে হবে কিন্তু দুঃসংবাদ চট করে দেবে না বুঝলে। আস্তে আস্তে ভাঙবে।

ভদ্রলোক : আপনারা ভাববেন না। আমি ধীরে ধীরে খবরটা দেবো।

ভদ্রলোক এসে সেই মৃতব্যক্তির বাড়ির দরজার বোতাম টিপলেন। বন্ধুস্ত্রী বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক : আপনিই তো আমার বন্ধু গণেশ বসাকের বিধবা ?

ভদ্রমহিলা : কি যা তা বলছেন, আমি তাঁর বিধবা কেন হতে যাবো ? আমি তাঁর স্ত্রী।

ভদ্রলোক : কত টাকা বাজি ধরতে চান বলুন।

একুশ

বলুন তো পুরুষ-মাছি আর মেয়ে-মাছি চেনার উপায় কি ? উপায় হল—যে মাছিগুলো দেখবেন মদের গেলাসে এসে বসছে সেগুলো হল পুরুষ-মাছি আর যে মাছগুলো আয়নার উপর বসছে সেগুলো হল মেয়ে-মাছি।

বাইশ

শিশুসদন।

নার্স বাচ্চা কোলে নিয়ে ডেলিভারী রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বাচ্চার ছোট মাসী দৌড়ে গিয়ে বাচ্চা দেখতে লাগল। হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলল,—কি সুন্দর ছেলে হয়েছে দিদির। জামাইবাবুর মতো নাক চোখ হয়েছে। থুতনি হয়েছে

দিদির মতো। এ্যাই, মাসীকে একটা স্মাইল দাও না বাবা। আমি জানতাম দিদির ঠিক ছেলে হবে। যা ভেবেছি তাই, সোনার টুকরো ছেলে হয়েছে দিদির।

নার্স : দেখুন, আপনার দিদির ছেলে নয়, মেয়ে হয়েছে। এবার আমার আঙুলটা ছেড়ে দিন প্লিজ।

তেইশ

একটা কারখানার বিজ্ঞপ্তি।

"মহিলা কর্মচারীদের জন্য : আপনারা যদি ঢিলে শাড়ি পরেন তবে মেশিন থেকে সাবধান থাকবেন।

আর আপনারা যদি আঁটো শাড়ি পরেন তবে মেকানিকদের থেকে সাবধান থাকবেন।"

চব্বিশ

ডাক্তারের কাছে বেশ ভিড়।

নার্স বলল : নেক্স্ট্।

ভদ্রলোক এসে বললেন,—দেখুন, আমি এসেছিলাম—

নার্স : কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। কাপড়-চোপড় খুলে এখানে শুয়ে পড়ুন।

ভদ্রলোক : কিন্তু আমি এসেছিলাম—

নার্স : বললাম কাপড় খুলুন। ভিড় দেখছেন না? চটপট খুলে ফেলুন।

নার্স আর কথা না বলতে দিয়ে ভদ্রলোককে নগ্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর ডাক্তারবাবু এলেন।

ডাক্তার : বলুন কি কমপ্লেন?

ভদ্রলোক : স্যার, আমি আপনার টেলিফোন ঠিক করতে এসেছিলাম।

পঁচিশ

নার্স: ডাক্তারবাবু, আমি যতবার নীচু হয়ে রোগীর পাল্‌স্ দেখতে যাচ্ছি রোগীর পাল্‌স্ বেড়ে যাচ্ছে। কি করি বলুন তো?

ডাক্তার: ব্লাউজের বোতাম দু'টো বন্ধ করে নিন।

ছাব্বিশ

একটি লোকের অভ্যাস ছিল কথায় কথায় বলার "এ তো কিছু না, এর চেয়েও সাংঘাতিক হতে পারতো"। লোকে তার বাচালতায় ও চালিয়াতীতে রীতিমত বিব্রত। একদিন অপর এক ভদ্রলোক বললেন,—ঘটনাটা শুনেছেন? সুকুমার ঘোষাল গত সোমবার দিন বাইরে থেকে ফিরে এসে বাড়িতে দেখলেন তার আদরের স্ত্রী পাড়ার এক মাস্তান ছেলে লোকেনের সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে চুটিয়ে প্রেম করছেন। সুকুমার রিভালবার বার করে বৌ আর লোকেন দু'জনকে গুলী করে মেরেছে তারপর নিজে গুলী খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কি ট্র্যাজেডী।

চালিয়াৎ মশাই: এ তো কিছু নয়, এর চেয়েও সাংঘাতিক হতে পারতো।

ভদ্রলোক: দেখুন গুলবচন্দ্র, বাজে বকবেন না। এরকম ট্রিপল ট্র্যাজেডীর চেয়ে সাংঘাতিক কি হতে পারতো বলতে পারেন আপনি?

চালিয়াৎ মশাই: নিশ্চয়ই পারি। সোমবার না হয়ে যদি ঘটনাটা রোববার ঘটত তবে লোকেনের জায়গায় আমি গুলী খেয়ে মরতাম।

সাতাশ

হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় অবিনাশবাবু অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী তাঁরই এক

পরম বন্ধুর সঙ্গে যৌনযুদ্ধে লিপ্ত। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠলেন অবিনাশবাবু—এখন আমি সব জানি।

সব জানো?—স্ত্রী বলে উঠলেন বিছানা থেকে,—তাহলে বলো তো দেখি নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি? পলাশীর যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?

আটাশ

ঘোষক: আসুন আসুন, বুদ্ধির পরীক্ষার খেলা। আমি মাত্র দু'টো প্রশ্ন করব। প্রথম প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলে এক হাজার টাকা পুরস্কার, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে পাঁচ হাজার। প্রথম প্রশ্ন—পৃথিবীর সর্বপ্রথম পুরুষ ও নারী কে ও তাঁদের নাম কি?

একটি সুশ্রী মেয়ে: প্রথম পুরুষের নাম এডাম্ ও প্রথম নারীর নাম ইভ্।

ঘোষক: গুড্। সঠিক জবাব দিয়েছেন। এই নিন হাজার টাকা। এইবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—এডাম ও ইভের যখন প্রথম দেখা হয় তখন ইভ এডামকে দেখে প্রথম কি কথা বলেছিলেন? মেয়েটি বড্ড চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল। ঘোষক বললেন—কাম্ অন্, বলুন। আধ মিনিটের মধ্যে বলতে হবে। সময় চলে যাচ্ছে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মেয়েটি বিড়বিড় করে বলল: এটা বেশ শক্ত।

ঘোষক: গুড্। সঠিক জবাব দিয়েছেন। এই নিন পাঁচ হাজার টাকা।

ঊনত্রিশ

একজন প্রৌঢ়া আইবুড়ো মহিলার ইচ্ছে হল যুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্য কিছু দান করেন। মহিলা খুবই ধনী। উনি গরম উলের

আণ্ডারওয়ার নিজের হাতে সেলাই করতে বসলেন। তারপর তিন শ' আণ্ডারওয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকদিন পর সেনাদপ্তর থেকে চিঠি এল, "প্রিয় মহাশয়া, আপনার সহৃদয় দানের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি একটা ভুল করে ফেলেছেন। আণ্ডারওয়ারের সামনের দিকে প্রয়োজনীয় 'ওপনিং' রাখতে ভুলে গেছেন।"

ভদ্রমহিলা দু'দিন পর সৈন্যদপ্তরে জবাব লিখে পাঠালেন। উনি লিখেছেন,—"ওগুলো অবিবাহিত সৈন্যদের ব্যবহার করতে দিলে হয় না?"

ত্রিশ

একজন বিখ্যাত চিত্রতারকা রাত্তিরে বাড়িতে এসে দেখলেন তাঁর ছ'জন প্রণয়ী ড্রইংরুমে বসে আছে।

উনি বললেন,—দেখো, আজ সকাল থেকে কটকটে রোদ্দুরে আমি স্যুটিং করেছি। বড্ড ক্লান্ত এখন। তোমাদের মধ্যে একজনকে আজ চলে যেতে হবে।

একত্রিশ

বৃদ্ধ মহেনবাবুর মাথায় মস্ত টাক। অফিসের সদ্যবিবাহিত যুবক গৌতম রসিকতা করে বলল,—মহেনদা, তোমার মাথার টাকটা মাইরী আমার বৌর পাছার মতো মসৃণ।

মহেনবাবু গম্ভীরভাবে নিজের টাকে দু'বার আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বলল,—ঠিক বলেছিস্ তো রে। হুবহু তোর বৌর পাছার মতো মসৃণ।

বত্রিশ

হাট থেকে ফিরছিল বটুকমাঝির মেয়ে বাতাসী। হঠাৎ দেখল

তাদের পাশের বাড়ির ছেলে নিমাইও হাট থেকে ফিরে যাচ্ছে। বাতাসী বলল,—নিমাইদা, তোমার সঙ্গে বাড়ি ফিরি। আপত্তি নেই তো?

নিমাই বলল,—আপত্তি কি, চল্।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা নির্জন জঙ্গলে এসে বাতাসী বলল,—এখানে তোমার কাছে আমার ভয় হচ্ছে। তুমি যদি আমাকে একা পেয়ে জোর করে কিছু করে বসো।

নিমাই বলল,—কি বোকার মতো কথা বলছিস্ তুই। দেখছিস না আমার ছু'হাতই বাঁধা। এক হাতে শাবল, মুরগী, বালতি, অন্য হাতে ছাগলটা নিয়ে যাচ্ছি। কি করে সম্ভব?

বা রে,—বলল বাতাসী,—আমি যেন ছেলেদের চিনি না। তুমি বুঝি ইচ্ছে করলে শাবলটা মাটিতে গেঁথে ছাগলটা তার সঙ্গে বাঁধতে পারো না, আর বালতিটা উল্টো করে তার নিচে মুরগীটাকে রাখতে পারো না? তোমাদের চালাকি আমি জানি না ভাবছো?

তেত্রিশ

একটা স্টেশনারী দোকানে একটি স্মার্ট ছেলে কাজ চাইতে এসেছে। ছেলেটি বলল,—প্লিজ আমাকে সেলসম্যানের একটা চাকরি দিন। আমি খদ্দেরের চেহারা দেখে বলে দিতে পারি যে সে কি কিনতে এসেছে।

দোকানের মালিক : তাই নাকি? ঠিক আছে, দেখা যাক পরীক্ষা করে তুমি কতটা ঠিক অনুমান করতে পারো। ঐ যে ভদ্রলোক ঢুকছেন, উনি কি কিনবেন বলতে পারো? ছেলেটি আগন্তুককে দেখেই বলল,—উনি ব্লেড কিনতে এসেছেন।

দেখা গেল ভদ্রলোক ব্লেড কিনে চলে গেলেন।

দোকানের মালিক : ঐ যে মহিলা আসছেন?

ছেলেটি : উনি বোনবার জন্য উল কিনবেন। সম্ভবত সাদা রঙের।

সত্যি সত্যিই মহিলা সাদা উল কিনে চলে গেলেন।

দোকান মালিক : ঐ বাচ্চা ছেলেটা ?

ছেলেটি : ও পেনসিল আর ড্রইংবুক কিনবে। বাচ্চাছেলেটা সত্যি এ-দুটো জিনিস কিনে চলে গেল।

দোকানের মালিক : ঐ যে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়েটা আসছে ?

ছেলেটি : ইনি স্যানিটারী ন্যাপকিন কিনবেন। কিন্তু মহিলা এক বাক্স টয়লেট্ পেপার কিনে চলে গেলেন।

দোকানের মালিক : এটা কিন্তু তুমি মিস্ করেছো।

ছেলেটি বলল,—তা ঠিক। কিন্তু মাত্র ইঞ্চিখানেকের জন্য।

ছেলেটির চাকরি হয়েছিল।

চৌত্রিশ

একটি উন্মাদ আশ্রমে একজন গণমান্য সরকারী কর্মসচিব পরিদর্শন করতে এসেছেন। একটি ঘরে একজন পাগলের সঙ্গে কথা বলে উনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পাগলটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হল।

সে বলল : স্যার, আমি সত্যি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছি। তা সত্ত্বেও এরা আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছে।

কর্মসচিব বললেন,—আমি নিঃসন্দেহ আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন। আমি এই পাগলখানার কর্মকর্তাদের বলব যাতে আপনাকে অবিলম্বে ছেড়ে দেয়।

সে বলল,—অজস্র ধন্যবাদ।

সরকারী অফিসার এইবার সে ঘর ছেড়ে করিডর ধরে অন্যান্য রোগীদের দেখবার জন্য এগিয়ে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা আস্ত ইট এসে দুম্ করে মাথায় পড়ল কর্মসচিবের। মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলেন সেই সুস্থ পাগলটি ইট মেরে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটা বলল,—মনে করে বলবেন কিন্তু স্যার, ভুলে যাবেন না যেন।

পাঁয়ত্রিশ

দু'টি নববিবাহিত দম্পতি হনিমুন করতে কাশ্মীর এসেছে। হোটেলে উঠেছে। সতীশ আর তার স্ত্রী বাসন্তী। অরুণ আর তার স্ত্রী অঞ্জলি।

খাবার টেবিলে দু'পরিবারের আলাপ হল। খানিকবাদে স্ত্রী দু'জন নিজ নিজ রুমে চলে গেল। স্বামী দু'জন খানিকক্ষণ কথা বলল, সিগারেট খেল তারপর শোবার জন্য নিজ নিজ রুমে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময় হঠাৎ হোটেলের ইলেকট্রিক লাইট অফ্ হয়ে গেল।

কোনরকমে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওরা রুমে পৌছে গেল। অরুণ ঘরে ঢুকে শুতে যাবার আগে প্রার্থনা করতে বসল। এটা তার চিরকালের অভ্যাস। মিনিট দশেক প্রার্থনা করার পর বিছানায় এসে বৌকে জড়িয়ে ধরল অরুণ। সঙ্গে সঙ্গে লাইট ফিরে এল হোটেলে। আতঙ্কিত অরুণ তাকিয়ে দেখল সে ভুল ঘরে ঢুকেছে। বিছানায় সতীশের স্ত্রী বাসন্তী। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে নিজের ঘরে যাবার জন্য দৌড় লাগাতে গেল অরুণ। কিন্তু চট করে হাতটা ধরে ফেলল, বাসন্তী। বলল,—এখন গিয়ে কোন লাভ নেই, দেরি হয়ে গেছে। আমার স্বামীর শোবার আগে প্রার্থনা করার অভ্যেস নেই।

ছত্রিশ

একজন বিখ্যাত চোখের ডাক্তারের সত্তর বছর বয়েসের জন্মদিন ছিল। তাঁর কর্মযোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর আরোগ্যপ্রাপ্ত পেশেন্টরা একটা বিরাট পেইন্টিং প্রেজেন্ট করলেন ডাক্তারকে। পেইন্টিংটা হল একটা মানুষের "চোখ।" বিরাট সেই চোখের ছবির সামনে বসিয়ে রিপোর্টাররা ডাক্তারের অনেকগুলো ছবি তুললেন। তারপর একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে,—আচ্ছা ডাক্তারবাবু,

ছবিটা প্রেজেন্ট পাবার পর আপনার প্রথম কি রিঅ্যাকসন্ হয়েছিল ?

ডাক্তার বললেন,—আমার মনে হয়েছিল ভাগ্যিস আমি আই-স্পেশালিস্ট্ গাইনোকলোজিস্ট্ নই।

সাঁইত্রিশ

এক বক্তৃতা সভায় একজন বক্তা দীর্ঘ ভাষণ শেষই করছিলেন না। সবাই রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠল।

এক ভদ্রলোক বললেন,—আমি বক্তাকে অবিলম্বে বসিয়ে দিতে পারি।

পাশের ভদ্রমহিলা,—বসিয়ে দিন না। বড় উপকৃত হবো। প্রচণ্ড বোর্ হচ্ছি।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট কাগজে স্লিপ লিখে বক্তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বক্তা সে স্লিপের ওপর চোখ বুলিয়ে তাড়াতাড়ি আমতা-আমতা করে তাঁর ভাষণ শেষ করে বসে পড়লেন। ভদ্রমহিলা অবাক কণ্ঠে পাশের ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন,—আশ্চর্য কাণ্ড, আপনি স্লিপে এমন কি লিখেছিলেন যে বক্তা চট্ করে বসে পড়লেন ?

ভদ্রলোক,—বেশী কিছু না। শুধু চারটে কথা লিখেছি। আমি লিখেছিলাম—"আপনার প্যান্টের বোতাম খোলা"।

আটত্রিশ

জনৈক মাতাল : কাল এত মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম যে বৌকে জড়িয়ে ধরে বৌর নাভিতে পাগলের মতো চুমু খেয়েছি। বিশ্রী কাণ্ড মাইরী। এরকম মাতাল তুই কোনদিন হয়েছিস ?

বন্ধু : আমি ? এরচেয়েও বেশী মাতাল হয়েছি।

উনচল্লিশ

ডাক্তার পেশেন্টকে দেখলেন ভালো করে। তারপর বললেন,—দেখুন, আমি ছবি এঁকে দেখাবো, আপনি ছবি দেখে কি মনে হয় জানাবেন আমাকে।

ডাক্তার একটা চক্র আঁকলেন। বললেন,—এটা কি ?

পেশেন্ট : ছিঃ ছিঃ। একটা ছেলে ও একটা মেয়ে যাতা করছে।

ডাক্তার বললেন,—হুঁ। এইবার উনি একটা চতুষ্কোণ আঁকলেন। বললেন,—এটা কি ?

পেশেন্ট : মেয়েটা ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে যা তা করছে। ডাক্তার এবার একটা স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকলেন। বললেন,—এটা কি ?

পেশেন্ট : এটা দু'টো ছেলে ও একটা মেয়ে যা তা করছে। ডাক্তার এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—না, আপনার উপযুক্ত চিকিৎসার দরকার। আপনার খুবই নোংরা মন।

পেশেন্ট : আমার মন নোংরা ? আপনি নিজে নোংরা-নোংরা অসভ্য ছবি আঁকছেন আর বলছেন কিনা আমার মন নোংরা ?

চল্লিশ

এক ভদ্রলোক মেয়ে মহলে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করল,—তুই কি করে মেয়েমহলে এত পপুলার হয়েছিস বল তো ?

ভদ্রলোক,—এতে কোন ট্রিক নেই। আমি মেয়েদের সঙ্গে ঘরোয়া প্রশ্ন করে থাকি যেমন 'আপনি বিবাহিতা কি না' যেমন 'আপনার ছেলেমেয়ে কটি', এই সব আর কি। তাতেই বেশ আলাপসালাপ জমে ওঠে। বুঝেছিস ?

বন্ধু বলল,—ঠিক আছে।

পরে একদিন সেই বন্ধু ভদ্রলোক এক পার্টিতে গেলেন। সেখানে প্রচুর নামজাদা মহিলারা ছিলেন। ডিনার টেবিলে ভদ্রলোকের দু'পাশে দু'জন রূপসী মহিলা বসেছেন আলাপ জমাবার জন্য ভদ্রলোক এক মহিলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, মাফ করবেন, আপনি কি বিবাহিতা ?

মহিলা বললেন,—না।

ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করলেন—আপনার ছেলেমেয়ে কটি ?

ভদ্রমহিলা বলা বাহুল্য রেগে টং।

ভদ্রলোক বুঝলেন কোথাও কোন ভুলচুক হয়েছে। উনি ভাবলেন অন্যভাবে ট্রাই করতে হবে। সুতরাং এবার অন্য পাশের মহিলার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,—মাফ করবেন, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ?

এই ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন,—দু'টি।

ভদ্রলোক : আপনি কি বিবাহিতা ?

মহিলা রেগে টেবিল ছেড়েই উঠে গেলেন।

একচল্লিশ

নতুন নায়ক স্বাক্ষর করেছেন প্রযোজক কমলাক্ষবাবু। নায়কের নাম উজ্জ্বলকুমার। ছবির সুটিং শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কমলাক্ষবাবু শুনলেন উজ্জ্বলকুমারের মেয়েছেলের রোগ আছে। প্রায়ই মেয়ে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ান। ক্ষেপে গেলেন উনি। বললেন একদিন নতুন নায়ককে,—শোন হে, শুনছি তুমি খুবই উড়তে শুরু করেছো। মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। আমার কোম্পানীতে কাজ করলে এসব চলবে না। চরিত্রহীনতা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। এসব শখ থাকলে তুমি এখনই বিদেয় হও। আমি অন্য হিরো সাইন করবো।

না না, প্লিজ,—উজ্জ্বলকুমার প্রায় কাঁদো কাঁদো হলেন,—আপনার

পায়ে পড়ছি, আমাকে তাড়াবেন না। আমি মা কালীর দিব্যি কেটে বলছি আর কোনদিন কোন মেয়ের দিকে আমি মুখ তুলে তাকাবো না। এবার ক্ষমা করে দিন।

কমলাক্ষবাবু বললেন,—ঠিক আছে। এখন ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে যদি একদিনও দেখি তুমি মেয়েছেলের চক্কর করছো তাহলে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেবো বলে রাখলাম।

ঠিক আছে,—বললেন উজ্জ্বলকুমার।

এর সাতদিন না যেতেই একদিন কমলাক্ষবাবু দেখলেন রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ের কোমরে হাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন উজ্জ্বলকুমার। উজ্জ্বলকুমারও দেখতে পেলেন কমলাক্ষবাবুর নির্মম দৃষ্টি। সর্বনাশ। দৌড়ে কমলাক্ষবাবুর কাছে এসে বললেন উজ্জ্বলকুমার,—আপনি প্লিজ যা তা ভেবে বসবেন না। আমি কোন আজেবাজে মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করছি না। ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী।

তোমার স্ত্রী ?—ফেটে পড়লেন কমলাক্ষবাবু,—লম্পট, রাসকেল্ এ হচ্ছে আমার স্ত্রী।

বিয়াল্লিশ

স্ত্রী : আমি যখন গান গাইতে শুরু করি তুমি বারান্দায় ছুটে যাও কেন ?

স্বামী : যাতে প্রতিবেশীরা ভুল করে না ভেবে বসে যে আমি তোমাকে পেঁদাচ্ছি আর তুমি চেঁচাছো, সেজন্যে।

তেতাল্লিশ

গোপালবাবুর বাড়ি পুলিশ সার্চ করতে এল। সার্চ করতে করতে পুলিশ জালনোট ছাপার যন্ত্রপাতি, ডাই, রং ও অনেক কিছু আরও পেল। যদিও পুলিশ কোন জাল নোট পেল না সেখানে। পুলিশ বলল,—জাল নোট ছাপার অপরাধে আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করছি।

গোপালবাবু: একটাও জাল নোট কি পেয়েছেন আপনারা?

পুলিশ: না। কিন্তু ছাপবার যন্ত্র পেয়েছি। ছাপবার যন্ত্র থাকলেই আইনত আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।

গোপালবাবু: তাহলে একটি মেয়েকে পাশবিক অত্যাচারের অপরাধেও আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

পুলিশ: আপনি কোন মেয়েকে রেপ্ করেছেন?

গোপালবাবু: না। কিন্তু রেপ করবার যন্ত্র তো আমার কাছে রয়েছে।

চুয়াল্লিশ

জজসাহেব: আপনি বলছেন অমরবাবু ভাঙা বোতল হাতে নিয়ে আপনাকে আক্রমণ করেছিল?

বিষ্টুবাবু: হ্যাঁ হুজুর।

জজসাহেব: অমরবাবুর হাতে ভাঙা বোতল ছিল, কিন্তু আপনার হাতে কি কিছুই ছিল না?

বিষ্টুবাবু: থাকবে না কেন হুজুর। ছিল। অমরের বৌটাই তো ছিল আমার হাতে। কিন্তু ধর্মাবতার, ভাঙা বোতলের সামনে মেয়েছেলে আর কি করতে পারে বলুন?

পঁয়তাল্লিশ

এক ভদ্রমহিলা একজন নামজাদা ডাক্তারকে ডিনার পার্টিতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। জবাবে ডাক্তার একটা ছোট নোট লিখে পাঠালেন। নোটে উনি নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছেন না গ্রহণ করেন নি কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। ডাক্তারের হস্তাক্ষর, তাই কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারছিল না।

একজন ভদ্রমহিলাকে পরামর্শ দিলেন,—এক কাজ করুন। কোন ওষুধের দোকানে গিয়ে পড়িয়ে নিন। ডাক্তারের হাতের লেখা ওরাই শুধু পড়তে পারে।

ভদ্রমহিলা ওষুধের দোকানে এসে সেই চিরকুটটা দেখালেন। দোকানদার নোটটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে এক শিশি ওষুধ এনে দিলেন ভদ্রমহিলাকে। বললেন—এই নিন ম্যাডাম। এর দাম হল আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ছেচল্লিশ

জেলার : তুমি আজ ছ'মাস ধরে এ জেলে রয়েছো কিন্তু তোমার কোন আত্মীয়স্বজনদের কোন চিঠি আসে না কেন?

কয়েদী : আমার সব আত্মীয়স্বজনরা জেলেই রয়েছে হুজুর, চিঠি কে লিখবে?

সাতচল্লিশ

পাণ্ডুরঙ নতুন বিয়ে করে বৌকে নিয়ে টাঙ্গায় করে দেশে ফিরে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা চলতে চলতে একবার হোঁচট খেল।

পাণ্ডুরঙ বলল,—একবার।

খানিকবাদে ঘোড়া আবার হোঁচট খেল।

পাণ্ডুরঙ বলল,—দু'বার।

রাস্তা খারাপ থাকায় ঘোড়াটা আবার হোঁচট খেল।

সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুরঙ বলে উঠল,—তিনবার। বলেই পকেট থেকে রিভলবার বার করে দুম্ করে গুলী করে ঘোড়াটাকে মেরে ফেলল। স্বামীর নৃশংসতা দেখে নতুন বৌ রেগে চেঁচিয়ে উঠল,—মেরে ফেললে ঘোড়াটাকে? তুমি এত নিষ্ঠুর, এত অমানুষ। জানোয়ারের অধম তুমি। তুমি একটা পিশাচ।

রোষকষায়িত নেত্রে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পাণ্ডুরঙ শুধু বলল,—একবার।

আটচল্লিশ

পরাশরবাবু হোটেল ছেড়ে দিয়ে এয়ারপোর্টে এসে মনে পড়ল তিনি হোটেল রুমে তাঁর ছাতাটা ভুলে এসেছেন। প্লেনের অনেক সময় ছিল তাই উনি ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরে এলেন। নিজের রুমের কাছে এসে উনি শুনতে পেলেন রুমটা ইতিমধ্যে কোন নতুন দম্পতি বুক করেছেন। ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে।

স্বামীর কণ্ঠ : এই রেশমের মতো চুলগুলো কার ?

স্ত্রীর গদ্‌গদ কণ্ঠ : তোমার।

তারপরই একটা চুম্বনের শব্দ।

স্বামীর কণ্ঠ : এই সুন্দর চোখ দুটো কার ?

স্ত্রীর কণ্ঠ : তোমার।

আবার চুমুর শব্দ।

স্বামীর কণ্ঠ : এই লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো কার ?

স্ত্রীর কণ্ঠ : তোমার।

আবার চুমুর শব্দ।

স্বামীর কণ্ঠ : এই মোমের মতো গলাটা কার ?

স্ত্রীর কণ্ঠ : তোমার।

আবার চুমু।

এবার আর থাকতে পারলেন না পরাশরবাবু। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বললেন,—আপনি যদি একটা ছাতা পান সেটা কিন্তু আমার।

উনপঞ্চাশ

একজন মহিলার আঠারো থেকে বিশ বছর লাগে একটি ছেলেকে মানুষ করে তুলতে।

আবার একটি মেয়ের মাত্র বিশ সেকেণ্ড লাগে সে ছেলেটাকেই গাধা বানিয়ে ফেলতে!

পঞ্চাশ

তাড়াতাড়ি বলতে পারেন এটা ?

She sells seashells on the sea shore.

এবার নিচেরটা বলুন দেখি ঠিক উচ্চারণ করে।

A tutor who tooted the flutc, tried to teach two young tooters to toot.

Said the two to the tutor, "Is it harder to foot or the tutor two tooters to toot ?

একান্ন

একটি বারে বসে এক ভদ্রলোক খুব বিষণ্ণ মনে মদ খাচ্ছিলেন।

একজন এসে বলল,—আপনার বুঝি খুব মন খারাপ ?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে আর স্ত্রী বলেছেন ত্রিশদিন আমার সঙ্গে কোন কথা বলবেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : সেটা তো ভালোই মশাই।

ভদ্রলোক : জানি। আজ সেই ত্রিশ দিন শেষ হয়ে যাবে।

বাহান্ন

ঘরে নতুন রঙ করা হচ্ছিল। রাত্তিরে স্বামী ভদ্রলোক অসাবধানে বেডরুমের দেয়ালে হাত লাগিয়ে ফেলেন, ফলে দেয়ালের কাঁচা রঙে দাগ লেগে গেল।

পরদিন সকালে স্বামী অফিসে চলে গেছেন। দশটা নাগাদ রঙওয়ালা এসে হাজির। তাকে দেখেই স্ত্রী এসে বললেন,—

ওহে রঙওয়ালা তুমি প্রথমে আমার বেডরুমে চলো, কাল রাতে আমার স্বামী কোথায় হাত লাগিয়েছিল সে জায়গাটা তোমাকে দেখাবো।

ভদ্রমহিলার কথা শুনে রঙওয়ালা ভির্মি খায় আর কি !

তিপান্ন

একটি ছোট বাচ্চা মেয়ের অভ্যেস ছিল বুড়ো আঙুল মুখে দিয়ে চোষার। একদিন মা ধমক লাগালেন,—খর্বদার, আঙুল চুষবে না। আঙুল চুষলে কি হয় জানো, পেটটা ফুলে একেবার জয়ঢাক হয়ে যায়।

ভয়ে সে মেয়ে আঙুল চোষা বন্ধ করলো। কিছুদিন বাদে মা মেয়ে ট্রামে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে ট্রামে একজন সন্তান-সম্ভবা মহিলা উঠলেন। তাকে দেখেই এই বাচ্চামেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল সবাইকে শুনিয়ে—আমি জানি তুমি কি করেছ। বলবো মা? বলবো কেন ওঁর পেটটা ফুলে গেছে।

ট্রামসুদ্ধ সবাইর চোখ কপালে। মা বেচারীর অবস্থা আরও কাহিল।

চুয়ান্ন

সবচেয়ে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভলাপমেন্ট কোথায় হয়েছে?

এর উত্তরে আমাদের সবজান্তা বন্ধু বলেছেন,—নারীদেহে।

অন্য আর কোথায় এত স্বল্প পরিসরে মিল্ক ডায়েরী ফার্ম, বেবি ফ্যাক্টরী, ওয়াটার ওয়ার্কস্ আর ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী পাবেন?

পঞ্চান্ন

এক মাতাল রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

একজন পথচারী ভদ্রলোক তাকে তুলে ধরে ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। বাড়িতে ঢুকে মাতাল বলল—আসুন স্যার।

আপনি এত ভালো লোক আপনাকে আমার বাড়ি ঘর দোর দেখিয়ে দিই। এটা আমার নিজের বাড়ি। এটা, এটা হল আমার বৈঠকখানা।

ভদ্রলোক: সুন্দর ঘর।

মাতাল : এদিকে আসুন—এটা আমার ডাইনিং হল।

ভদ্রলোক : চমৎকার।

মাতাল : এদিকে আসুন। দেখুন, এটা আমার শোবার ঘর। ওটা আমার বিছানা। বিছানায় যে মেয়েটি দেখছেন ওটা হল আমার স্ত্রী আর আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ঐ যে লোকটা শুয়ে আছে সেটা হল আমি।

ছাপান্ন

মিসেস চ্যাটার্জি : দেখুন অরবিন্দবাবু, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর এক ঘণ্টা পরেই আমার স্বামী ফিরে আসবেন।

অরবিন্দবাবু : কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জি। আমি কোন কিছু অভদ্র বা অন্যায় আচরণ তো করছি না।

মিসেস চ্যাটার্জি : সেজন্যই বলছি। যদি করতে হয় তবে সময় আর বেশী নেই।

সাতান্ন

নিত্যহরি সাহার বাড়িতে পেইংগেস্ট থাকত কানাই দত্ত। নিত্যহরি পেটুক প্রকৃতির লোক। খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। সুন্দরী বৌর প্রতিও তার কোন টান নেই। রীতিমতো বৌকে সে অবহেলা করে। একদিন রাত্তিরে খেজুর গুড়ের পায়েস হয়েছে। নিত্যহরি পুরো বাটিটাই টেনে নিল। বৌকে না, এমন কি কানাইকেও এক চামচ পায়েস খেতে দিলে না। কানাইয়ের এত খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু নিত্যহরি পায়েসের ভাগ দেবে না। এমন সময় ফোন এল নিত্যহরির এক্ষুনি নাইট ডিউটিতে যেতে হবে। নিত্যহরি পায়েসের বাটিটা ফ্রিজে তুলে রাখল। বলল,—পরে খাবো। কেউ ওতে হাত দেবে না।

তারপর তৈরি হয়ে সে বেরিয়ে গেল কাজে। রাত তখন

একটা। নিত্যহরির বৌর ঘুম আসছিল না। বাইরে বৃষ্টির ঝিরঝির। রীতিমতো রোমান্টিক 'পরিবেশ। আর থাকতে না পেরে শাড়ি জামা কাপড় সব ছেড়ে ফেলে নগ্নদেহে সে এসে কানাইয়ের দরজার কড়া নাড়ল। কানাই দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে পড়ল নিত্যহরির বৌ, ফিসফিস করে কানাইকে বলল,—এই তোমার সুযোগ।

লোভে চকচক করে উঠল কানাইয়ের চোখ। সে প্রশ্ন করল,—সত্যি বলছেন বৌদি ?

হ্যাঁ, সত্যি,—আবেশে বুজে এল নিত্যহরিণীর গলা।

ঠিক আছে,—বলেই ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বেরিয়ে এল কানাই। ডাইনিং রুমে এসে ফ্রিজ খুলে বার করল সেই পায়েসের বাটি। তারপর চুকচুক করে সবটুকু পায়েস চেটেপুটে খেয়ে নিল কানাই।

আটায়

জুহুর সমুদ্র ধারে একজন সুন্দরী বেড়াছিলেন: হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে তার শাড়ি-টাড়ি বেলুনের মতো কোমরের ওপরে উঠে গেল। অতিকষ্টে মেয়েটি দু'হাতে কোনরকমে শাড়ি-টাড়ি নামিয়ে ঠিক করলেন। তখন দেখলেন এক ভদ্রলোক একদৃষ্টে তার এই দুর্দশা দেখছেন।

রুষ্টকণ্ঠে মেয়েটি বললেন,—আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি মোটেই জেণ্টেলম্যান্ নন।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন,—আমিও তাই দেখতে পেলাম।

উনষাট

প্রয়োজক একটি নবাগতা নায়িকা নিয়ে এলেন নায়কের কাছে।

প্রযোজক : দেখো সুযোগকুমার। মেয়েটি সগু গাঁ থেকে এসেছে।

খুবই সরল মেয়ে। জীবন কি, জীবনের ভালোমন্দ কি, কিছুই জানে না!

সুযোগকুমার : ঠিক আছে, 'ভালো' কি সেটা আপনি শেখান, আর 'মন্দ' কি সেটা আমি শিখিয়ে দেবো।

ষাট

জনার্দন হেয়ার কাটিং সেলুন।

একটি যুবক এসে জিজ্ঞেস করল,--আমার আগে ক'জন আছে চুল কাটার বাকি?

জনার্দন বলল—পাঁচজন।

আচ্ছা,—বলে ছেলেটি চলে গেল।

দু'তিনদিন পর আবার সেই যুবক এসে দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল,—আমার আগে ক'জন চুল কাটার রয়েছে?

আট জন, জবাব দিল জনার্দন।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করে চলে গেল কিন্তু পরে কখনও চুল কাটতে এল না। এরকম পর পর অনেক দিন ঘটতে থাকল।

জনার্দন ছেলেটার ব্যবহারে আশ্চর্য বোধ করতে লাগল।

আরেকদিন এসে ছেলেটি যেই একই প্রশ্ন করে জবাব শুনে চলে গেল জনর্দন একটা ছোকরাকে ডেকে বলল,—এই কালু, দেখ্‌তো লোকটা কোথায় যায়, ব্যাপারটা কি। যা যা, লোকটাকে ফলো করে আমাকে এসে জানা।

কালু চলে গেল। খানিক বাদে কালু ফিরে এলো। কিন্তু এসে কোন কথা বলল না।

জনার্দন : কি রে। ফলো করেছিস?

ঘাড় কাৎ করল কালু।

জনার্দন : কোথায় যায় বেটা?

কালু : তোমার বৌর কাছে।

একষট্টি

মার্টিন এণ্ড ভট্টচারিয়া কোম্পানীর মালিক প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তার অফিসের সবচেয়ে বিশ্বাসী ও কর্মঠ কর্মচারী যোগেশ দত্তকে ডেকে পাঠালেন। যোগেশবাবু এসে করজোড়ে দাঁড়ালেন।

প্রাণকৃষ্ণবাবু: দেখুন যোগেশবাবু। আপনি সত্যি অফিসের সবচেয়ে হনেস্ট্ আর পরিশ্রমী কর্মী। আপনার কাজ দেখে আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। পুরস্কারস্বরূপ এই নিন পাঁচ হাজার টাকার চেক।

যোগেশবাবু: পাঁচ হাজার টাকার চেক!

প্রাণকৃষ্ণবাবু: হ্যাঁ। ভবিষ্যতে যদি এভাবেই মন দিয়ে কাজ করে যান তবে কথা দিচ্ছি চেকটাকে আমি সাইনও করে দেবো।

বাষট্টি

অপূর্ব বসু ভাব করেছে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষায়িত্রী অনামিকা বিশ্বাসের সঙ্গে। একদিন জপিয়ে-টপিয়ে অপূর্ব নিয়ে গেল অনামিকাকে ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে অনেক আদর-টাদর করে দু'জনের একবার প্রেমপর্ব সমাধা হয়ে গেল।

খানিকবাদে অপূর্ব দেখল অনামিকা কেঁদে চলেছে।

অপূর্ব: এ কি তুমি কাঁদছ কেন?

অনামিকা: দু'দুবার এরকম পাপ করার পর কাল কি করে নিষ্পাপ সরল শিশুদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি পড়াবো বলতো? ভাবতেই আমার কান্না পাচ্ছে।

অপূর্ব: দু'দুবার? কিন্তু—

বাধা দিয়ে বলল অনামিকা,—বারে, যাবার আগে তুমি বুঝি আমাকে ছেড়ে দেবে?

তেষট্টি

পঞ্চাশ বৎসর বয়েসের এক ধনী ক্যাসানোভা ভদ্রলোক পার্টিতে এসে কুড়ি বৎসরের সুন্দরী মেয়েটির হাত জড়িয়ে ধরে বললেন,—সুইটি, আমার জীবনে এতকাল তুমি কোথায় ছিল ?

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মধুর হেসে মেয়েটি বলল,—আপনার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর আমি জন্মাইই নি।

চৌষট্টি

ডাক্তার : আপনার স্বামীর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। এই নিন স্লিপিং পিল।

ভদ্রমহিলা : এই পিল কখন দেবো আমার স্বামীকে ?

ডাক্তার : স্বামীকে দেবেন না। এটা শোবার সময় আপনি নিজে নেবেন। তাহলেই আপনার স্বামীর বিশ্রাম হবে।

পঁয়ষট্টি

পিতাম্বরবাবুর কুকুরের লোম উঠে যাচ্ছিল।

উনি প্রতিবেশী মোহন সিংকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার কুকুরের যখন লোম উঠে যাচ্ছিল তখন তাকে আপনি তার্পিন তেল খাইয়েছিলেন না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—জবাব দিলেন মোহন সিং।

পিতাম্বরবাবু সে কথামতো নিজের কুকুরকে তার্পিন তেল খাওয়ালেন। কিন্তু কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

উনি চেঁচিয়ে মোহন সিংকে বললেন,—আপনি বলেছিলেন না আপনার কুকুরের লোম উঠে যাবার সময় কুকুরকে আপনি তার্পিন তেল খাইয়েছিলেন ?

মোহন সিং বললেন,—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

পিতাম্বরবাবু : কিন্তু আমার কুকুরটাকে খাওয়াতেই মরে গেল।

আমারটাও গিয়েছিল,—জবাব দিলেন মোহন সিং।

ছেষট্টি

হোটেলে বিল শোধ করতে এলেন কল্যাণ সরকার। বিল দেখে চোখ চড়কগাছ।

কল্যাণ: এত টাকা? খাবারের আলাদা বিল্? কিন্তু ম্যানেজারবাবু, আমরা তো হোটেলে একদিনও খাই নি।

ম্যানেজার: তাতে কি? খাবার হোটেলে ছিল। খান আর না খান বিল্ দিতেই হবে। আমাদের তাই নিয়ম।

কল্যাণ: সেক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তিন রাত কাটবার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে।

ম্যানেজার: আপনার স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটানোর জন্য? এ আপনি কি বলছেন? আপনার স্ত্রীকে আমি স্পর্শ পর্যন্ত করি নি।

কল্যাণ: তাতে কি? আমার স্ত্রী হোটেলেই ছিল। আপনি তার সঙ্গে রাত কাটান বা না কাটান আমাদের বিল্ দিতেই হবে! তাই নিয়ম।

সাতষট্টি

বিখ্যাত ধনী প্লেবয় শেখর সেন লণ্ডন গেছেন। এক দোকানে ঢুকেছেন যেখানে বিরাট এক কমপিউটার মেশিন রাখা আছে। দোকানের মালিক বললেন,—এই কমপিউটার যন্ত্রটি সবজান্তা। আপনার ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। আপনি শুধু এই কার্ডে আপনার প্রশ্নটা লিখে স্লটে ফেলে দিন অটোমেটিক্ জবাব টাইপ হয়ে বেরিয়ে আসবে।

শেখর বললেন,—ননসেন্স। আমি বিশ্বাস করি না। দোকানদার বললেন,—একবার ট্রাই করে দেখুন স্যার। শেখর অনেক ভেবেচিন্তে কার্ডে লিখলেন,—"আমার বাবা এখন কোথায়?" লিখে স্লটে ফেলে দিলেন কার্ড। খানিকবাদেই জবাব বেরিয়ে এল। তাতে লেখা—"আপনার বাবা এখন কোলকাতার অজন্তা হোটেলে মুরগীর স্টু রান্না করছে।"

শেখর বললেন,—বলেছিলাম এসব বাজে। মেশিন আবার সবজান্তা হয় কখনও? সেজন্যই এই ভুল উত্তর এসেছে। আসলে আমার বাবা দু'বছর আগে মারা গেছেন।

দোকানদার বললেন,—এরকম ভুল তো এই কমপিউটার আগে করে নি। সত্যি অবাক কাণ্ড। এক কাজ করুন প্রশ্নটা অন্যভাবে আবার মেশিনে দিন, দেখা যাক দ্বিতীয়বার সঠিক জবাব আসে কিনা।

শেখর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন,—ঠিক আছে। দেখা যাক। এইবার কার্ডে শেখর লিখলেন,—"আমার মার স্বামী এখন কোথায়?"

কমপিউটার মেশিন মারফত জবাব এল খানিকবাদে—"আপনার মার স্বামী দু'বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু আপনার বাবা এখন কোলকাতার অজন্তা হোটেলে মুরগীর স্টু রান্না করছে।"

আটষট্টি

অরুণ ও পরিতোষ দুই বন্ধু কোলকাতা থেকে বোম্বে বেড়াতে এসেছে। ওরা জুহুর হোটেলে উঠেছে। রাত্তিরে ওরা পাশের ঘর থেকে স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন শুনতে পেল। বলা বাহুল্য কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল পাশের ঘরের বাসিন্দা এক নববিবাহিত দম্পতি। ওরা দেয়ালে কান লাগিয়ে শুনছিল।

স্ত্রী: আলো বন্ধ করে দাও।

স্বামী: না। আমি তোমার স্বামী, আমাকে প্রাণ ভরে দেখতে দাও আজ। আহা, ঈশ্বর যেন নিজের হাতে তোমার রূপ গড়েছেন। মেঘের মতো কালো চুল, টলটলে দীঘির মতো চোখ, দুধেআলতা গায়ের রঙ, টিকলো নাক, কমলা লেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট যেন রসে টসটস করছে, দীর্ঘ গলা, অজন্তার ফ্রেসকোর মতো স্তন, সরু সিংহের মতো কোমর, মসৃণ তলপেট, ধনুকের বাঁকের মতো নিটোল নিতম্ব, কলাগাছের মতো পা। সত্যি বলছি ডার্লিং, আজ যদি

কোণারক মন্দির যারা তৈরি করেছেন সেরকম ভাস্কর পেতাম তবে তাঁদের ডেকে এনে শ্বেত পাথরে তোমার নগ্ন মূর্তি গড়িয়ে রাখতাম।

এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ পাওয়া গেল। স্বামী উচ্চস্বরে প্রশ্ন করলেন,—কে?

: কোণারক থেকে দু'জন ভাস্কর,—জবাব পাওয়া গেল।

উনসত্তর

একটি পার্কে দুটো স্ট্যাচু ছিল। একটি এপোলোর নগ্ন মূর্তি, অন্যটি ভেনাসের মূর্তি। কতদিন ধরে পার্কের পাথরের বেদীতে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বরের একদিন কি মর্জি হল দু'টি পাথরের মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করে দিলেন। বেদী থেকে নেমে এল এপোলো, অন্য বেদী থেকে ভেনাস। দু'জনে দু'জনের কাছাকাছি এল। লজ্জাকণ্ঠে ভেনাস বলল,—এখন আমরা কি করব?

প্রথমত—বলল এপোলো,—আমি এ অঞ্চলের যত পায়রা আছে ধরে আনব। তারপর সবগুলো পায়রার মাথার উপরে আমরা দু'জনে মিলে সে কাজটাই করব যা এতকাল এই পায়রা-গুলো আমাদের মাথার উপরে করে এসেছে।

সত্তর

এক মাতাল এসে আরেক মাতালকে ডাকতে শুরু করল।

মাতাল: নরহরি—নরহরি, তুই বেঁচে আছিস?

নরহরি: কেন?

মাতাল: শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ট্রাক একসিডেন্ট হয়েছে। একটা লোক মারা গেছে। আমি ভেবেছিলাম তুই।

নরহরি: আমি? কি জামা-কাপড় পরা আছে লোকটার?

মাতাল: নীল জামা।

নরহরি : তাহলে মনে হচ্ছে আমিই রে। আমার জামাও নীল।

মাতাল : লাল কালো ডোরা কাটা লুঙ্গি।

নরহরি : মাইরী, আমারও তো লাল কালো ডোরা কাটা লুঙ্গি। সর্বনাশ। আর পায়ে কি ছিল রে?

মাতাল : পায়ে ছিল ব্রাউন পাম্প শু।

নরহরি : না। তাহলে আমি নই। আমার পায়ে তো সবুজ রবারের চপ্পল।

একাত্তর

একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এক ভদ্রলোক এলেন। সোজা সেল্‌স্‌গার্লের কাছে এসে বললেন,—দেখুন আমার স্ত্রীর জন্য হাতের দস্তানা কিনতে এসেছি। কিন্তু হাতের সাইজ নাম্বারটা আনতে ভুলে গেছি।

মেয়েটি বলল,—এই নিন আমার হাত। এ হাত ধরে দেখুন এরকম সাইজ, না এরচেয়ে বড়?

মেয়েটি তার নরম হাত ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিল। ভদ্রলোক হাতটাকে টিপেটাপে হাত বুলিয়ে দেখে নিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আপনার হাতেরই সাইজ। সেল্‌স্‌গার্ল মেয়েটি সে সাইজ অনুযায়ী দস্তানা বার করে দিলেন।

সেল্‌স্‌গার্ল : আর কিছু চাই?

ভদ্রলোক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। এখন মনে পড়েছে, আমার স্ত্রী তাঁর জন্য ব্রাও কিনে নিয়ে যেতে বলেছেন। ব্রার সাইজটাও আনতে ভুলে গেছি আমি।

বাহাত্তর

জনৈকা : আমাদের ভাই দিনে কম করে ত্রিশ চল্লিশবার দাড়ি কামায়।

বান্ধবী : তোর ভাই পাগল নয় তো ?

জনৈকা : না। নাপিত।

তিয়াত্তর

ব্যস্ত প্রফেসর : পেনসিলটা কোথায় গেল বলো তো ?

ছাত্র : ঐ তো আপনার কানের পেছনে।

প্রফেসর : আমি ব্যস্ত মানুষ। এখন আমার সময় নষ্ট করো না। কোন কানের পিছনে তাড়াতাড়ি বলো, কুইক্।

চুয়াত্তর

রেস্টুরেন্ট।

একজন মহিলা মেনু দেখছিলেন। হঠাৎ উনি লক্ষ্য করলেন বেয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেছন চুলকাচ্ছে।

ভদ্রমহিলা : পাইল্‌স্ আছে ?

বেয়ারা : যা মেনুতে রয়েছে তাই অর্ডার করুন। মেনুর বাইরে কোন ডিশ পাবেন না।

পঁচাত্তর

দুপুরবেলা।

পাগলখানার তিনজন কয়েদী পাথর ভাঙার কাজ করছিল। খানিকবাদে একজন ফোরম্যান সেখানে এসে দেখলেন একজন পাথর ভেঙে যাচ্ছে আর বাকি দু'জন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

ফোরম্যান : এই তোমরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

সে দু'জন জবাব দিল না। যে পাথর ভাঙছিল সে বলল,— এই দু'জন হল ল্যাম্প পোস্ট্।

ফোরম্যান : ল্যাম্পপোস্ট ? ঠিক আছে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তোমরা ভেতরে যাও।

সে দু'জন চলে যেতেই যে পাগল পাথর ভাঙছিল সে কাজ বন্ধ করে দিল।

ফোরম্যান : এ কি, তুমি কাজ বন্ধ করে দিলে কেন ?

পাগল : ল্যাম্পপোস্ট নেই, অন্ধকারে কি করে কাজ করব আমি ?

ছিয়াত্তর

এক সর্দারজীর পরপর পাঁচটি মেয়ে। পরের বারও আবার সেই মেয়েই হল। সর্দারজী খানিকক্ষণ মনমরা হয়ে রইল তারপর তার মাথায় এক আইডিয়া এল। সে সবাইকে টেলিগ্রাম করে দিল—তার ছেলে হয়েছে।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভিড় করে এল। প্রচুর উপহার উপ-ঢৌকন দিল বাচ্চাকে। আদর করতে লাগল বাচ্চাকে।

একজন বলল : কপালটা একেবারে বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।

আরেকজন : নাকটা আর থুতনিটাও বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।

আরেকজন : হাত পায়ের গড়নটাও বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।

এমন সময় বাচ্চা হিসি করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার আসল পরিচয় জেনে গেল সবাই।

একজন বলে উঠল,—এ কি সর্দারজী ? তুমি না বলেছিলে যে—

বাধা দিয়ে বলল সর্দারজী,—মা'র কাছ থেকেও তো কিছু পাবে। সব কিছুই কি বাবার কাছ থেকে পাবে নাকি ?

দাঁতান্তর

ডেন্টিস্টের চেম্বার।

দন্ত চিকিৎসক : ভয়ের কিছু নেই। চট করে আপনার দাঁতটা তুলে দেবো।

ভদ্রলোক : না না ডাক্তারবাবু, আমার ভয় করছে। প্লিজ ডাক্তারবাবু, আমি যন্ত্রণায় মরো যাবো। বড্ড ভয় করছে আমার।

ডাক্তার : ঠিক আছে, এক কাজ করছি। আপনি খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিন। ব্র্যাণ্ডি খেলে দেখবেন সাহস বেড়ে গেছে।

ভদ্রলোক ব্র্যাণ্ডি খেলেন।

এইবার ডাক্তার বললেন,—কি এখন সাহস বেড়েছে তো?

ভদ্রলোক : নিশ্চয় বেড়েছে। এখন দেখ্‌ছি কোন শালা আমার দাঁত তুলতে আসে। দাঁতে হাত লাগাতে আসুন এক ঘুষিতে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো। বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দেবো।

আটান্তর

একটি মেয়ের প্রশ্ন : বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে শোবার সময় নববধূর কি করা উচিত? কম করে তিনটে জিনিসের নাম উল্লেখ করবেন।

উত্তর : সিঁদুর, লিপস্টিক্, আলতা।

উনআশি

এক পার্টিতে একজন মহিলা ও এক প্রফেসরের তুমুল তর্ক হল। কোন বিষয়েই ওঁরা একমত নন। শেষে বিরক্ত হয়ে মহিলা বললেন—দেখুন। আমাদের দু'জনের প্রতিটি বিষয়ে মতভেদ। এমন একটাও বিষয় নেই যাতে আমরা একমত হতে পারি।

প্রফেসর বললেন,—আপনি ভুল করছেন। কেন হবে না, পৃথিবীতে বিষয়বস্তুর কি অভাব আছে।

মহিলা : একটিও বিষয় আপনি উল্লেখ করতে পারেন যাতে একমত হতে পারি ?

প্রফেসর : কেন নয়। ধরুন এক বৃষ্টির রাত। আপনি একা গাড়ি করে যাচ্ছেন। রাস্তা জলে ডুবে গেছে। গাড়ি ছেড়ে একটি বাড়িতে আপনি কড়া নাড়লেন। সে বাড়ি এক রাজকুমারীর। উনি বললেন,—"বিপদে পড়েছেন, রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান।" আপনি রাজি হলেন। সেখানে দু'টোই বিছানা। এক বিছানায় রাজকুমারী শুয়েছেন অন্য ঘরে অন্য বিছানায় তাঁর পশ্চিমী চাকর জোয়ান ছোকরা গঙ্গুমল শুয়ে আছে। এরকম পরিস্থিতিতে আপনি কার সঙ্গে শোবেন ?

মহিলা বিরক্তকণ্ঠে বললেন,—এ আবার কি ধরনের প্রশ্ন। বলা বাহুল্য আমি সেই রাজকুমারীর সঙ্গেই শোব।

হেসে বললেন প্রফেসর,—আমিও তাই শোব। এবার দেখলেন তো এক বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি কিনা ?

আশি

বাসে একজন মাতাল টলতে টলতে উঠে পড়লেন।

বাস চলতে শুরু করল। মাতালটা পাশের ভদ্রলোককে বললেন,—আচ্ছা দাদা, আমি কি বাসে উঠেছি ?

সহযাত্রী : হ্যাঁ মশাই উঠেছেন।

মাতাল : আপনি কি আমাকে চেনেন দাদা ?

সহযাত্রী : না।

মাতাল : তাহলে আপনি কি করে জানলেন যে আমিই বাসে উঠেছি।

একাশি

চাকরির জন্য একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে। শিক্ষয়িত্রীর চাকরি। স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইণ্টারভিউ। সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখে প্রেসিডেন্ট বললেন,—দেখুন, আপনি কি কুমারী ?

মেয়েটি : নিশ্চয়ই। দেখছেন না আমি নামের আগে মিস্ লাগিয়েছি।

প্রেসিডেন্ট : শুনুন আমাদের স্কুলের খুব কড়া নিয়ম। আপনার শুধু মুখের কথায় কাজ হবে না। প্রমাণ চাই। আপনি যে কুমারী তার প্রমাণপত্র চাই তবে কাজ পাবেন।

মেয়েটি : আমাকে আপনি অপমান করছেন স্যার।

প্রেসিডেন্ট : আমি নিরুপায়। প্রমাণপত্র চাই।

মেয়েটি রেগে বেরিয়ে এল। সেদিনই এক ডাক্তারকে খোঁজ করল মেয়েটি। নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিল। ততক্ষণে ছ'টা বেজে গেছে। তাই সেদিন না গিয়ে পরদিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় স্কুল প্রেসিডেন্টের অফিসে গিয়ে দেখা করল মেয়েটি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট টেবিলের উপর ফেলে রাগতকণ্ঠে বলল,—এই নিন আমার কুমারীত্বের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট। এবার তো আর সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রমাণপত্র চেয়েছিলেন প্রমাণপত্র দিলাম।

সার্টিফিকেটটা খুলে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন,—এটাতে তো চলবে না।

মেয়েটি,—চলবে না? কেন?

প্রেসিডেন্ট বলল,—এতে তো গতকালের তারিখ দেওয়া আছে।

মেয়েটি নিজে অজ্ঞান হয়েছিল না প্রেসিডেন্টকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল সে খবর আমার জানা নেই।

বিরাশি

অমিত তার গার্লফ্রেণ্ড তিলোত্তমাকে নিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিল। এক সময়ে অমিতের কাছ ঘেঁষে এসে মাথা নীচু করে আদুরে কণ্ঠে তিলোত্তমা বলল,—অমিত, আমার যে জায়গায় এপেনডিসাইটিস অপারেশন করা হয়েছিল সে জায়গাটা তুমি দেখতে চাও।

লোভে চকচক করে উঠল অমিতের চোখ। লোভী কণ্ঠে বলে উঠল,—দেখাবে তিলু, সত্যি দেখাবে আমাকে?

কেন দেখাবো না,—বলল তিলোত্তমা,—ঐ দেখো, ঐ যে মোড়ের মাথায় দেখছো চৌরঙ্গী হসপিটাল, ঐ জায়গায় হয়েছিল আমার এপেনডিসাইটিস অপারেশন।

তিরাশি

টেলারের দোকান।

স্ত্রী : আমার স্বামীর প্যাণ্টটা তৈরি হয়ে গেছে?

দর্জি : না। একটু বাকি আছে মেমসা'ব। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, প্যাণ্টের সামনে বোতাম রাখব না জিপ্ ফাস্‌নার রাখবো?

স্ত্রী : বোতামই রাখো। একটা জার্কিনে ওঁর জিপ্ ফাস্‌নার লাগানো ছিল, তাতে হু'বার ওঁর টাই আটকে গিয়েছিল।

চুরাশি

দার্জিলিংএ সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল শম্ভু। হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে সে অবাক হয়ে গেল। সে দেখল একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দৌড়্চ্ছে আর তার পেছনে তিন জন লোক দৌড়্চ্ছে। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে যে পেছনে দৌড়্চ্ছে তার হু'হাতে হুটো বালিভর্তি বাল্‌তি। শম্ভু থাকতে না পেরে সেই লোকটাকে প্রশ্ন করল,—ব্যাপারটা কি মশাই?

লোকটি বলল,—এই মেয়েটি মেয়েদের পাগলাগারদ থেকে পালাবার চেষ্টা করছে আর আমরা সে গারদের ওয়ার্ডেন, আমরা ধরবার জন্য ছুটছি।

শম্ভু : কিন্তু আপনার হাতে বালিভর্তি বালতি কেন?

লোকটি : আরও তিনবার মেয়েটি এভাবে পালাবার চেষ্টা করেছিল। প্রতিবার আমিই ওকে ধরেছি। সেজন্যে এবার আমাকে

এই হ্যাণ্ডিক্যাপ্ দেওয়া হয়েছে। বলে লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ুতে শুরু করে দিল।

পঁচাশি

একটি মেয়ে সিমলা থেকে পড়ত। বোম্বেতে তার বড়লোক ডাক্তার বাবা থাকতেন। বাবাকে একবার মেয়েটি লিখল বাবা যেন টাকা পাঠান সে একটা বাইসাইকেল কিনতে চায়। বাবা টাকা পাঠালেন। তাতে মেয়েটি একটা সাইকেল কিনল। এরপরও টাকা বেঁচেছিল তাই মেয়েটি সে বাকি টাকা দিয়ে একটা পোষা বাঁদরের বাচ্চা কিনল। যত্ন করে পালতে লাগল সে বাঁদর ছানাকে কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখল তার বাঁদরের লোম ঝরে যাচ্ছে। (বাবাকে সে অবশ্য জানাতে ভুলে গিয়েছিল যে সে এই বাঁদরের বাচ্চা কিনেছে।) যাই হোক, মেয়েটা ভাবল বাবা ডাক্তার মানুষ, নিশ্চয়ই কোন ওষুধ লিখে জানাবেন তার বাঁদরের জন্য। মেয়েটা টেলিগ্রাম করল,—MY MONKEY IS LOOSING HAIR WRITE WHAT TO DO.

পরদিনই জবাব এল—SELL THE BICYCLE FIRST.

ছিয়াশি

এক পাগলের অভ্যাস ছিল গুলতি দিয়ে যে কোন কাঁচের ভেঙে জানালা সে ফেলত। তাকে ধরে মানসিক চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসা হল। এক বৎসর চিকিৎসার পর ডাক্তারদের ধারণা হল সে রোগমুক্ত হয়েছে। তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। ছাড়বার আগে শেষ পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারদের চেম্বারে তাকে ডেকে আনা হল।

ডাক্তার : শুনুন স্যার, আমাদের ধারণা আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য

হয়েছেন। তাই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এবার আপনি বলুন এখান থেকে ছেড়ে দেবার পর আপনি কি করবেন?

রুগী : আমি? সত্যি, বলব?

ডাক্তার : বলুন।

রুগী : প্রথমে ভালো এক স্যুট কিনব। তারপর সেটা পরে আমি তাজমহল হোটেলে যাবো ডিনার খেতে।

ডাক্তার : গুড্। নর্মাল ব্যাপার। তারপর?

রুগী : তারপর সেখানে সুন্দরী এক সোসাইটি গার্লকে বলব "মে আই হ্যাভ এ ডান্স উইথ ইউ?" মেয়েটা রাজী হলে তার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ নাচব।

ডাক্তার : গুড্ নর্মাল। তারপর?

রুগী : তারপর তাকে ডিনার খাওয়াব। কনিয়াক্ খাওয়াবো।

ডাক্তার : বেশ কথা। তারপর?

রুগী : তারপর তাকে হোটেলের একটা কামরায় নিয়ে আসব। নীল আলো জ্বালিয়ে দেবো। শ্লো মিউজিক চালিয়ে দেবো।

ডাক্তার : এবসোলুট্লি নর্মাল সব কিছু। তারপর?

রুগী : তারপর ধীরে ধীরে তার শাড়ি খুলব। ব্রাউজ খুলব। ব্রা খুলব। পেটিকোটটা ধীরে ধীরে নামিয়ে আনব পা থেকে।

ডাক্তার : নাথিং রং। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তারপর?

রুগী : এইবার মেয়েটির শরীরে শুধু বাকি রয়েছে তার গোলাপী আণ্ডারওয়ার। ধীরে ধীরে তার সেই সিল্কের আণ্ডারওয়ারটা খুলে নেব আমি।

ডাক্তার : তারপর?

রুগী : তারপর আণ্ডারওয়ার থেকে ইলাসটিকের ডুরিটা খুলে নেব আমি। সেই ইলাসটিক্ দিয়ে আমি নতুন গুল্তি বানাবো, আর সেই গুল্তি দিয়ে বোম্বের যত কাঁচের জানালা আছে সব ভেঙে চুরমার করে দেবো আমি।

ডাক্তার : নিয়ে যাও পেশেন্ট্‌কে। বন্ধ করে রাখো ওকে। হিইজ এজ্‌ সিক এজ্‌ বিফোর। নো ইম্‌প্রুভমেন্ট্‌।

সাতাশি

মেয়েদের হোস্টেল পরিদর্শন করতে এসেছেন জনৈক মন্ত্রী। সঙ্গে মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল সরমা নন্দী।

ওঁরা হোস্টেলে ঢুকেই চমকে উঠলেন। সব মেয়েরা তাদের শাড়ি কোমরের উপর তুলে গুঁজে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেগে ফেটে পড়লেন সরমা নন্দী। বললেন,—একি অসভ্যতা। তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে? শাড়ি তুলে ঘুরছ কেন সবাই?

একটি মেয়ে মিনমিন করে বলল,—খানিক আগে আপনি ফোন করেছিলেন না যে মন্ত্রীমশাই হোস্টেল পর্যবেক্ষণে আসছেন, প্রত্যেক মেয়ে যেন নিজের নিজের শাড়ি তুলে গুঁজে রাখে।

চেঁচিয়ে উঠলেন সরমা নন্দী,—শাড়ি তুলে গুঁজে রাখতে আমি মোটেই বলি নি। নামাও শাড়ি, শিগ্‌গির নামাও। তুমি কি কানে কম শোন? আমি ফোনে বলেছিলোম প্রত্যেক মেয়ে যেন নিজের নিজের মশারী তুলে গুঁজে রাখে।